কামালপুর ১৯৭১

সম্মুখযোদ্ধা এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি
সমর বিশেষজ্ঞদের কথা

কামালপুর ১৯৭১

সম্পাদক
মুহাম্মদ লুৎফুল হক

প্রথমা প্রকাশন

কামালপুর ১৯৭১
সম্মুখযোদ্ধা এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি সমর বিশেষজ্ঞদের কথা
গ্রন্থস্বত্ব © মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১৯, নভেম্বর ২০১২
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৭৫ টাকা

Kamalpur 1971
Sammukhjoddha ebong Bharotiyo o Pakistani samar bisheshoggoder kotha
Edited by Muhammad Lutful Haq
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 275 only

ISBN 978 984 90192 9 9

সম্পাদকের কথা

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশজুড়ে সর্বাত্মক আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। অপ্রস্তুত বাঙালি জাতি প্রাথমিকভাবে ক্ষীণ সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নেতৃত্ব, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রসম্ভারের অভাবে প্রতিরোধযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন অথবা গ্রামে-গঞ্জে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যান। মে মাসের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ বাংলাদেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেকোনো মূল্যে মুক্তিবাহিনীকে দেশে ঢুকতে না দেওয়া এবং দখলদারি অব্যাহত রাখা।

কামালপুর বর্ডার আউট পোস্টের (বিওপি) অবস্থান জামালপুর জেলা সদর থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। যুদ্ধ শুরুর আগে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) ২ উইংয়ের সেনারা এই বিওপিতে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে বাঙালি সেনারা বিওপিটি কিছুদিন দখলে রেখে নিরাপত্তার কারণে তা ত্যাগ করেন এবং ভারতে গিয়ে বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মে মাসের মধ্যে বিওপিটি পুনর্দখল করে এবং এর অবস্থানগত কারণে এটিকে শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলে।

কামালপুর বিওপিকে অবজ্ঞা করে বা এড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ওই এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জুন মাসে মুক্তিবাহিনী সিদ্ধান্ত নেয়, যেকোনো মূল্যে কামালপুর বিওপি দখলে নিতে হবে। এর পর থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধের বাকি ছয় মাস ধরে চলতে থাকে বিরামহীন আক্রমণ। স্বাধীনতাযুদ্ধের এই সময়কালে খুব কম দিনই এই বিওপি ও তৎসংলগ্ন এলাকা গোলাগুলির আওয়াজমুক্ত ছিল। বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই মুক্তিবাহিনী এই এলাকায় ছোট-বড় আক্রমণ চালিয়ে যায়। বিওপি দখলের জন্য নভেম্বর মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেডও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। শুরু হয় ভারী

কামান আর হাওয়াই হামলা। এত কিছুর পরও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ১৪০ জন সেনা ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত এই বিওপিকে তাদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়।

কামালপুর যুদ্ধের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুদ্ধের মূল্য অনেক। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এই যুদ্ধ বিষয়ে পাঠদান করা হয়। বাংলাদেশের জন্য এ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাদল যদি সঠিকভাবে ভূমি নির্বাচন করে এবং সমন্বিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়, তবে কয়েক গুণ বড় ও শক্তিশালী শত্রুকেও প্রতিহত করা সম্ভব।

সার্বিকভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের সামরিক অভিযানবিষয়ক দলিলপত্র কোথাও সংরক্ষিত নেই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর বিজয়কেতনে খুব অল্প কিছু দলিলপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে কামালপুর যুদ্ধসংক্রান্ত কয়েকটি দলিলও আছে। কামালপুর যুদ্ধে সম্পৃক্ত মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার বা রচনা বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে।

এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রে কামালপুর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গণবাহিনীর বেশ কিছু সদস্যের সাক্ষাৎকার সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রণীত যুদ্ধ-ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে কামালপুর যুদ্ধের স্বল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থেও পাওয়া যায় কামালপুর যুদ্ধের বর্ণনা। যুদ্ধকালে কামালপুর বিওপির পাকিস্তানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে কর্নেল) আহসান মালিকও একটি বই লিখেছিলেন বলে শোনা যায়, কিন্তু তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কামালপুর বিওপি দখলের একটি প্রয়াস নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছে।

কামালপুর বিওপি ও বাজার এলাকায় নির্মিত স্মৃতিসৌধে এই যুদ্ধ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যের উল্লেখ আছে। *Kvgvjci 1971: mÁÅLGhv«¬v ‰es fviZxq I cvwKÕvwb mgi weGklæG`i K^v* গ্রন্থে এগুলোকে একত্র করে ওই এলাকায় সংঘটিত সশস্ত্র যুদ্ধের ধারাবর্ণনাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আরও কিছু সাক্ষাৎকার এবং দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে কামালপুর এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে। সাক্ষাৎকার, রচনা বা দলিলপত্রে পাওয়া তথ্যগুলোর মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ভিন্নতা বা বৈপরীত্য দেখা যায়। দীর্ঘদিন পর গৃহীত গণবাহিনীর সদস্যদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে স্মৃতিবিভ্রাটও লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু গণবাহিনীর সদস্যরা ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত এবং যুদ্ধের সার্বিক ঘটনাসমূহ ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে অক্ষম। তাঁরা শুধু যা দেখেছেন এবং বুঝেছেন তা-ই

উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁদের সাক্ষাৎকারে বিভ্রান্তি অনেক বেশি। এসব সমস্যাকে বিবেচনা করে যুদ্ধের বর্ণনা লেখার সময় সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত তথ্যকে সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। বলে রাখা ভালো যে, *Kvgvjci 1971: mÁÅLGhv«¬v ‰es fviZxq I cvwKÕvwb mgi weGklæG`i K^v* কোনো গবেষণা গ্রন্থ নয় বরং গবেষকদের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে সংকলিত হয়েছে।

এটি মূলত একটি যুদ্ধ-ইতিহাসের গ্রন্থ। প্রথমা প্রকাশন এ ধরনের আরও কয়েকটি যুদ্ধ-ইতিহাসের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করা যায়, এ ধরনের আরও কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সামরিক ইতিহাস রচনার পথ প্রশস্ত হবে।

গণবাহিনীর সাধারণ সেনাদের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারগুলোর যেসব অংশ কামালপুর যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট নয় তা সংযুক্ত করিনি। কামালপুর-সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্রগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ায় ১১ নম্বর সেক্টরের যোদ্ধা-সাংবাদিক হারুন হাবীবকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গণবাহিনীর সদস্যদের ছবি সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য *c^g AvGjv*র জামালপুর জেলা প্রতিনিধি মোস্তফা মনজুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কামালপুর বিওপি পরিদর্শন এবং তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য হেলালুজ্জামান হেলাল বীর প্রতীক এবং লে. কর্নেল মো. আবদুল খবীর সরকার, বিজিবিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ লুৎফুল হক
ঢাকা, নভেম্বর ২০১২

সূচিপত্র

কামালপুর যুদ্ধ

কামালপুর বিওপির অবস্থান ১৩
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ১৫
মুক্তিবাহিনীর অভিযান ১৮
কামালপুরের চূড়ান্ত যুদ্ধ ৩৬
উপসংহার ৪৩

নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের কলমে কামালপুর যুদ্ধ

মেজর আবু তাহের, বীর উত্তম ৪৭
ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম ৫৫
ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, বীর বিক্রম ৬২
লেফটেন্যান্ট মো. আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম ৭০

গণবাহিনীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার

মজিবর রহমান ৭৯
মজিবর রহমান ৮২
মো. দেলোয়ার হোসেন ৮৬
মো. আবদুল করিম ৯৩
মো. মতিউর রহমান, বীর প্রতীক ১০০
মহম্মদ হাফিজুল ইসলাম ১০৮
মো. গোলাপ হোসেন ১১২
সলিমউদ্দীন ১১৯

মো. আবদুর রহমান ১২২
মো. রফিকুল ইসলাম ১২৬
মো. সিরাজুল হক ১৩৫
মো. লাল মিয়া ১৩৯
আবুল কাশেম ১৪২
মো. আবদুল মান্নান ১৪৭
বশির আহমেদ, বীর প্রতীক ১৫০
আলহাজ মো. নুরুল ইসলাম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক ১৫৮
খন্দকার মো. ইয়াকুব ১৬৩

ভারতীয় জেনারেল ও পাকিস্তানি মেজরের বিবরণ

মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং, ভারত ১৭১
মেজর সিদ্দিক সালিক, পাকিস্তান ১৭৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কামালপুর আক্রমণ (৩১ জুলাই ১৯৭১) বিষয়ে লে. কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) জিয়াউর রহমানের প্রতিবেদন ১৮৫
পরিশিষ্ট-২ : লে. কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) জিয়াউর রহমানের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান সেনাপতি কর্নেল (পরে জেনারেল) এম এ জি ওসমানীর উত্তর ১৮৭
পরিশিষ্ট-৩ : কামালপুর আক্রমণে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্ব প্রদর্শনকারীদের খেতাব প্রদানের জন্য লে. কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) জিয়াউর রহমানের সুপারিশপত্র ১৮৮
পরিশিষ্ট-৪ : ওয়ার বুলেটিন ১৮৯
পরিশিষ্ট-৫ : কামালপুর যুদ্ধে শহীদদের তালিকা ১৯১
পরিশিষ্ট-৬ : কামালপুর যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা ১৯৯

কামালপুর যুদ্ধ

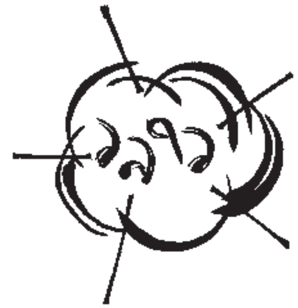

কামালপুর বিওপির অবস্থান

জামালপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বকশীগঞ্জ থানার ধানুয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী গ্রাম কামালপুর। কামালপুরের আশপাশে বাংলাদেশ অংশে ধানুয়া, উঠানিপাড়া, ঘাসিরপাড়া, পশ্চিম কামালপুর, গলাকাটি, নয়াপাড়া, মৃধাপাড়া, বালুরগ্রাম, রামরামপুর, দত্তের চর, সাতানিপাড়া, যাদুর চর আর ভারতীয় অংশে

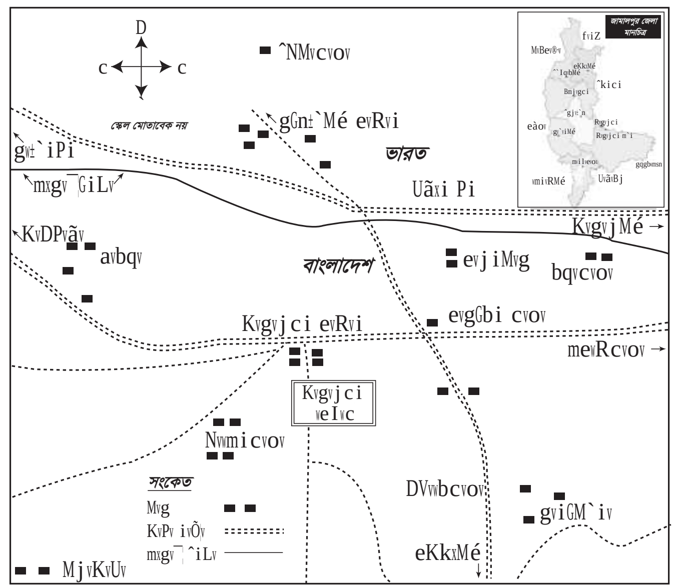

কামালপুর এলাকার নকশা (ইনসেটে জামালপুর জেলা)

পালপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, মাঝির চর, তান্দির চর, ঘেগাপাড়া, বিলডোবা প্রভৃতি অবস্থিত। কামালপুর গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় ইপিআরের (বর্তমানে বিজিবি) সীমান্ত ফাঁড়ি (বিওপি); গ্রামের নামেই বিওপির নাম কামালপুর বিওপি। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তরেখা থেকে দেড় কিলোমিটার ভেতরে সীমান্তখুঁটি ১০৮৪ ও ১০৮৫-এর মাঝামাঝি জায়গায় কামালপুর বিওপির অবস্থান, কামালপুর বিওপি বকশীগঞ্জ থানা সদর থেকে ১১ কিলোমিটার উত্তরে। অন্যদিকে জামালপুর মহকুমা সদর থেকে কামালপুর বিওপি ৪০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। কামালপুরের কাছাকাছি সীমান্তরেখাটি আঁকাবাঁকা ও অসমতল। কামালপুরের অপর প্রান্তে ভারতের মেঘালয় রাজ্য। সীমান্তের ওপারের অঞ্চল বাংলাদেশের সমতলভূমি থেকে ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে গেছে। সীমান্তের এক কিলোমিটারের মধ্যে মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জ শহরে মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর আর মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তেলঢালায় জেড ফোর্সের সদর দপ্তর ছিল।

সীমান্ত এলাকা থেকে শুরু হওয়া শেরপুর-ময়মনসিংহ সড়কটি কামালপুর বিওপির পূর্ব পাশ দিয়ে চলে গেছে। সড়কটি বকশীগঞ্জ-গোঁসাইপুর হয়ে

কামালপুর বিওপির প্রবেশপথ

মহকুমা শহর শেরপুরের (বর্তমানে জেলা) সঙ্গে গোটা অঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে। এই এলাকার সঙ্গে সড়কপথে এটিই একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। মাটির তৈরি এই কাঁচা রাস্তা শুকনো মৌসুমে সব ধরনের যানবাহন চলাচলের উপযোগী। বর্ষার সময় গরুর গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন চলাচল প্রায় অসম্ভব। কামালপুর থেকে বকশীগঞ্জ থানা সদর পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তা পার্শ্ববর্তী জামালপুর শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে কামালপুর থেকে একটি রাস্তা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাঁয়ে রেখে ঝিনাইগাতীর ভেতর দিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে। ভূমিবিন্যাসের দিক থেকে জামালপুর এবং এর চারপাশের এলাকা সমতল। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ছাড়া এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোনো নদী নেই। তবে ব্রহ্মপুত্রের বেশ কিছু ছোট শাখা-প্রশাখা থাকায় বর্ষাকালে পুরো অঞ্চলটি পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়। বেশির ভাগ রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বর্ষাকালে এই এলাকায় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম নৌকা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা

১৯৭১ সালের শুরুতে ১৪ পদাতিক ডিভিশনের অধীন ১১৭ পদাতিক ব্রিগেডের ওপর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এলাকার প্রতিরক্ষা দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ডিভিশনের সদর দপ্তর ছিল ঢাকায় আর জিওসি ছিলেন মেজর জেনারেল এম রহিম খান। ১১৭ পদাতিক ব্রিগেডের সদর দপ্তর ছিল ময়মনসিংহে, এর অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ অতিফ। ১৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত এলাকার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত এই ব্রিগেডের প্রধান দায়িত্ব ছিল মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণকে যথাসম্ভব প্রতিহত করা। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত থানা সদর পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই তারা শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা চালায়। একই সঙ্গে তারা ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

জুন-জুলাই মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি তাঁর বাহিনীর কমান্ডার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা পুনর্নির্ধারণ করেন। ঢাকা ও ময়মনসিংহ এলাকার জন্য মেজর জেনারেল জমসেদ

খানের অধিনায়কত্বে ৩৬ অ্যাডহক ডিভিশন গঠন করা হয়। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এলাকা থেকে ১১৭ পদাতিক ব্রিগেডকে কুমিল্লা এলাকায় পাঠিয়ে এ এলাকার প্রতিরক্ষার জন্য ব্রিগেডিয়ার কাদের খানের নেতৃত্বে ৯৩ অ্যাডহক পদাতিক ব্রিগেড গঠন করা হয়।

৯৩ অ্যাডহক পদাতিক ব্রিগেডের অধীন ৩১ বালুচ রেজিমেন্টকে জামালপুর-শেরপুর এলাকায় মোতায়েন করা হয়। এই রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান মাহমুদ। বালুচ রেজিমেন্টের সদর দপ্তর ছিল জামালপুর শহরে। বালুচ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি বকশীগঞ্জ থানা সদরে অবস্থান করছিল। এই কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন মেজর আইয়ুব। তাঁর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ছিল কামালপুর বিওপি। কামালপুর বিওপিতে বালুচ রেজিমেন্টের ১ প্লাটুনের বেশি নিয়মিত সেনা ছাড়াও ৭০ উইং রেঞ্জার্স ইউনিটের একটি প্লাটুন এবং রাজাকার বাহিনীর একটি প্লাটুন দায়িত্বরত ছিল। ওই সেনা দলের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আহসান মালিক।

মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদে বকশীগঞ্জ কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থেকে বিভিন্ন সময়ে রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠিয়ে কামালপুরের শক্তি বৃদ্ধি করা হতো। সামরিক অবস্থানের দিক থেকে কামালপুর বিওপি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল। কামালপুর অতিক্রম করলে ঢাকা যাওয়ার পথে ব্রহ্মপুত্র নদ ছাড়া অন্য কোনো বড় বাধা ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কামালপুর সীমান্ত দিয়ে মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য চলাচলের পথ নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মে মাসের মধ্যে কামালপুর এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেও প্রথম দিকে এখানে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করেনি। তারা বকশীগঞ্জ থেকে কামালপুরে অভিযান পরিচালনা করত। ৬ জুন থেকে কামালপুর বিওপিকে কেন্দ্র করে তারা এখানে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করে।

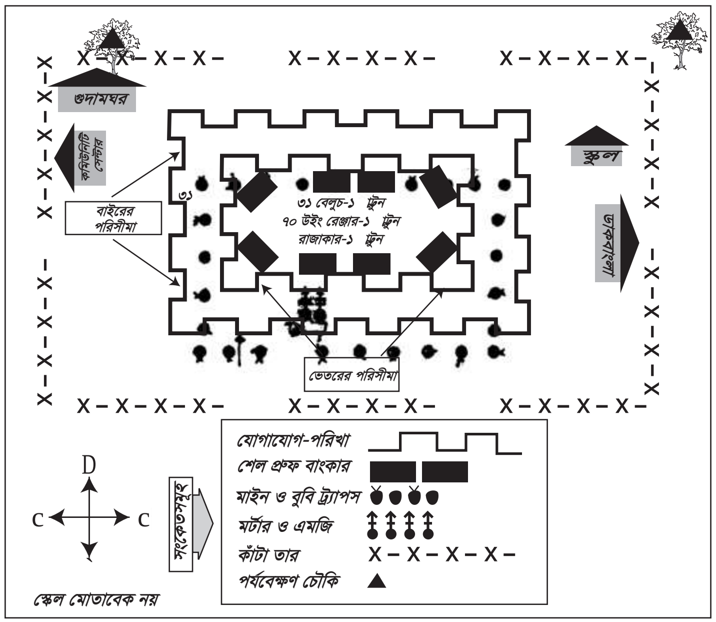

কামালপুর বিওপির প্রতিরক্ষা

পাকিস্তানি বাহিনী কামালপুরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আদর্শ প্রতিরক্ষা অবস্থানের চেয়েও শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। বিওপির চারপাশে মোটা গাছের গুঁড়ি ও শক্তিশালী কংক্রিট ব্যবহারের মাধ্যমে আর্টিলারি শেল প্রতিহত করার ক্ষমতাসম্পন্ন ৮টি বাংকার তৈরি করে। বাংকার তৈরির প্রথম স্তরে মাটি, তারপর টিনের দেয়াল, তারপর ৬ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট ব্যবধানে লোহার বিম ব্যবহার করে। এলাকার ওপর নজরদারি করার লক্ষ্যে বাংকারগুলো সমতলভূমি থেকে কিছুটা উঁচু করে তৈরি করে। বিওপি ঘিরে তৈরি করা প্রতিটি বাংকার অভ্যন্তরীণ টানেলের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। বাংকারের বহির্ভাগ প্রতিরক্ষার জন্য মাইন, কাঁটাতারের বেড়া, বুবি ট্র্যাপ এবং বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে। বিওপির চারপাশের ৫০০-৭০০ গজ দূরত্ব পর্যন্ত গাছপালা কেটে ফিল্ড অব ফায়ারের এলাকা পরিষ্কার রাখে। একইভাবে প্রতিরক্ষা অবস্থানের সামনে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধক সমস্ত গাছপালা কেটে ফেলা হয়। প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় দুটি স্তর ছিল, একটি নিকটবর্তী এবং অপরটি দূরবর্তী ব্যবস্থা। পাকিস্তানি বাহিনী দিনের বেলায় দূরবর্তী অবস্থানে এবং রাতের বেলায় নিকটবর্তী অবস্থানে প্রতিরক্ষা গ্রহণ করত। পূর্বসতর্কীকরণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিওপির কাছাকাছি পূর্ব দিকে সরকারি ডাকবাংলো ও গুদামঘর এলাকায় স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল মোতায়েন থাকত। বিওপির পূর্ব-উত্তর কোনায় ৬০০ গজ দূরে গুদামঘর ও উঁচু বটগাছের ওপর ছিল নিয়মিত লিসেনিং পোস্ট। এ ছাড়া প্রতিরাতে মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য প্রবেশপথগুলোতে নিয়মিত ও ঘন ঘন প্যাট্রোলিং করত। কামালপুর বিওপিকে প্রয়োজনীয় ফায়ার সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ব্যাটালিয়ন সাপোর্ট প্লাটুনের দুটি এমজি ও তিনটি ৮১ এমএম মর্টারও বিওপিতে মোতায়েন ছিল। এ ছাড়া কামালপুর বিওপি বকশীগঞ্জে অবস্থানরত ৮৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারির ফায়ার সাপোর্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিওপি ঘিরে নিয়মিত বাহিনীর একটি প্লাটুন মোতায়েন, সহযোগী হিসেবে আধা সামরিক

বাহিনী ও রাজাকার ইউনিট নিয়োগ এবং সর্বোপরি একজন ক্যাপ্টেনকে বিওপির দায়িত্ব প্রদান করায় বোঝা যায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কামালপুরের প্রতিরক্ষা অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। বস্তুত, পাকিস্তানি সেনারা কামালপুর-বকশীগঞ্জ-জামালপুর-ময়মনসিংহ অক্ষকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করে। কামালপুর বিওপিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে নিচের বিষয় দুটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ক. তাদের বিশ্বাস ছিল যে সীমান্ত অঞ্চলের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এ অবস্থান অত্যন্ত সহায়ক হবে এবং মেঘালয় থেকে নেমে আসা মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলায় এটি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. পশ্চিম দিকে যমুনা নদী থাকায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কামালপুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে না।

মুক্তিবাহিনীর অভিযান

প্রথম আক্রমণ

মে মাস থেকে কামালপুর এলাকায় আক্রমণের প্রস্তুতি চলতে থাকে। মূলত মহেন্দ্রগঞ্জে কেন্দ্রীভূত হওয়া ইপিআর সৈনিকদল এ আক্রমণের জন্য তৈরি হয়। ১২ জুন ইপিআরের ১৪৮ জন সেনা নায়েব সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে প্রথম কামালপুর বিওপি আক্রমণ করেন। এঁদের সঙ্গে স্বল্প প্রশিক্ষিত গণবাহিনীর সদস্যরাও অংশ নেন। এই আক্রমণে বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও কামালপুর অভিযান

সাংগঠনিক বর্ণনা: ২৫ মার্চের পর থেকেই দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নাজেহাল, হয়রানি ও ধ্বংস করার সামগ্রিক পরিকল্পনা অব্যাহত থাকে। চোরাগোপ্তা আক্রমণ বা গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুকে নাজেহাল, দুর্বল ও হয়রানি করা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে বিজয় অর্জনের জন্য প্রথাগত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে জুলাই মাসে মুক্তিবাহিনীর ফিল্ড ফরমেশন হিসেবে একটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স', ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। জেড ফোর্সের অধীন ছিল ১, ৩ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং দ্বিতীয় আর্টিলারি ব্যাটারি। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই ব্রিগেডকে মাত্র কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা হয়। স্বল্প সময়ে পুনর্গঠিত ব্যাটালিয়নগুলোর প্রশিক্ষণের মান ও যুদ্ধ-উপযুক্ততা বিচার এবং যুদ্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমান একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জেড ফোর্সের অধীন ব্যাটালিয়নগুলোর জন্য পৃথক পৃথক অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়। কামালপুরে শত্রুর শক্ত ঘাঁটি থাকায় ওই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত অভিযান পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল, তাই ফোর্সের যুদ্ধ-পরিকল্পনায় ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে কামালপুর বিওপি দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এ সময় ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী। রেজিমেন্টের অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন :

উপ-অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী
এ কোম্পানি কমান্ডার : ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান
বি কোম্পানি কমন্ডার : ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ
সি কোম্পানি কমান্ডার : লেফটেন্যান্ট মো. আবদুল মান্নান
ডি কোম্পানি কমান্ডার : ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ
অ্যাডজুট্যান্ট : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খাঁন
মেডিকেল অফিসার : মজিবর রহমান ফকির

কামালপুর বিওপি আক্রমণ—৩১ জুলাই ১৯৭১ : ফোর্স অধিনায়ক ৩০-৩১ জুলাই রাত ৩টা ৩০ মিনিট কামালপুর বিওপি আক্রমণের সম্ভাব্য তারিখ ও সময় নির্ধারণ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী রেজিমেন্টের অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ফোর্স হেডকোয়ার্টারের অপারেশন-আদেশের আলোকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন এবং কোম্পানিগুলোকে নিম্নরূপ দায়িত্ব দেন :

ক. বি এবং ডি কোম্পানি : অ্যাসল্ট কোম্পানি,
খ. এ কোম্পানি : কাট অফ কোম্পানি,
গ. সি কোম্পানি : এফইউপি (ফর্মিং আপ প্লেস) প্রোটেকশন ও গাইড

রেকি ও তথ্য সংগ্রহ: ২৮ জুলাই বিকেলে তথ্য সংগ্রহের জন্য বি কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন হাফিজ তাঁর কোম্পানির প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার আলী হোসেন,

সুবেদার ফয়েজ ও সুবেদার সিদ্দিককে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে কামালপুর বিওপির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেন। তারা লুঙ্গি পরে, মাথায় গামছা বেঁধে এবং খালি পায়ে কৃষকের বেশে বিওপির চারপাশের শত্রুর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেন। কাছ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান, তাদের গতিবিধি, টহলদানের প্রণালি ও নিত্যদিনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য ও খবরাখবর সংগ্রহ করে ক্যাপ্টেন হাফিজ তাঁর রেকি দল নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন।

একই দিন (২৮ জুলাই) রাতে ডি কোম্পানির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ রাত্রিকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য লেফটেন্যান্ট মো. আবদুল মান্নান, সুবেদার হাই, সুবেদার হাসেম ও নায়েক সফিকে নিয়ে কামালপুর এলাকায় রেকি করতে যান। রাতের অন্ধকারে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ পাকিস্তানি লিসনিং পোস্টের কাছাকাছি পৌঁছালে একজন পাকিস্তানি সেনা 'হল্ট' বলে চিৎকার করে ওঠে। ওই লিসনিং পোস্টে দুজন শত্রুসেনা ছিল। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ একজন সেনাকে কোনো সুযোগ না দিয়েই জড়িয়ে ধরে মাটিতে ধরাশায়ী করেন। এই সময় সুবেদার হাই কাছ থেকে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গুলি চালান। ফলে, দুজন পাকিস্তানি সেনাই ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এই দুই সেনার মাথার ক্যাপ ও রাইফেল নিয়ে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন এবং তাঁর দল নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

অন্যদিকে এই রেকির ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সতর্ক হয়ে যায়। তারা ধারণা করে যে এটি ভারতীয়দের কাজ, তারা এ-ও অনুমান করে যে ভারতীয় আক্রমণ আসন্ন। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে মুক্তিবাহিনী বা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা তাঁদের প্রতিরক্ষার অভ্যন্তরে ঢুকে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারে। ২৯ জুলাই লে. জেনারেল নিয়াজি কামালপুর এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত লোকবল ও অস্ত্র দিয়ে কামালপুরের প্রতিরক্ষা অবস্থানকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করা হয়।

২৯ জুলাইয়ের মধ্যে রেকি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কমান্ডাররা নিজ নিজ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে অধিনায়ক মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরীর কাছে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য উপস্থাপন করেন।

চূড়ান্ত আক্রমণ: ৩০ জুলাই বিকেলে রেজিমেন্ট অধিনায়ক বালির মডেলের সাহায্যে সামরিক কায়দায় যুদ্ধের চূড়ান্ত নির্দেশ দেন। বিওপির পূর্ব দিকে ডাকবাংলো ও গুদামঘর থাকায় সেদিক থেকে আক্রমণের গতি ও লক্ষ্য ধরে রাখা কষ্টকর হবে, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে শত্রু বাংকারের সংখ্যা বেশি থাকায় সেদিক থেকে আক্রমণ শক্ত প্রতিরোধের মুখোমুখি পড়বে, তাই চূড়ান্তভাবে উত্তর বা সম্মুখ

দিক থেকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অধিনায়কের নির্দেশের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল :

ক. লক্ষবস্তু : কামালপুর বিওপি,
খ. চূড়ান্ত আক্রমণের সময় (এইচ আওয়ার) : ৩১ জুলাই, ভোর ৩টা ৩০ মিনিট,
গ. অ্যাসেমব্লি এরিয়া (সম্মিলনের স্থান) : মহেন্দ্রগঞ্জ (ভারত),
ঘ. এফইউপি (আক্রমণের আরম্ভ রেখা) : কামালপুর বিওপির ১ হাজার গজ সম্মুখের খোলা মাঠ,
ঙ. আক্রমণকারী কোম্পানি : বি ও ডি কোম্পানি,
চ. এফইউপি মার্কিং, নিরাপত্তা এবং গাইড প্রদান : সি কোম্পানি,
ছ. ব্লকিং পজিশন : কামালপুর বিওপি থেকে ১ মাইল পেছনে উঠানিপাড়ার সন্নিকটে কামালপুর-শ্রীবর্দী রোড জংশন এলাকায় এ কোম্পানি ব্লকিং পজিশন তৈরি করবে।
জ. আর্টিলারি সাপোর্ট : ভারতীয় আর্টিলারি ব্যাটারি আক্রমণকারী কোম্পানিদ্বয়কে ফায়ার সহায়তা দেবে।
ঝ. ফোর্স অধিনায়ক, রেজিমেন্ট অধিনায়ক এবং অ্যাডজুট্যান্ট এফইউপি এলাকায় অবস্থান নেবেন।

৩০ জুলাই সূর্যাস্তের আগে মুক্তিযোদ্ধারা রাতের খাবার খেয়ে সূর্যাস্তের পরপরই সামরিক যানে চড়ে মহেন্দ্রগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রার আগে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অপারেশন উপযোগী করা হয়। পথে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়, ট্রাকে আচ্ছাদন না থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা ভিজে যান। মহেন্দ্রগঞ্জে পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হেঁটে সীমান্তের কাছাকাছি ভারতীয় এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাংলোয় ওঠেন। সেখানে কিছুক্ষণের বিরতির পর আবার যাত্রা শুরু করেন। দেশমাতৃকার জন্য প্রথম সম্মুখসমরে যাত্রা, তাই হয়তো বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে যাওয়ার পরও মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল পুরো মাত্রায় চাঙা থাকে।

আক্রমণের সময় ছিল ৩০ জুলাই দিবাগত রাত অর্থাৎ ৩১ জুলাই রাত ৩টা ৩০ মিনিট। সেদিন সন্ধ্যার পর অ্যাসেমব্লি এরিয়া থেকে নির্দিষ্ট পথে কোম্পানি অধিনায়কেরা নিজ নিজ মুক্তিযোদ্ধাসহ কামালপুরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু বৃষ্টির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের চলার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকার থাকায় গাইড আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এফইউপিতে পৌঁছাতে কিছু দেরি করে। অ্যাসল্ট ফরমেশন তৈরির আগেই মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের আক্রমণ-পূর্ব আর্টিলারি গোলার শিকারে পরিণত হন। ভারতীয় আর্টিলারির একটি গোলাও দুর্ভেদ্য শত্রু অবস্থানের ওপর পড়ছিল না। সতর্ক শত্রুরা আক্রমণ টের পেয়ে এফইউপিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর মর্টার ও

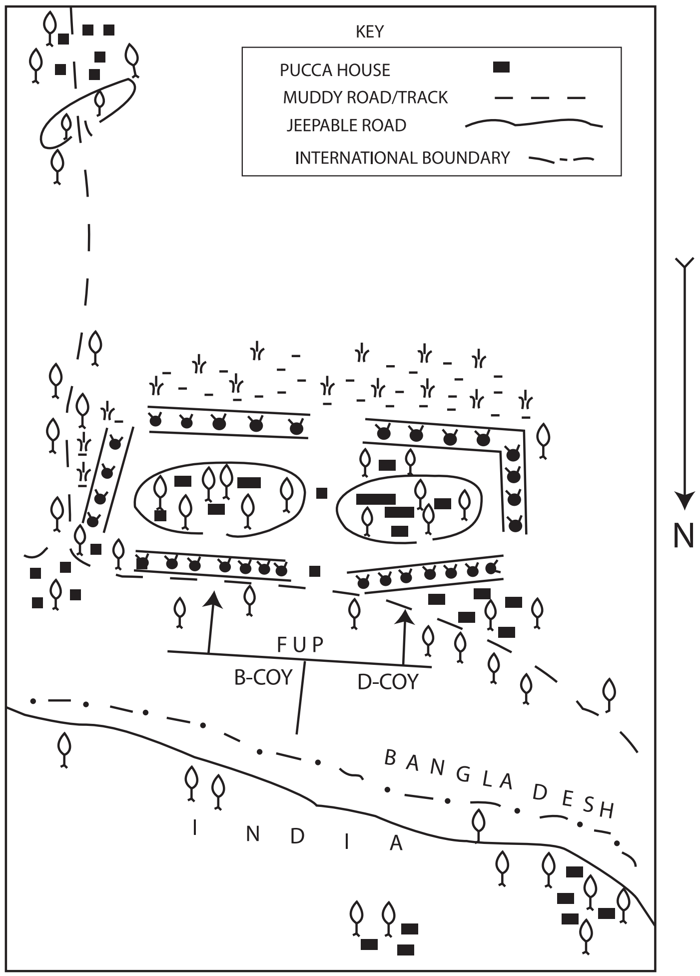

NOT TO SCALE

৩১ জুলাইয়ে কামালপুর বিওপি আক্রমণের নকশা (মেজর হাফিজের গ্রন্থ থেকে)

আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করতে থাকে, দূরপাল্লার ভারী মেশিনগানের গুলিও আসতে থাকে অবিশ্রান্ত ধারায়। ফলে কোম্পানি অধিনায়কদের পক্ষে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য ফর্মিং আপ করা অসাধ্য হয়ে পড়ে। এ সময় প্রাকৃতিক বা অন্য

কোনো কারণে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক বিকল হয়ে যাওয়ায় নিজ পক্ষের আর্টিলারি ফায়ার বন্ধ করাও সম্ভব হচ্ছিল না, একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে, শুধু চিৎকার ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার শেষ চেষ্টা চালানো হয়। এমনি পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও বি এবং ডি কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে এফইউপিতে পৌঁছার চেষ্টা করে এবং ফর্ম আপ করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা অল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁদের অনভিজ্ঞতা ও গাইডের সুষ্ঠু দিকনির্দেশনার অভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ রকম বৈরী পরিস্থিতিতে ফর্মিং আপ করার আগেই নিজেদের ও শত্রুপক্ষের ক্রসফায়ারে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হন। সাময়িকভাবে হলেও এ সময় আক্রমণ কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে। এমনি একটি পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণ ছিল স্বাভাবিক। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ এই অবস্থায় ভীষণ খেপে গিয়ে হাতের কাছের সেনাদের কাউকে ধাক্কা মেরে, কাউকে কলার চেপে ধরে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকেন। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সেনাদের মনোবল আবারও ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের অবস্থান শত্রুদের কাছে জাহির হয়ে যাবে জেনেও বিওপির কাছাকাছি পৌঁছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে মেগাফোনে উর্দুতে বলতে থাকেন—'আভি তক ওয়াকত হ্যায়, শালালোক সারেন্ডার কারো, নেহিতো জিন্দা নেহি ছোড়েঙ্গা।'

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন ও ক্যাপ্টেন হাফিজের প্রেরণায় মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল আবারও ফিরে আসে এবং সবাই বিপুল বিক্রমে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সৃষ্ট চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যেও শুধু মনের জোর ও অদম্য সাহসে উজ্জীবিত হয়ে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন ও ক্যাপ্টেন হাফিজ সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজ নিজ কোম্পানি নিয়ে সমন্বিত আক্রমণ রচনা করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়। পাকিস্তানি সেনারা প্রাথমিক অবস্থায় প্রথম সারিতে যে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়ে তুলেছিল, মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তারা তাদের প্রথম সারির অবস্থান ছেড়ে পেছনের প্রতিরক্ষা অবস্থানে সরে যায়। অর্থাৎ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার গভীরে শেলপ্রুফ বাংকারে ঢুকে সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ইতিমধ্যেই মুক্তিবাহিনীর ২০-২৫ জন সাহসী যোদ্ধা শত্রুর বাংকার অতিক্রম করে কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকে পড়েন এবং একপ্রকার হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে।

এদিকে সুবেদার হাই মাইন ফিল্ডে প্লাটুনসহ আটকে যান, ফলে তিনি আর এগোতে পারছিলেন না। সুবেদার হাইয়ের ডানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন

সালাহউদ্দীন বুঝতে পারেন যে শত্রুরা মাইন ফিল্ডের পেছনে সেকেন্ড লাইন প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় সরে গিয়ে সুবেদার হাইয়ের প্লাটুনের ওপর কাউন্টার অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন ম্যাগাফোনে সুবেদার হাইকে প্লাটুন নিয়ে ডানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আক্রমণের শুরুতে সুবেদার হাইয়ের সেনাসংখ্যা ছিল ৪০; আর যুদ্ধের এই পর্যায়ে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫-২০। এদিকে মাইনের আঘাতে নায়েক শফির হাত উড়ে যায়। অগ্রসরমাণ সেনারা তাঁদের নির্ভীক দলনেতা ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনকে আত্মরক্ষার জন্য পজিশনে যাওয়ার অনুরোধ করতে থাকেন। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন তাঁর সেনাদের একত্র করতে এবং আক্রমণ অব্যাহত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাঁর জীবন বিপন্ন করে আক্রমণ সফল করতে নিজের নিরাপত্তা ভুলে গেছেন। এমন সময় এমজির একঝাঁক গুলি এসে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের বুকে লাগে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আশপাশের সেনারা ছুটে আসেন, রক্তে ভিজে যায় মাটি, স্তিমিত হয়ে আসে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর। অতঃপর সালাহউদ্দীন স্বাধীনতার জন্য শহীদ হয়ে গেলেন। সালাহউদ্দীনের মৃতদেহ উদ্ধারে এগিয়ে যান এক বিহারি মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। মৃত্যু তাঁকে ছাড় দিলেও ৮টি গুলি লেগে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন।

আক্রমণের এমনি এক মুহূর্তে আর্টিলারির একটি গোলা ক্যাপ্টেন হাফিজের সামনে এসে পড়ে এবং তাঁর হাতের স্টেনগানটি উড়ে যায়। তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও স্প্লিন্টারের গোলার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন। অত্যন্ত সাবধানতায় তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে বি কোম্পানি একপ্রকার নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ হাতাহাতি যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করতে থাকেন, আর মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ পেছনে আসতে শুরু করে। ফলে, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের গতি আরও স্তিমিত হয়ে পড়ে।

পেছনে এফইউপির তত্ত্বাবধানে থাকা লেফটেন্যান্ট মো. আবদুল মান্নান উরুতে গুলি খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খাঁন একই জায়গায় থাকলেও সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান।

এমন সময় মেজর জিয়া মেজর মঈনকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আই উইল একসেপ্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কেজুয়্যালটি, শর্ট দেম আউট মঈন।' (আমি শতকরা ৯৫ জন হতাহত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ওদের নিশ্চিহ্ন করে দাও, মঈন)। এখানে উল্লেখ্য, ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে মেজর জিয়ার ফ্রন্টে থাকার কথা না থাকলেও ব্রিগেডের প্রথম আক্রমণ হিসেবে তিনি

সাংবাদিক হারুন হাবীবের ক্যামেরায় কামালপুর বিওপির ওপর ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মর্টার আক্রমণ

আক্রমণকারী সেনাদের সঙ্গেই ছিলেন।

ল্যান্স নায়েক রবিউল আহত ক্যাপ্টেন হাফিজ ও তাঁর ওয়্যারলেস সেটটি উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেওয়ার জন্য যুদ্ধের ময়দানে ছুটতে থাকেন। কয়েক কদম যাওয়ার পরপরই তাঁর দুহাতে গুলি লাগে। তার পরও ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধারের সংকল্প থেকে নায়েক রবিউলকে টলানো যায়নি। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি দেখতে পান যে ক্যাপ্টেন হাফিজকে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। পড়ে থাকা ওয়্যারলেস ও রকেট লঞ্চার ওঠানোর সময় ল্যান্স নায়েক রবিউলের বুকে

গুলি লাগে। রবিউল মুখ থুবড়ে পড়ে যান, তাঁর মুখ থেকে রক্ত পড়তে থাকে। ওই অবস্থায় তিনি জীবনের আশা ত্যাগ না করে নিকটবর্তী আখখেতের দিকে দৌড় দেন। বৃষ্টির মতো বর্ষিত গুলির মধ্যে কোনোমতে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে রবিউল আখখেতে গিয়ে পৌঁছান। এরপর তিনি বুঝতে পারেন, তিনি সহজে মারা যাচ্ছেন না। অন্যের সাহায্য ছাড়াই তিনি এগোতে পারবেন। এদিকে তাঁর বাঁ হাত থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। ডান হাতের হাড়টি বের হয়ে আছে, নাকেমুখে রক্তের ছাপ। এ অবস্থায় তাঁকে পালিয়ে যেতে দেখে এক গ্রামীণ মহিলা তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। তারপর ল্যান্স নায়েক রবিউল জ্ঞান হারান।

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের শাহাদাতবরণ আর ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লেফটেন্যান্ট মান্নানের আহত হওয়ার কারণে ইউনিটে একদিকে যেমন শোকের ছায়া নেমে আসে, অন্যদিকে কমান্ডারের অভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয়। নেতৃত্বহীন হলেও সেনারা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শত্রুর বাংকারে আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। এরই মধ্যে ভোরের আলো দেখা দেয়, বাংকারের মধ্যে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা লক্ষ্য স্থির করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এভাবেই সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টা বেজে যায়। লোকক্ষয় না করা শ্রেয় জেনেও মেজর মঈন উম্মাদপ্রায় মুক্তিযোদ্ধা দলকে পশ্চাদপসরণ করাতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুধাবন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিরাপদ জায়গায় এসে একত্র হতে থাকেন।

রোডব্লক : কামালপুর অভিযানের অংশ হিসেবে ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে এ কোম্পানি (কাট অফ পার্টি) ৩১ জুলাই রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে কামালপুর বিওপির এক মাইল দক্ষিণে কামালপুর-শ্রীবর্দী রোডজংশন ও উঠানিপাড়া এলাকায় আধা পাকা রাস্তার ওপর অ্যান্টিট্যাংক মাইন স্থাপন করে রোডব্লক প্রস্তুত করেন। দলের সদস্য ছিলেন ৬০ জন। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে মূল দল রোডব্লকের কাছে ওত পেতে থাকে, যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গাড়িগুলো মাইনের সাহায্যে বিধ্বস্ত হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতে পারে। মূল দলের ৩০০ গজ দক্ষিণে একটি ছোট দল অবস্থান নেয়। তাদের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভাব্য সাহায্যকারী দলের আগমন সম্পর্কে সংকেত প্রদান করা এবং মূল দলের ফায়ার শুরু হলে পলায়নরত পাকিস্তানি সেনাদের ধ্বংস করা। কাট অফ পার্টির আরও একটি দল মূল দলের ২০০ গজ উত্তরে অবস্থান নেয়। এই দলের দায়িত্ব ছিল সাহায্যকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কামালপুর বিওপিতে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া এবং

একই সঙ্গে পলায়নরত পাকিস্তানি সেনাদের ধ্বংস করা। কামালপুর বিওপিতে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের সংবাদে বকশীগঞ্জ কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থেকে দুই ট্রাক পাকিস্তানি সেনা সাহায্যকারী হিসেবে কামালপুর বিওপির উদ্দেশে যাত্রা করে। রাত ৪টা ৩০ মিনিটে উঠানিপাড়া এলাকায় স্থাপিত মাইনের বিস্ফোরণে গাড়ি দুটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে কাট অফ পার্টির সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানি সেনারা ভূমিতে অবস্থান নেয়। প্রায় আধা ঘণ্টা গুলি-পাল্টাগুলির পর পাকিস্তানি সেনারা এদিক-সেদিক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনীর গুলিতে হতাহত হয়। এই সংঘর্ষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৮-১০ জন সেনা নিহত হয় এবং ১২-১৪ জন আহত হয়। তাদের দুটি গাড়িই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্যও শাহাদাতবরণ করেন।

শহীদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ

ফলাফল : সার্বিকভাবে ৩১ জুলাইয়ের যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই জনবলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, উভয় পক্ষের লাশে কমিউনিটি সেন্টার ভরে যায়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনসহ ৩১ জন শাহাদাতবরণ করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ জানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনটি ট্রাকে করে তাদের লাশ নিয়ে যায় এবং কয়েকটি হেলিকপ্টারে গুরুতর আহতদেরও নিয়ে যেতে দেখা যায়। মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে প্রেরিত জেড ফোর্সের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে শত্রুর ৪০ থেকে ৭০ জন নিহত এবং ৩৫ জন আহত হয়েছিল।

প্রচলিত রণকৌশলের নিয়ম অনুযায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হলে শত্রুপক্ষের শক্তির তুলনায় তিন গুণ বেশি শক্তি নিয়ে আঘাত হানতে হয়। কিন্তু কামালপুর যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক কোম্পানি সেনার সমন্বয়ে গঠিত দুর্ভেদ্য ঘাঁটির বিরুদ্ধে মাত্র দুই কোম্পানি সেনা নিয়ে আক্রমণ করা হয়। তার পরও এই সেনাদের চার ভাগের তিন ভাগই ছিল কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণযোদ্ধা। তাঁদের বেশির ভাগই জীবনে কোনো দিন বন্দুক দেখেননি। অথচ অভিজ্ঞ ও

প্রশিক্ষিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা কুণ্ঠাহীনভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। শত্রুর গোলা ও প্রতিরক্ষার দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে তাঁরা একসময় শত্রুর বাংকারে ঢুকেও পড়েন। দুই পাশের সহযোদ্ধাদের মাইন ও গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়তে দেখেও তাঁরা থামেননি। দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে তাঁদের যুদ্ধস্পৃহা বরং বেড়েই চলছিল। এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থায় পৃথিবীর যেকোনো পেশাদার সেনাবাহিনীর পক্ষেও আক্রমণ করে সফলতা ছিনিয়ে নেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। অথচ এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ থেকে পিছিয়ে এসেও প্রকারান্তরে জিতেছিলেন।

যুদ্ধের ফলাফল ও হতাহত নিয়ে প্রাথমিকভাবে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তারা এ বিষয়ে ফোর্স অধিনায়কের কাছে ব্যাখ্যা চায়। ফোর্স অধিনায়কের ব্যাখ্যা (পরিশিষ্ট-১) বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তবে সদর দপ্তর ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকার উপদেশ দেয় (পরিশিষ্ট-২)। পরিশিষ্ট-১-এ আক্রমণ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কামালপুর যুদ্ধে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাঁদের তালিকা পরিশিষ্ট-৫-এ দ্রষ্টব্য। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ, লেফটেন্যান্ট মো. আবদুল মান্নান, তিনজন জেসিও এবং ৬৬ জন সেনা আহত হন। অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করায় বাংলাদেশ সরকার কামালপুরের কয়েকজন যোদ্ধাকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পদকে ভূষিত করে। কামালপুর যুদ্ধে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের খেতাবের সুপারিশের

9· Citation (giving date, time, place and full but precise account of the gallant action. Refer to enunciation of degree given in para 1 of HQ Bangladesh Forces letter No. 1015 A of 30 July 71).

PSS-10691 Capt Hafiz Uddin Ahmed is Commander of 'B' Coy 1 E Bengal. During attack on enemy position at Kamalpur at 0230 hrs on 31 July he led his Coy with great courage and eetermination. He boldly led his troops forward on to the objective through a minefield despite heavy shelling and small arms fire by enemy. During the assualt he was always seen with the leading element of his troops and inspired them to bolder actions. He was injured at the initial stage of assualt, but this could not deter him. He kept on moving forward and over ran the forward line of enemy bunkers through heavy shelling he crawled towards an enemy bunker and silenced a LMG by lobbing a grenade into it. All on a sudden he sustained six splinter injuries and had to be evacuated to the rear. Under his able leadership 'B' Coy succeded in inflicting heavy casualty on enemy.

For exibition of great courage and extreme gallantry in the face of heavy resistance, Capt Hafiz Uddin Ahmed is recommended for a gallantry award of high order.

ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদের বীরত্বের স্বীকৃতি (খেতাবের জন্য প্রেরিত সুপারিশপত্র হতে সংকলিত)

July
On the night 27/28 Lieut M Abdul Mannan accompanied Capt Salah Uddin in a recee Patrol inside enemy area Kamalpur. In the course of recee they suddenly came across two enemy sentries. There followed a hand to hand fight between Capt Salah Uddin and one of the two sentries, while the other sentry was being taken care of by N/Sub Abdul Hai who was the other member of the leading pair. Hearing the noise, Lieut M Abdul Mannan, in the mean while, had taken up position near the scene of the skirmish. Since he could not see (due to darkness) what was happenning before him, he decided to come closer. As he started forward, he heard Capt Salah Udding calling him for help. He went and found two figures restling about with one on top of the other. At this he pointed his sten on the top figure and asked in Bengali his identity. Capt Salah Uddin who was below replied als o in Bengali. On identification Lieut M Abdul Mannan pushed the enemy sentry aside and then shot him. Following this the party made a hasty withdrawal.

In the early hours of 31 July Lieut M Abdul Mannan was detailed to mark the FUP and organise initial line up of the assualting troops at the FUP. After having done his duty he was waiting behind the FUP for the CO to join him when he found that due to shell scare the troops were lagging behind. He immediately joined the assualting troops and exhorted the troops forward which was beyond the call of day. He kept pushing the troops forward through heavy enemy fire all the way up to the enemy bunkers. Suddenly at this point he got hit by enemy bullet in the thigh Despite the pain, he kept advancing forward but after a few yards he fell down. He was then evacuated from the enemy area back into own area.

For the exhibition of leadership, comradeship and courage Lieut M Abdul Mannan is recommended for an award of the High order.

C.T.C.

LT COL
CO
1 E BENGAL

লেফটেন্যান্ট মো. আবদুল মান্নানের (এম এ মান্নান) বীরত্বের স্বীকৃতি (খেতাবের জন্য প্রেরিত সুপারিশপত্র থেকে সংকলিত)

তালিকা পরিশিষ্ট-৩-এ দেওয়া হলো। এ ছাড়া বীরত্বের বর্ণনাসহ পদকের জন্য সুপারিশের কয়েকটি দলিল নিচে দেওয়া হলো।

কামালপুর অভিযান শেষে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল কামালপুর এলাকা ছেড়ে নতুন দায়িত্বে চলে যায়।

১১ নম্বর সেক্টর ও কামালপুর অভিযান

স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রারম্ভিক সময়ে কামালপুর এলাকা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সেক্টরের আওতাধীন ছিল না। ফলে, গণবাহিনীর তৎপরতা ভারতীয়

সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করত, জুলাই-আগস্ট মাসে মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। সারা বাংলাদেশকে ১১টি সামরিক সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। কামালপুর এলাকা ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন হয়। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মেজর আবু তাহেরকে আগস্ট মাসে ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিয়োগ দেওয়া হয়। ভারতের অভ্যন্তরে মহেন্দ্রগঞ্জে ১১ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন সেক্টর গঠন এবং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মেজর তাহের আসার পর মুক্তিযোদ্ধাদের নতুনভাবে সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়। সাংগঠনিক পুনর্গঠনের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে অভিযানও চলতে থাকে। কামালপুর বিওপির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেক্টর কমান্ডার এই ঘাঁটিতে উপর্যুপরি অভিযান চালাতে থকেন। নিচে এ ধরনের কয়েকটি অভিযানের বর্ণনা দেওয়া হলো :

বকশীগঞ্জ-কামালপুর সড়কে অ্যামবুশ—৯ আগস্ট ১৯৭১ : বকশীগঞ্জ থানা সদর থেকে একটি পাকা সড়ক কামালপুর বিওপি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই রাস্তা দিয়ে কোম্পানি সদর দপ্তর থেকে কামালপুর বিওপিসহ অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকায় যাতায়াত করত। আবার এ রাস্তা ধরেই বিওপি পর্যন্ত টেলিফোন লাইন সংযুক্ত ছিল। ৯ আগস্ট রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মুক্তিবাহিনীর হেলাল কোম্পানির কমান্ডার হেলালের নেতৃত্বে বকশীগঞ্জ-কামালপুর সড়কে একটি অ্যামবুশ বা ফাঁদ পাতা হয়। এ সময় অস্ত্রসহ টেলিফোন লাইন পাহারারত দুজন রাজাকারকে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। টেলিফোন লাইন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ফলে, বেশ কয়েক দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে।

কামালপুর বিওপি আক্রমণ—১৫ আগস্ট ১৯৭১ : আগস্ট মাসের প্রথম দিকে মেজর আবু তাহের কামালপুর বিওপি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনানুসারে ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুর বিওপি আক্রমণের জন্য রওনা হন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বলতে ছিল এলএমজি, রাইফেল ও কয়েকটি স্টেনগান।

কামালপুর বিওপিতে পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ শুরু করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীও এর পাল্টা জবাব দিতে থাকে। উভয় বাহিনীর মধ্যে দুই ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। আক্রমণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। এই অভিযানে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ১৫ জন আহত হন।

কামালপুর বিওপি আক্রমণ—১৬ আগস্ট ১৯৭১ : ১৬ আগস্ট সুবেদার মুনছুর ১৩৫ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল নিয়ে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণের জন্য বের হন। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তাঁরা কামালপুর ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু করলে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের আধুনিক ও শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী আক্রমণের বিপরীতে টিকে থাকতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করে। এই আক্রমণে আমানুল্লাহ কবিরসহ সাতজন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাতবরণ করেন।

কামালপুর বিওপি আক্রমণ—১৭ আগস্ট ১৯৭১ : মেজর আবু তাহের ১৭ আগস্ট পুনরায় কামালপুর ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে ১৫-১৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়, অন্যদিকে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হন।

কামালপুর এলাকায় অ্যামবুশ—২০ আগস্ট ১৯৭১ : ২০ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল কামালপুরের পথে অ্যামবুশ বা ফাঁদ পাতেন। একসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ফাঁদের মধ্যে এসে পৌঁছায়। টার্গেটে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুদের উদ্দেশে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত হয়ে যায়। এই আক্রমণে দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে তাঁদের ঘাঁটিতে ফিরে যান।

উঠানিপাড়া অ্যামবুশ—৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ : কামালপুর বিওপির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ধানুয়া ইউনিয়নে উঠানিপাড়া অবস্থিত। ৬ সেপ্টেম্বর বিকেলবেলা মেজর তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি দল উঠানিপাড়ার কাছে কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কের ওপর অ্যামবুশ বা ফাঁদ পাতার জন্য রওনা হয়। অভিযান এলাকার কাছাকাছি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে অ্যামবুশে কে কোথায় কেমন করে অবস্থান নেবেন, তা বারবার অনুশীলন করা হয়। মাঝরাতে দলটি তাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অ্যামবুশ পাতে। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, যতক্ষণ অ্যামবুশস্থলে শত্রু প্রবেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। অ্যামবুশ এলাকা থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে ফিরে এসে মেজর তাহের আরেকটি কোম্পানিকে অভিযানের জন্য তৈরি করেন। রাত দুইটার সময় নতুন কোম্পানিকে নিয়ে যাওয়া হয় কামালপুর বিওপির উত্তর-পূর্ব পাশে বামুনের পাড়া গ্রামে। পরিকল্পনা করা হয়

যে এই কোম্পানি বামুনের পাড়া থেকে বনজঙ্গলপূর্ণ পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করবে। মুক্তিযোদ্ধারা জানতেন, কামালপুর ঘাঁটি আক্রান্ত হলে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সাহায্যকারী দল বকশীগঞ্জ থেকে কামালপুরের দিকে রওনা হবে। উঠানিপাড়ার কাছে মুক্তিবাহিনীর দলটি তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ভোর চারটায় অ্যামবুশ দলসহ সড়কের ওপর মেজর তাহের অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধারা চারটি ৩ ইঞ্চ মর্টার সড়কের উত্তর পাশে স্থাপন করেন। অন্যদিকে আক্রমণকারী দলটি বামুনের পাড়া থেকে কামালপুরের দিকে এগিয়ে যায়। সারা রাত মুক্তিযোদ্ধারা ঘুমাতে পারেননি। আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনায় তাঁরা সব অবসাদ ভুলে গেছেন। ভোরে আক্রমণকারী দলটি কামালপুর ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়। একসময় তাদের তীব্র আক্রমণে ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টারগুলো কামালপুর ঘাঁটির পশ্চিম অংশে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। কিছুক্ষণ পর সকালের আলোতে দেখা গেল, বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা কামালপুর ঘাঁটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ঘাঁটির পূর্ব অংশ দখল করে নিয়েছেন।

ঘাঁটির পশ্চিম অংশের বাংকার থেকে শত্রুসেনাদের ছোড়া মেশিনগানের গুলি ক্রমাগত আসতে থাকে এবং এর সঙ্গে মর্টারের গোলাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। এতে দুজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান এবং ১৭ জন আহত হন। সকাল সাতটায় অ্যামবুশস্থলে পাকিস্তানি সাহায্যকারী দলটির প্রথম ট্রাক মুক্তিবাহিনীর পাতা মাইনে বিস্ফোরিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। এতে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্রাকটির পেছনেই ছিল একটি জিপ ও একটি ট্রাক। এই গাড়ি দুটি থেকে শত্রুসেনারা ত্বরিত গতিতে নেমে রাস্তার পাশে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে, এতে আরও পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। গোলাগুলি চলাকালে একদল পাকিস্তানি সেনা কামালপুর ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে বকশীগঞ্জ যাওয়ার চেষ্টা করে। এই দলটি অ্যামবুশকারী দলটির পেছনে এসে অবস্থান নেয় এবং মুক্তিবাহিনীর ওপর গুলি চালায়। এতে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং অপর চারজন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। এই আকস্মিক বিপর্যয়ে অ্যামবুশকারী মুক্তিযোদ্ধাদলটি তাদের অ্যামবুশস্থল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সামগ্রিকভাবে এই অভিযান ছিল একটি সফল অভিযান। অভিযান শেষে আনুমানিক ৩৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে বলে মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগরে খবর পাঠান।

ধানুয়া ও খাসের গ্রাম অভিযান—১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ : বকশীগঞ্জ থানার উত্তর প্রান্তে ধানুয়া ও খাসের গ্রাম অবস্থিত। ১০ সেপ্টেম্বরে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর যেকোনো আক্রমণের পরপরই পাকিস্তানি সেনারা বেপরোয়া হয়ে উঠত। বাংলাদেশের ভেতর মুক্তিবাহিনী তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে, এই ধারণা স্থানীয় জনসাধারণকে তারা দিতে চাইত না। তারা সব সময় এ কথা প্রমাণ করতে চাইত যে তারা অসীম শক্তির অধিকারী এবং পাকিস্তানকে তারা টিকিয়ে রাখবেই। তাদের এই মানসিকতার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা ধারণা করেন যে বিগত কয়েক দিনের উপর্যুপরি আক্রমণের কারণে ধানুয়া, কামালপুর ও খাসের গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানগুলোতে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করবে। মেজর তাহের পাকিস্তানি সেনাদের এ আচরণ বা ব্যবহারের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করেন।

৭ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কটি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দেন এবং কোনো প্রকার আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। ৮ তারিখ বিকেলবেলা জেড ফোর্সের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি মহেন্দ্রগঞ্জে আসে। কামালপুর এলাকার অবস্থান মজবুত করার জন্যই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটি সেখানে আনা হয়। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন মেজর মো. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। ৯ তারিখ ভোরবেলা মেজর জিয়াউদ্দিনকে ধানুয়া, কামালপুর ও খাসের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ধারণা করেন যে পাকিস্তানি সেনারা কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসে খাসের গ্রামের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালাবে। ৯-১০ তারিখ রাতে মুক্তিবাহিনীর খাসের গ্রাম অবস্থান মজবুত করার জন্য প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটি ওই প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় সংযুক্ত করা হয়। একই রাতে মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কে ব্যাপকভাবে অ্যান্টি-ট্যাংক ও অ্যান্টি-পারসোনাল মাইন স্থাপন করেন এবং ছোট ছোট দলে সড়কটির পাশে টহল শুরু করেন। কামালপুরের পূর্ব পাশেও টহলের জন্য মুক্তিবাহিনী একটি চলমান কোম্পানি নিয়োজিত করে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, বকশীগঞ্জ থেকে কোনো সাহায্যকারী দল এলে তাদের বাধা দেবে এবং কামালপুর থেকে যদি কোনো সেনা বের হয়, তবে তাদের আক্রমণ করবে।

১০ তারিখ সূর্যোদয়ের আগেই মুক্তিবাহিনী কামালপুর বিওপি চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। সরবরাহ ও সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কামালপুর বিওপিতে অবস্থানরত শত্রুর জন্য কেবল দুটি পথই খোলা থাকে—হয় রাতের অন্ধকারে ছোট ছোট দলে পলায়ন করা অথবা একত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ করা। মুক্তিযোদ্ধারা ধারণা করেন যে পাকিস্তানি সেনারা দ্বিতীয় পথটি

বেছে নেবে এবং ১০-১১ সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ আসবে। মুক্তিযোদ্ধারা রাতারাতি বেশ কিছু বাংকার তৈরি করে তাঁদের অবস্থান আরও মজবুত করেন। তাঁদের অবস্থানের সামনে থেকেই জলো মাঠের শুরু। পানির গভীরতা এক ফুট থেকে তিন ফুট। শত্রু মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ১০০ গজের মধ্যে এলে গুলিবর্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁরা বিওপি থেকে বেরিয়ে আসা কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা নিধন করতে সক্ষম হবেন। শত্রুসেনারা কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসে যখন আক্রমণ চালাবে, তখন সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পরিত্যক্ত কামালপুর ঘাঁটিটি দখলে নেওয়া সহজ হবে। এ জন্য এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধাকে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই কোম্পানিকে কী কাজ করতে হবে, তা নিরাপত্তার খাতিরে জানানো হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধারা ধরে নিয়েছিলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সন্ধ্যার আগে কোনো আক্রমণ করবে না। তাই অভিযানের বিভিন্ন দিক সমন্বয়ের জন্য দুপুরবেলা মেজর তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দূরে মাইনকার চর সাব-সেক্টরের দিকে রওনা হয়। মাইনকার চরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মেজর তাহের খবর পান যে ধানুয়া ও খাসের গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করেছে। খবর পেয়েই তিনি মহেন্দ্রগঞ্জে রওনা দেন।

বেলা আড়াইটার সময় মেজর তাহের মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার পরপরই কামালপুর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একদল সেনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে খাসের গ্রামের দিকে এগোতে থাকে। খাসের গ্রামে অবস্থিত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটি উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে শত্রু নির্দিষ্ট স্থানে আসার আগেই গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানি সেনারা এই গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে ভারী অস্ত্রসহ বেপরোয়াভাবে এগোতে থাকে। তাদের পাল্টা গুলিতে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নায়েব সুবেদার ও অপর একজন জোয়ান নিহত হন। সে সময় পেছন দিক থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলে যে বকশীগঞ্জ থেকেও আরেক দল সেনা আক্রমণ করতে আসছে। এতে কোম্পানিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং নিজ স্থান ছেড়ে তারা পিছিয়ে যেতে থাকে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ধানুয়া-কামালপুর অবস্থানের দক্ষিণ দিক থেকে একটি এলএমজি কোনাকুনিভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকলে খাসের গ্রামের ওপর আক্রমণরত পাকিস্তানি সেনারা হতাহত হতে থাকে এবং শেষ পর্যায়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। যে মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি চালাচ্ছিলেন, উত্তেজনাবশত তিনি

এলএমজির ব্যারেলটি বাঁ হাতে চেপে ধরে রাখেন, এতে তাঁর হাতের তালু সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়।

মেজর তাহের বেলা সাড়ে চারটার মধ্যে মহেন্দ্রগঞ্জে ফিরে আসেন। ক্যাম্পে পৌঁছে যে কোম্পানিটিকে তিনি বিওপি আক্রমণের জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের খোঁজ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়াই পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এই কোম্পানিকে কামালপুর বিওপির চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য প্রেরণ করা হয়। কোম্পানিটিকে এভাবে পাঠানোর ফলে মেজর তাহেরের পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। সেই সময় ওই কোম্পানি নিয়ে কামালপুর বিওপি আক্রমণ করলে হয়তো তা সহজেই দখল করা সম্ভব হতো।

কামালপুর বিওপি আক্রমণের কোনো উপায় না দেখে মেজর তাহের ধানুয়া-কামালপুরের দিকে রওনা হন, ধানুয়া-কামালপুর অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধারা তখনো অক্ষত ছিলেন। পথে দেখতে পান যে ছোট ছোট দলে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসছেন। তাঁদের আগের জায়গায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে মেজর তাহের খাসের গ্রামে পৌঁছান, সেখানে তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে একজন সঙ্গীসহ দেখতে পান। তিনি আরও দেখতে পান যে জলো মাঠের মাঝামাঝি জায়গা থেকে পাকিস্তানি সেনারা তাদের আহত ও নিহত সেনাদের নিয়ে যেতে ব্যস্ত।

সন্ধ্যার পর মেজর তাহের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটির মনোবলের কথা বিবেচনা করে খাসের গ্রামে না পাঠিয়ে অন্য একটি মুক্তিবাহিনী কোম্পানিকে সেখানে পাঠান।

এই অভিযানে যদিও মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতা ছিল, তবুও পরিকল্পনার দিক থেকে এর মূল্য ছিল অপরিসীম। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে জলো মাঠটিতে এনে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই অভিযানের পর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও আত্মনির্ভরতা বহুগুণে বেড়ে যায়।

কামালপুর ঘাঁটি অবরোধ—২ নভেম্বর ১৯৭১: ২ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী কামালপুর বিওপি অবরোধ করে। অবরোধের ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রেশন-সংকট দেখা দেয়। জামালপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি থেকে কামালপুরে জনবলসহ রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠায়। পথিমধ্যে এই রি-

ইনফোর্সমেন্টের ওপর মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কয়েকজন সেনা নিহত হয় এবং তাদের রেশন ও গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। ৪ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ৩ ইঞ্চ মর্টারের সাহায্যে শত্রুর প্রতিরক্ষায় গোলাবর্ষণ করলে তিনজন নিয়মিত ও তিনজন অনিয়মিত সেনা নিহত হয়।

কামালপুরের চূড়ান্ত যুদ্ধ

১১ নম্বর সেক্টর গঠনের পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই কামালপুর এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের আক্রমণ চালানো হয়। শত্রুকে চরম ব্যস্ত ও তটস্থ রাখাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। নভেম্বর মাস থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাত হানার তীব্রতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১১ নভেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধানুয়ায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করলে মুক্তিবাহিনীর একজন আহত হয়। সেক্টর কমান্ডার মেজর তাহের ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে কামালপুরে চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিকল্পনা করেন।

কামালপুর আক্রমণ : ১৪-১৫ নভেম্বর ১৯৭১

১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় মেজর তাহের সেক্টর অফিসারদের সঙ্গে কামালপুর ও বকশীগঞ্জের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে যুদ্ধাদেশ দেন। লেফটেন্যান্ট মান্নান, লেফটেন্যান্ট মিজান ও মাহফুজ তাঁদের নিজ নিজ কোম্পানি নিয়ে অপারেশনে যোগ দেন। এ ছাড়া মিত্রবাহিনীর গার্ড ও মারাঠা রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানি এই অভিযানে যোগ দেয়। পরিকল্পনানুযায়ী রাত ১১টায় তিন কোম্পানি কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে ধানুয়া ও কামালপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘাসিরপাড়া পজিশন নেয়। মেজর তাহের পান্না কোম্পানি এবং মির্জা লুৎফর রহমান, মো. সুরুজ্জামান, আ. কাইউম, মির্জা আজম, আবু তাহের, আ. করিম, আ. খালেক হায়দার আলী, প্রসন্নকুমারসহ কয়েকজন সেনাসদস্যকে বকশীগঞ্জ-কামালপুর সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে কাট অফ পার্টি হিসেবে অবস্থান নেওয়ার জন্য পাঠান। পান্না কোম্পানির কমান্ডার পান্না এবং মো. সুরুজ্জামান খান সড়কের ওপর মাইন স্থাপন করে ফিরে আসার পরপরই একজন মুক্তিযোদ্ধার রাইফেল থেকে মিস ফায়ার হওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা

মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান টের পেয়ে যায়। রাত দুইটা থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। এখানে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হলেও তাঁদের প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

রাত ১২টা থেকে কামালপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘাঁটির ওপর শেলিং শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী রাত সাড়ে তিনটার মধ্যে সব নির্ধারিত অবস্থানে ট্রেঞ্চ খনন করে অবস্থান নেয়। পশ্চিম দিকে ছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজ ও তাঁর বাহিনী। পূর্ব দিকে টেংরামারীতে আ. সালাম ভূঁইয়ার অধীন মাহফুজ কোম্পানি। উত্তর দিকে মিত্রবাহিনীর গার্ড ও মারাঠা রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানি। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ওয়্যারলেস সেট দ্বারা সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। কামালপুর বিওপির প্রতিরক্ষাব্যূহ খুব শক্তিশালী থাকায় ক্রমাগত মর্টার নিক্ষেপ করেও কিছুই করা সম্ভব হয় না। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে গোলাগুলি কমে যায়। এই সময় লেফটেন্যান্ট মিজানের সঙ্গে সদর দপ্তরের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। মেজর তাহের লেফটেন্যান্ট মান্নানকে লেফটেন্যান্ট মিজানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। বেলা প্রায় সাড়ে আটটার দিকে মেজর তাহের তাঁর অবস্থান থেকে কামালপুর ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। লেফটেন্যান্ট মিজান অপর প্রান্ত থেকে কামালপুর ক্যাম্পের দিকে এগোতে থাকেন।

আ. সালাম ভূঁইয়া, নজরুল ও মজিদ ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে কামালপুরের সন্নিকটে দেওয়ানগঞ্জ রাস্তায় অবস্থান নেন। মেজর তাহের কামালপুরের উত্তরে সীমান্ত বরাবর তেঁতুলগাছের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। ওয়াকিটকিতে আ. সালাম মেজর তাহেরকে জানান যে তিনি ও তাঁর দল শত্রুদুর্গের সন্নিকটে পৌঁছে গেছেন। বিজয় সন্নিকটে ভেবে মেজর তাহের তাড়াতাড়ি সামনে চলে আসেন।

সকাল প্রায় নয়টার দিকে শত্রুপক্ষের একটি শেল মেজর তাহেরের সামনে বিস্ফোরিত হয়। শেলের একটি স্প্লিন্টার মেজর তাহেরের পায়ে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এতে তাঁর সঙ্গের মুক্তিযোদ্ধা হেলাল, বেলাল, বাহার ও অন্য সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যেই লেফটেন্যান্ট মিজানও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। সবাইকে একত্রে দেখে মেজর তাহের শায়িত অবস্থা থেকেই সবাইকে পজিশন নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। কারণ, শত্রুপক্ষ একত্রে এতগুলো লোক দেখতে পেলে আবার মর্টার শেল ছুড়তে পারে। লেফটেন্যান্ট মিজান ও অপর দুজন মুক্তিযোদ্ধা মেজর তাহেরকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসে মহেন্দ্রগঞ্জ নিয়ে যান। মেজর তাহের মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে একটি

চিঠি লিখে থানার মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট মান্নানের কাছে পাঠান। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

> 'লেফটেন্যান্ট মান্নান
> লুক আফটার মাই বয়েজ। ক্লিয়ার দ্য রোড ফ্রম কামালপুর টু ঢাকা। আই হোপ শ্যাল মিট ইউ অ্যাট ঢাকা শুন। গো অ্যাহেড।

থানার ওসি চিঠিটি ১১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেন। গোলার আঘাতে মেজর তাহেরের একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু একটুখানি চামড়ার সঙ্গে ঝুলে ছিল। পরে মেজর তাহেরকে গুয়াহাটি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেক্টর কমান্ডারের আহত হওয়া এবং মুক্তিবহিনীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান জাহির হয়ে যাওয়ায় আক্রমণ বহাল রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লে তা স্থগিত করা হয়। মুক্তিবাহিনী মহেন্দ্রগঞ্জে ফেরত চলে আসে।

একই রাতে উঠানিপাড়াতেও মুক্তিবাহিনী একটি সফল অ্যামবুশের মাধ্যমে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে, একটি ভারী মেশিনগান, একটি হালকা মেশিনগান, একটি ২ ইঞ্চ মর্টারসহ বিপুল গোলাবারুদ দখল করে, এ ছাড়া বেশ কয়েকটি যানবাহনেরও ক্ষতি সাধিত হয়।

যৌথ বাহিনীর আক্রমণ

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়। যৌথ বাহিনীর লক্ষ্য ছিল ত্বরিত গতিতে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল এলাকায় বাংলাদেশের পক্ষে ১১ নম্বর সেক্টর এবং ভারতের পক্ষে ১০১ কমিউনিকেশন জোন অভিযানে অংশ নেয়। সার্বিক নেতৃত্ব থাকে ১০১ কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিলের হাতে। কামালপুর-জামালপুর এলাকা দখল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্রিগেডিয়ার এইচ এস ক্লের-এর নেতৃত্বাধীন ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে। ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের সদর দপ্তর ছিল তুরাতে। যুদ্ধ শুরুর দুই দিনের মধ্যে কামালপুর শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড তার দুটি ব্যাটালিয়ন, যথা—১ মারাঠা এবং ১৩ গার্ডস দিয়ে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে কামালপুর বিওপি অবরোধ করে। পাকিস্তানি সেনারা অনেকবার চেষ্টা করেও অবরোধে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর অবরুদ্ধ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর মেজর জেনারেল গিল আঘাত হানার নির্দেশ দেন।

ব্রিগেডিয়ার ক্লের কামালপুর বিওপিতে একটি মেকি আক্রমণ পরিচালনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল যে আক্রান্ত হলে শত্রু বকশীগঞ্জ থেকে আর্টিলারি সহযোগিতা প্রদানের জন্য মর্টার নিয়ে সামনে আসবে এবং তাদের ফাঁদে ফেলা হবে। ব্রিগেডিয়ার ক্লের ফাঁদের জন্য সম্ভাব্য জায়গা নির্বাচন করে ১ মারাঠাকে সেখানে প্রস্তুত রাখেন। ফাঁদ এলাকায় শত্রু মর্টার আসামাত্র ১ মারাঠা তাদের আক্রমণ করে এবং চারটি মর্টার ও যানবাহন ধ্বংস করে দেয়। ইঞ্জিনিয়ার অফিসার মেজর ভাতসা বিস্ফোরক দিয়ে এই ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি শত্রুর গুলিতে নিহত হন।

ব্রিগেডিয়ার ক্লের দুই ব্যাটালিয়নের সাহায্যে অবরোধ পুনরায় কার্যকর করেন। শত্রুর আরও ক্ষতিসাধনের জন্য অবরোধ অক্ষুণ্ন রেখে ২৭-২৮ নভেম্বর রাতে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একটি নিঃশব্দ বা সাইলেন্ট আক্রমণ চালানো হয়। হামলাকারী সেনারা বাংকারের খুব কাছাকাছি চলে এলে তাঁদের মধ্য থেকে কিছু শব্দ ও কাশির আওয়াজে আক্রমণের বিষয়টি শত্রুরা জেনে যায়। ফলে, তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো জেগে ওঠে। যৌথ বাহিনী ভারী ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে আসে। এই আক্রমণে একজন আর্টিলারি অফিসারসহ ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত

সাংবাদিক হারুন হাবীবের ক্যামেরায় আত্মসমর্পণের দুই মহানায়ক—বশির আহমেদ ও আনিসুল হক

হন। এরূপ ক্ষয়ক্ষতিতে ব্রিগেডিয়ার ক্লের উদ্বিগ্ন হন, যাতে ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং যৌথ বাহিনীর মনে যেন নৈতিক সাহসের ঘাটতি না হয়, সে জন্য ব্রিগেডিয়ার ক্লের অবরোধ আরও প্রলম্বিত করেন। আগের আক্রমণে যৌথ বাহিনী আরও কিছু ক্ষতি স্বীকার করে নিলে হয়তো কামালপুর বিওপি দখল করা সম্ভব হতো, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর আগেই যৌথ বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতি মেনে নিতে ব্রিগেডিয়ার ক্লের প্রস্তুত ছিলেন না।

কিছু সময় বিরতি দিয়ে ব্রিগেডিয়ার ক্লের পুনরায় কামালপুর বিওপি আক্রমণ করেন, এই আক্রমণও বিপুল ক্ষয়ক্ষতিসহ ব্যর্থ হয়। এক কোম্পানি শত্রু অধিকৃত কামালপুর বিওপি দখলের জন্য পর পর দুটি ব্রিগেড পর্যায়ের আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় যৌথ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কমান্ডাররা ব্রিগেডিয়ার ক্লেরের অধিনায়কত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এরপর ব্রিগেডিয়ার ক্লের বিওপি দখলের জন্য আর কোনো আক্রমণের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে জেনারেল গিলের নিয়ন্ত্রণে কামালপুরে একটি ব্যাটালিয়নকে রেখে ব্রিগেডিয়ার ক্লের তাঁর ব্রিগেডকে নিয়ে বকশীগঞ্জের দিকে রওনা হন। ৩ ডিসেম্বর কামালপুর বিওপির ওপর তুমুল আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু এতেও বিওপির বিশেষ কোনো ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হয়নি। এরপর সিদ্ধান্ত হয় যে বিমান আক্রমণের সাহায্যে বিওপিকে

সাংবাদিক হারুন হাবীবের ক্যামেরায় কামালপুর রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য

কামালপুর যুদ্ধের স্মরণে স্মৃতিফলক

ধ্বংস করা হবে। ৪ ডিসেম্বর সকালে বিওপি কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসান বিওপি থেকে বেরিয়ে পেছনে চলে আসার জন্য ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের কাছে অনুমতি চান, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার তা প্রত্যাখ্যান করেন। ওই দিন বকশীগঞ্জ কোম্পানির কমান্ডার মেজর আইয়ুব কামালপুর বিওপিতে রেশন ও গোলাবারুদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বকশীগঞ্জ থেকে বেরিয়ে কামালপুর রওনা হন, পথে এক মারাঠার আক্রমণে মেজর আইয়ুবসহ নয়জন পকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

৪ ডিসেম্বর সকালে জেনারেল গিল কামালপুর বিওপির কাছাকাছি অবস্থানরত যৌথ বাহিনীর সেনাদের সরিয়ে নেন এবং ভারতীয় মিগ ২১ বিমান দ্বারা তিনটি মিশনে সাতটি এয়ার সর্টির সাহায্যে বিওপি আক্রমণ করেন। প্রতিটি মিশনের পর জেনারেল গিল বিওপি কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য একটি করে চিঠি পাঠান। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা এই চিঠি বিওপিতে পৌঁছে দিতেন।

সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে প্রথম হাওয়াই হামলার পর জেনারেল গিল

কামালপুর বিওপিতে প্রথম চিঠি পাঠান। তিনি ক্যাপ্টেন আহসানকে লিখেন :

> আপনি গত কয়েক দিন ধরে রসদ ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য চরম চেষ্টা করেছেন এবং আপনি যে ব্যর্থ হয়েছেন, তা তো আপনার জানাই আছে। সেই রসদ শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে পড়েছে।...আপনার চৌকির সময় শেষ হয়ে গেছে এবং আপনি যা কিছুই করুন না কেন, আমরা কামালপুর চৌকি ধ্বংস করবই। আমার এই চিঠি প্রেরণের উদ্দেশ্য আপনাদের এবং আমাদের উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো। যেহেতু গতকাল থেকে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছি এবং ধারণা করি আপনি জানেন যে, আমাদের বাহিনী এই মুহূর্তে আপনার বহু মাইল দক্ষিণে অভিযান পরিচালনা করছে।

ক্যাপ্টেন আহসান মেশিনগানের গুলির সাহায্যে পত্রের উত্তর দেন। দুপুরে দ্বিতীয়বারের বিমান হামলার পর জেনারেল গিল ক্যাপ্টেন আহসানকে লিখেন :

> আপনি আমার প্রথম বার্তাটিকে গুরুত্ব দেননি। আপনাকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করানোর জন্য এটাই আমাদের শেষ চেষ্টা। আপনার সাথে কিছু পূর্বে যে আচরণ করা হয়েছে [বিমান হামলা বোঝানো হয়েছে—সম্পাদক] তার স্বাদ আপনি আবারও গ্রহণ করবেন। যদি আপনি আত্মসমর্পণ করেন, আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, একজন সাহসী যোদ্ধার মর্যাদা আপনি পাবেন।

কিন্তু এবারেও ক্যাপ্টেন আহসানের তরফ থেকে কোনো সাড়া এল না। তবে দ্বিতীয় বিমান আক্রমণের পর পাকিস্তানিদের একটি বেতার আলাপন যৌথ বাহিনীর বেতারে ধরা পড়ে। এতে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসানকে নিশ্চিত করেন যে শিগগিরই তাঁর চৌকিতে সাহায্য পৌঁছাবে। তৃতীয় বিমান হামলার পর জেনারেল গিল তাঁর শেষ চিঠি পাঠান :

> দয়া করে ১৬০০ ঘটিকার মধ্যে জানান যে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন কি না, আমি কোনোভাবেই আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না। এটা খুব ভালো হয়, যদি আপনি পত্রবাহকের সাথেই চলে আসেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।

বিওপি থেকে আবারও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে এর উত্তর এল। জেনারেল গিলের কাছে বিওপি আক্রমণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকল না। তিনি রাতে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।

দীর্ঘ অবরোধ আর সময়মতো সরবরাহ না পৌঁছানোর ফলে পাকিস্তানি সেনাদের তরফে অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব দেখা দেয়। শেষ মুহূর্তে কামালপুর বিওপিতে মাত্র ২০০টি এলএমজির গোলা, ৩ ইঞ্চি মর্টারের ১২টি শেল, ২ ইঞ্চি মর্টারের ১০টি শেল এবং গড়ে প্রতিটি রাইফেলধারীর কাছে ৭৫টি করে বুলেট ছিল।

৪ ডিসেম্বর রাত সাতটায় ক্যাপ্টেন আহসান মালিক সাদা পতাকাসহ চৌকি থেকে বেরিয়ে এসে জেনারেল গিলের কাজে আত্মসমর্পণ করেন। ভারী আর্টিলারির গোলাবর্ষণ ও বিমান আক্রমণ এবং ২১ দিনের অবরোধ শেষে কামালপুর বিওপি যৌথ বাহিনীর দখলে আসে। ক্যাপ্টেন আহসান ৩১ বালুচের ১ জেসিও, ৬০ অন্যান্য পদবির সেনা, ৪০ জন রেঞ্জার্স এবং ৪১ জন রাজাকারসহ আত্মসমর্পণ করে। ২১ দিন ধরে যৌথ বাহিনীর একটি ব্রিগেডকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য জেনারেল মানেকশ ক্যাপ্টেন আহসান এবং পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ করতে জেনারেল গিলকে নির্দেশ দেন।

উপসংহার

কামালপুর যুদ্ধ মুক্তিবাহিনীর অগাধ নিষ্ঠার স্মারকস্বরূপ সামরিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান পাবে এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিওপি প্রতিরক্ষার উজ্জ্বল প্রচেষ্টাও অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুক্তিযোদ্ধারা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বারবার এখানে আঘাত হেনেছে। এখানে নতুন নতুন যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কামালপুর রণক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর বিধ্বস্ত জিপের পাশে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কর্নেল আবু তাহের

এবং প্রতিবারই প্রতিপক্ষের তৈরি শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তার পরও মুক্তিবাহিনী হাল ছেড়ে দেয়নি।

কামালপুর যুদ্ধ ছিল বীরত্ব প্রদর্শনের যুদ্ধ। আক্রমণকারীরা বারবার বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করে আর প্রতিরক্ষাগ্রহণকারীরা প্রতিবারই বীরত্বের সঙ্গে তা প্রতিহত করে। তবে বিজয় চূড়ান্তভাবে ছিনিয়ে নেয় মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনী। বীরেরাই বীরদের সম্মান দিতে জানে, তাই প্রতিরক্ষাগ্রহণকারীদের বীরত্বও অকথিত থাকেনি। স্বয়ং ভারতীয় সেনাপতি জেনারেল মানেক'শ বলেন, 'সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর [কামালপুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধিনায়ক] কৃতিত্ব চমৎকার।'

সর্বোপরি কামালপুর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বহু সেনা তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। বহু মুক্তিযোদ্ধা এখানে শাহাদাতবরণ করেন। সম্ভবত কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান দখল তথা কামালপুর বিওপি দখলের জন্য বারবার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ১১ নম্বর সেক্টরের সেনারা সর্বোচ্চসংখ্যক বীরত্বসূচক খেতাব পেয়েছেন, যা অন্য কোনো যুদ্ধে কোনো সেক্টর পায়নি। কামালপুর যুদ্ধের অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ যেকোনো দেশের স্বাধীনতাকামী জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে। সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের যুদ্ধকৌশলীদের জন্যও কামালপুর যুদ্ধ নিঃসন্দেহে এক শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে।

নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের কলমে কামালপুর যুদ্ধ

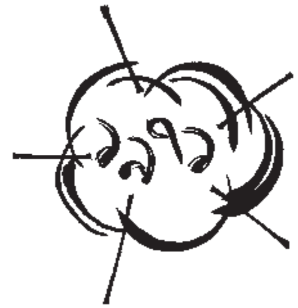

~~সাদা-৪৬~~

মেজর আবু তাহের, বীর উত্তম

মেজর (পরে লে. কর্নেল) আবু তাহের জুলাই মাসের শেষের দিকে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁকে ১১ নম্বর সেক্টরের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নভেম্বরের শেষে আহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দায়িত্বকালে কামালপুর দখলের জন্য কয়েকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কামালপুর যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি আহত হন। যুদ্ধ শেষে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'কে তাঁর দেখা স্বাধীনতাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অপারেশনের বর্ণনা দেন। মেজর তাহেরের এই বর্ণনা থেকে কামালপুর অংশটি নিচে উদ্ধৃত হলো।

মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও কামালপুর অভিযান

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে একটা জিনিস দেখে বারবার অবাক হয়েছি। দেখেছি, প্রত্যয় আর দৃঢ়তায় সকালের সূর্যের মতো হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচিত না হতে পেরে অতৃপ্তির ব্যথা নিয়ে ফিরে গেছে। তারপর যুবশিবিরে অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন, কখন জীবন দেওয়ার ডাক আসে। মহেন্দ্রগঞ্জ, মাইনকার চর, ডালু ও অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় ওরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। সবারই এক প্রশ্ন, আর কত দিন অপেক্ষা করব? একজন সৈনিক হিসেবে আমি বুঝতে পারি কখন মানুষ ভয়াবহ যুদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। রিক্রুটিং সেন্টারে লাইন দেখে আমি বুঝেছি, এ যোদ্ধারা জয়ী হবেই। কারণ পৃথিবীতে এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার দৃষ্টান্ত আর নেই। গণচীন থেকে শুরু করে ইন্দোচীনের স্বাধীনতাযুদ্ধ, কোনোটাই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মতো এ দৃষ্টান্ত রাখতে পারেনি। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবাতে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে,

ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রযুক্তির সঙ্গে। সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব ছাড়া বাংলার তরুণরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নেই। মুক্তিযোদ্ধারা এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে—অন্য কেউ নয়। যদি কোনো দল বা গোষ্ঠী এককভাবে মুক্তিযোদ্ধা তথা জনগণের এই বিজয়কে নিজের বলে মনে করে তা হবে অবৈধ, মিথ্যা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এত তীব্র ছিল যে বাঙালি জাতির জাতীয়তাবোধ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কারণ হওয়ার প্রখরতা অর্জন করেছিল। জাতীয় শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ দেশের জনগণ তথা তরুণসমাজকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার শক্তি জুগিয়েছে। এ কৃতিত্ব জনগণের, আর তরুণ সম্প্রদায়ের।

আগস্ট মাসে ১১ নম্বর সেক্টরের কার্যভার গ্রহণ করার পর পাকিস্তানিদের ঘাঁটির ওপর আমি কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করি। এই আক্রমণগুলো চালানোর ফলে পাকিস্তানি রণনীতি সম্বন্ধে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের দোষ-গুণগুলোও প্রকাশ পায়। পাকিস্তানিরা সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য প্রবেশপথগুলো বন্ধ করার জন্য সীমান্তে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। এই ঘাঁটিগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য তারা ব্যাপকভাবে কাঁটাতারের বেড়া ও মাইন ব্যবহার করে। ঘাঁটিগুলোর ভেতর মজবুত বাংকার তৈরি করা হয়, যা তাদের কামানের গোলা থেকেও বাঁচাতে পারে। ঘাঁটিগুলোতে নিয়মিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকার ও আলবদর রাখা হয়। সীমান্তবর্তী এই সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলো ছাড়াও সড়ক ও যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি ঘাঁটি গড়ে ওঠে। দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা ঘাঁটিগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত।

কামালপুর ছিল উত্তর সীমান্তে পাকিস্তানিদের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এই ঘাঁটির ওপর আমরা দুবার প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালাই। দুবারই মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, তথাপি তারা ঘাঁটিটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যখনই ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে, সে সময়ই তাদের ওপর পাকিস্তানিদের ব্যাপক ১২০ মিলিমিটার মর্টারের গোলা বর্ষিত হয়েছে। বকশীগঞ্জের পাকিস্তানি অবস্থান থেকে এই মর্টারের গোলা ছোড়া হতো। শত্রুসেনারা মজবুত বাংকারের ভেতরে থাকত বলে এই আক্রমণে তাদের কোনো ক্ষতি হতো না এবং অবস্থা বেগতিক দেখলেই তারা নিজ অবস্থানের ওপর নিজ মর্টার দ্বারা গোলাবর্ষণ করত। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানিরা

এই রণনীতির কথা চিন্তা করে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। কামালপুর ঘাঁটির ওপর এই দুটি আক্রমণ চালিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দোষগুলোকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বলতম দিক ছিল—রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের অভাব। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল লক্ষ্য অন্তরঙ্গ সাহচর্যের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় তা কোনো সময়ই ছিল না। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কীভাবে গণসংযোগ করতে হয় তা মুক্তিযোদ্ধারা জানত না। এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণে তারা জনসমর্থন হারিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সামরিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। কয়েক সপ্তাহের ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করা হতো নেতা। প্রায় ক্ষেত্রেই সামরিক জ্ঞানের অভাবে সংকট-মুহূর্তে সে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হতো। অবশ্য এই অল্প সময়ে সামরিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা সম্ভবপরও ছিল না। এই দুটি প্রধান দুর্বলতা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধারা সে সময়ে সরবরাহ ও অস্ত্রের দিক থেকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। আগস্ট মাসের শেষের দিকে ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের আমি নির্দেশ দিই, শত্রুর 'শক্তিশালী ঘাঁটি আক্রমণ থেকে বিরত থাকো। শত্রুকে কৌশলে প্রলুব্ধ করে তার শক্তিশালী ঘাঁটি থেকে নির্ধারিত স্থানে বের করে আনো এবং হত্যা করো।'

৭ [৬ সেপ্টেম্বর বিকেলেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়] ও ১০ সেপ্টেম্বরের অভিযানগুলো সুরক্ষিত কামালপুর ঘাঁটি থেকে শত্রুসেনাদের কৌশলে প্রলুব্ধ করে নির্ধারিত স্থানে বের করে এনে হত্যা করার সুন্দর উদাহরণ। এই অভিযানগুলো ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের বহুদিন মনে থাকবে। গেরিলাযুদ্ধের ছাত্রদের জন্যও এগুলো মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে।

কামালপুর শত্রুঘাঁটি থেকে ৫০০ গজ পশ্চিমে ধানুয়া কামালপুর গ্রাম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণে ঘাসিরপাড়া ও উঠানের পাড়া। ধানুয়া কামালপুর, ঘাসিরপাড়া, আর উঠানের পাড়া এই গ্রামের সারি এবং কামালপুরের মাঝে বিস্তীর্ণ জলো মাঠ। শত্রুকে এই জলো মাঠে বের করে আনতে হবে। এই জলো মাঠই হবে তাদের মরণফাঁদ। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে আমি ধানুয়া কামালপুর এবং ঘাসিরপাড়ায় একটি নকল রক্ষাব্যূহ রচনা করি। মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজকে এই রক্ষাব্যূহ গড়ে তোলার ভার দেওয়া হয়। (বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজ পরবর্তীকালে একটি অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে শহীদ হন)। মাহফুজ রাতের অন্ধকারে গ্রামবাসীদের সহায়তায় বাংকার ও ট্রেঞ্চ তৈরি করে ধানুয়া-কামালপুর ও খাসের গ্রামে আশ্রয় নেয়।

কামালপুর থেকে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, বকশীগঞ্জ-জামালপুর-টাঙ্গাইল সড়ক। ঢাকা দখলের জন্য সর্বাত্মক আক্রমণে এই সড়কটির গুরুত্ব অপরিসীম।

পাকিস্তানিরা এই সড়কের গুরুত্ব উপলব্ধি করত এবং সে জন্য তারা সড়কটির পাশে বিভিন্ন স্থানে মজবুত ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এই সড়ক ধরেই ১৬ ডিসেম্বর ১১ নম্বর সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বপ্রথম ঢাকা প্রবেশ করে।

কামালপুরের শত্রুঘাঁটিকে তার যোগাযোগব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। নকল রক্ষাব্যূহ থেকে কামালপুর ও বকশীগঞ্জের মাঝের সড়কটিতে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক অ্যান্টিট্যাংক মাইন স্থাপন করে। এই মাইন বিস্ফোরণে পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আগস্ট মাসের শেষের দিকেই পাকিস্তানিদের নয়টি সরবরাহ ও সেনাবোঝাই ট্রাক এতে ধ্বংস হয়। ৬ সেপ্টেম্বর বিকেলবেলা ধানুয়া কামালপুর রক্ষাব্যূহে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর একটি দলকে উঠানের পাড়ার কাছে কামালপুর বকশীগঞ্জ সড়কের ওপর অ্যামবুশ নেওয়ার নির্দেশ দিই। সড়কের খুব কাছে গিয়ে কেমন করে অবস্থান নিতে হবে, বারবার তার মহড়া দেওয়া হয়। মাঝরাতে এ দলটি তাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অ্যামবুশ পাতে। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যামবুশস্থলে শত্রু প্রবেশ না করে, সে সময় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। রক্ষাব্যূহ থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে ফিরে এসে আমি আরেকটি কোম্পানিকে অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকার নির্দেশ দিই। রাত দুটোর সময় তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কামালপুর ঘাঁটির উত্তর-পূর্ব পাশে অবস্থিত বামুনের পাড়া গ্রামে। বামুনের পাড়া থেকে বনজঙ্গলে পূর্ণ পথ দিয়ে কামালপুর ঘাঁটিতে পৌঁছানো যায়। ভোর সাড়ে চারটার সময় এই পথ দিয়ে এগিয়ে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে। আমরা জানতাম, কামালপুর ঘাঁটি আক্রান্ত হলে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি একটি সাহায্যকারী দল বকশীগঞ্জ থেকে কামালপুরের দিকে রওনা হবে। উঠানের পাড়ার কাছে মুক্তিবাহিনীর দলটি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাতের অন্ধকারে আমাদের চারটি তিন ইঞ্চি মর্টার বান রোডের উত্তর পাশে স্থাপন করি। ভোর চারটা। বান রোডের ওপর বসে আছি। আক্রমণকারী দলটি কামালপুরের দিকে এগিয়ে গেছে। সারা রাত আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি। আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনায় আমরা সমস্ত অবসাদ ভুলে গেছি। ভোর হয়ে আসছে। আক্রমণকারী দলটি কামালপুর ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ তাদের তীব্র আক্রমণ ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল। আমাদের মর্টারগুলো কামালপুর ঘাঁটির পশ্চিম অংশে গোলা নিক্ষেপ শুরু করল। কিছুক্ষণ পর সকালের আলোতে দেখা গেল বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা কামালপুর ঘাঁটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ঘাঁটির পূর্ব অংশ তাদের দখলে। ঘাঁটির পশ্চিম অংশের বাংকার থেকে তাদের ক্রমাগত

মেশিনগানের গুলি আসতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মর্টারের গোলা। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এতে দুজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারায় ও ১৭ জন আহত হয়। সকাল সাতটায় অ্যামবুশ হলে পাকিস্তানি সাহায্যকারী দলটির প্রথম ট্রাকটি অ্যামবুশকারী দলের স্থাপিত মাইন বিস্ফোরণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। এতে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্রাকটির পেছনেই ছিল একটি জিপ ও অপর এটি ট্রাক। এই গাড়ি দুটো থেকে শত্রুসৈন্যরা ত্বরিত নেমে রাস্তার পাশে অবস্থান নেয় এবং অ্যামবুশকারী দলটির সঙ্গে গুলি বিনিময় শুরু হয়। এতে আরও পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। বালুচ রেজিমেন্টের মেজর আইয়ুব জিপ থেকে নেমে আসার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে নিহত হয়। যখন এই গুলি বিনিময় চলছিল তখন একদল পাকিস্তানি সেনা কামালপুর ঘাঁটি থেকে পালিয়ে বকশীগঞ্জ যাচ্ছিল। এই পলাতক দলটি সে সময় অ্যামবুশকারী দলটির পেছনে এসে অবস্থান নেয় এবং তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ছয়জন পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েন। এই আকস্মিক বিপর্যয়ে অ্যামবুশকারী দলটি তাদের অ্যামবুশস্থল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই বিপর্যয় না ঘটলে সেদিন একটি পাকিস্তানিও অ্যামবুশস্থল থেকে ফিরে যেতে পারত না। সামগ্রিকভাবে এই অভিযানটি ছিল একটি সফল অভিযান। অভিযান শেষে আনুমানিক ৩৩ জন পাকিস্তানি সেনা আহত হয়েছে বলে আমি মুজিবনগরে খবর পাঠাই। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে সেদিনের রাতের খবরে বলা হয় যে, শেষ রাতে দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সেনা পাকিস্তানি সীমান্ত ঘাঁটি কামালপুর আক্রমণ করে। স্বল্পসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা এই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং ভারতীয় সেনাদের পেছনে হটিয়ে দেয়। এতে ৩০০ ভারতীয় সেনা নিহত হয় ও ৬৭ জন পাকিস্তানি সেনা শহীদ হয়। এ খবর শোনার পর আমরা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠি। নিঃসন্দেহে এই অভিযানে আমরা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে এনে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১০ সেপ্টেম্বরের অভিযানটিও শত্রুকে কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের করে আনার একটি সুন্দর কাহিনি। আমি লক্ষ করেছি, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের পরপরই পাকিস্তানি সেনারা বেপরোয়া হয়ে উঠত। বাংলাদেশের ভেতর মুক্তিবাহিনী তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে, এই ধারণা তারা স্থানীয় জনসাধারণকে দিতে চাইত না। তারা সব সময় এ কথা প্রমাণ করতে চাইত যে, তারা অসীম শক্তির অধিকারী এবং পাকিস্তানকে তারা টিকিয়ে রাখবেই। তাদের এই মানসিকতার জন্য আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এবার তারা আমাদের ধানুয়া কামালপুর ও খাসের গ্রাম অবস্থানগুলোয় আক্রমণ করবে। ৭ তারিখ দুপুর থেকে আমরা পাকিস্তানি সেনাদের কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কটি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দিই। এ সময়

তারা কামালপুরে অবস্থানরত ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সেনাদের সরিয়ে নতুন সেনা নিয়ে আসে। আমিও তাই চেয়েছিলাম। ৮ তারিখ বিকেলবেলা মেজর জিয়াউর রহমানের ব্রিগেডের প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি মহেন্দ্রগঞ্জে নিয়ে আসি। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। ৯ তারিখ ভোরবেলা মেজর জিয়াউদ্দিনকে আমি ধানুয়া কামালপুর ও খাসের গ্রামের অবস্থানে নিয়ে যাই। কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসে পাকিস্তানি সেনারা খাসের গ্রামের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালাবে বলে আমি ধারণা করি। এই অবস্থানকে মজবুত করার জন্যই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটিকে সেখানে রক্ষাব্যূহ তৈরি করার নির্দেশ দিই। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী (বর্তমানে মেজর ও প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক)। ৯ ও ১০ তারিখ রাতে কোম্পানিটি নিজ অবস্থান নেয়। সে রাতেই মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কে ব্যাপকভাবে অ্যান্টিট্যাংক ও অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন স্থাপন করে। সে সময় থেকেই তারা ছোট ছোট দলে সড়কটির পাশে প্যাট্রোলিংও শুরু করে দেয়। কামালপুরের পূর্ব পাশেও একটি চলমান মুক্তিবাহিনী কোম্পানি নিয়োজিত করা হয়। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, বকশীগঞ্জ থেকে কোনো সাহায্যকারী দল এলে তাদের বাধা দিতে এবং কামালপুর থেকে যদি কোনো সেনা বের হয়ে যায়, তাদের হত্যা করতে।

১০ তারিখ ভোরবেলা থেকেই আমরা কামালপুর ঘাঁটিকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে ফেলি। সরবরাহ বন্ধ, সড়ক যোগাযোগ বন্ধ, শত্রুর জন্য কেবল দুটো পথ খোলা রয়েছে—হয় রাতের অন্ধকারে ছোট ছোট দলে পলায়ন করা অথবা একত্র হয়ে আমাদের অবস্থানে আক্রমণ করা। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই ঘটবে বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। এই আক্রমণ আসবে ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর রাতে। ১০ তারিখ ভোরবেলা আমি ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীর রক্ষাব্যূহ পরিদর্শন করি। রাতারাতি বেশ কতকগুলো বাংকার তৈরি করে তারা তাদের অবস্থানকে মজবুত করে তুলেছে। তাদের অবস্থানের সামনে থেকেই জলো মাঠটির শুরু। পানির গভীরতা এক ফুট থেকে তিন ফুট। শত্রু ১০০ গজের মধ্যে এলে গুলিবর্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, এবার আমরা বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা নিধন করতে সক্ষম হব। এর সঙ্গে সঙ্গে কামালপুর ঘাঁটিও আমাদের দখলে আসতে পারে। শত্রুসৈন্যরা কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসে যখন আক্রমণ চালাবে, তখন সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পরিত্যক্ত কামালপুর ঘাঁটিটি দখলের জন্য বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজন হবে। এ জন্য আমি এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধাকে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিই। নিরাপত্তার খাতিরে এই কোম্পানিকে কী কাজ করতে হবে, তা

জানতে দিইনি। সে সময় সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। নিরাপত্তা বজায় রাখা তখন একটি দুরূহ ব্যাপার।

সন্ধ্যার পূর্বে কোনো আক্রমণ পরিচালিত হবে না বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। আরও বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে। তাই দুপুরবেলা মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দূরে মাইনকার চর সাব-সেক্টরের দিকে রওনা হয়ে যাই অপর একটি মুক্তিবাহিনী দলকে তাদের অভিযান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য। মাইনকার চরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমি খবর পাই যে, ধানুয়া ও খাসের গ্রামে আমাদের অবস্থানগুলো পাকিস্তানিরা আক্রমণ করেছে। এ খবর পেয়েই আমি মহেন্দ্রগঞ্জে ফিরে আসি। বেলা তখন সাড়ে চারটা। ক্যাম্পে পৌঁছে যে কোম্পানিটিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম, তাদের খোঁজ করি। আমার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানি আক্রমণের খবর পেয়ে এই কোম্পানিটিকে আমাদের অবস্থানগুলো সুদৃঢ় করার জন্য প্রেরণ করা হয়। কোম্পানিটিকে এভাবে পাঠানোর ফলে আমার পরিকল্পনা আংশিকভাবে বানচাল হয়ে যায়। সেই সময় কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুর ঘাঁটিটি আক্রমণ করলে তা সহজেই দখল করা যেত।

কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণের কোনো উপায় না দেখে আমি ধানুয়া কামালপুরের দিকে রওনা হয়ে যাই। পথে দেখি, ছোট ছোট দলে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসছে। তাদের পূর্বস্থানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমি খাসের গ্রামে পৌঁছি। তখন প্রায় সন্ধ্যা। পৌঁছে দেখি, বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটি বিশৃঙ্খলভাবে তাদের অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী একজন সঙ্গীসহ তখনো সেখানে রয়ে গেছেন। জলো মাঠটির মাঝামাঝি জায়গা থেকে তখনো পাকিস্তানি সেনারা তাদের নিহত এবং আহত সেনাদের নিয়ে যেতে ব্যস্ত। ধানুয়া-কামালপুরের অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধারা তখনো অটুট রয়েছে।

সেদিন বেলা আড়াইটার সময় আমার মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার পরপরই কামালপুর থেকে আনুমানিক দুই কোম্পানি সেনা আক্রমণের ধারা রচনা করে খাসের গ্রামের দিকে এগোতে থাকে। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটি উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে শত্রু আসার আগেই গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানি সেনারা এই গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে নানা যুদ্ধাস্ত্র সহকারে বেপরোয়াভাবে এগোতে থাকে। তাদের পাল্টা গুলিতে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নায়েক সুবেদার ও অপর একজন জওয়ান নিহত হয়। সে সময় পেছন দিকে কেউ চিৎকার করে বলে যে, বকশীগঞ্জ থেকেও একটি সেনাদল তাদের আক্রমণ করতে আসছে। এতে কোম্পানিটিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তারা নিজ স্থান ছেড়ে পলায়ন করে। এ সময় ধানুয়া-কামালপুরের দক্ষিণ দিকে

ছিল আমাদের একটি এলএমজি। এই এলএমজির কোনাকুনি গোলাবর্ষণে বহুসংখ্যক আক্রমণরত পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং শেষ পর্যায়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। যে মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি চালাচ্ছিল, উত্তেজনাবশত সে এলএমজির ব্যারেলটি বাঁ হাতে চেপে ধরে রাখে। এতে তার হাতের তালু সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা হত্যা এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তারই। সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে আমি নির্দেশ দিই তার কোম্পানি পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিতে যেতে। রাত নয়টার সময় বোঝা গেল, কোম্পানিটির মনোবল ভেঙে গেছে। তাই তাদের খাসের গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের জায়গায় পাঠানো হলো আরেকটি মুক্তিবাহিনী কোম্পানি। এই অভিযানে যদিও আমাদের অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে তথাপি পরিকল্পনার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। এই অভিযানকে একটি সুপরিকল্পিত অ্যামবুশও বলা চলে। শত্রুকে প্রলুব্ধ করে জলো মাঠটিতে এনে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম। এই অভিযানটির পর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও আত্মনির্ভরতা বহুগুণ বেড়ে যায়। 'হত্যা' কথাটি আমি বারবার ব্যবহার করেছি। অবশ্য নিয়মিত যুদ্ধে এই শব্দের বিশেষ ব্যবহার নেই; শত্রুকে পরাজিত করাই মূল উদ্দেশ্য। গেরিলাযুদ্ধে চিহ্নিত শত্রু মানবিক প্রশ্নে বড় অপরাধী। হত্যাই তার যোগ্য শাস্তি।

সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৬-৬-১৯৭৫

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দশম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়
জুন ১৯৮৪। পৃ.৬৫১-৬৫৭

ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম

ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) হফিজ উদ্দিন আহমদ স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলোতে যশোর সেনানিবাস থেকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল জুলাই মাসে কামালপুর দখলের উদ্যোগ নেয়। কামালপুর দখল-প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা নিয়ে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'কে তিনি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সাক্ষাৎকার দেন। এ ছাড়া ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর অবদান নিয়ে *iGî GfRv ‰Kvî i* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেও তিনি কামালপুর যুদ্ধ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন। উভয় বর্ণনায় পাওয়া কামালপুর অংশটি পৃথকভাবে নিচে উদ্ধৃত হলো।

কামালপুর যুদ্ধ

১.

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্নেল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, জাতীয় সংসদ সদস্য, বিমান ও নৌবাহিনীর মন্ত্রী) এম এ জি ওসমানী বেনাপোল পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি বেনাপোলে পৌঁছে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আমার ব্যাটালিয়ন পুনর্গঠিত করার কথা বলেন এবং ৬০০ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করে নিতে বলেন। তাঁর নির্দেশমতো আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন যুবশিবির থেকে প্রায় ৬০০ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআর বাছাই করে আমার ব্যাটালিয়নে নিয়ে নিই। উক্ত ইপিআর এবং তরুণদের বাছাই করার পর কর্নেল ওসমানী আমাকে মেঘালয় প্রদেশের তেলঢালা নামক জায়গায় যেতে বলেন। আমি পুরা ব্যাটালিয়ন নিয়ে তেলঢালা চলে যাই। তেলঢালায় প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের একত্র করা হয় এবং একটা ব্রিগেড গঠন করা হয়।

ব্রিগেডের নাম ছিল 'জেড ফোর্স'। ওই ব্রিগেড ফোর্সের ব্রিগেড কমান্ডার হন মেজর জিয়াউর রহমান। এখানে আমার ব্যাটালিয়নের নতুন রিক্রুট করা সেনাদেরও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩ জুলাই মেজর (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) মঈনুল হোসেন চৌধুরী আমার ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন এবং আমার কাছ থেকে ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তা ছাড়া আরও কয়েকজন অফিসারকে ব্যাটালিয়ন অফিসার নিযুক্ত করেন; তাঁরা হলেন, যথাক্রমে ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আবদুল মান্নান, লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন। উল্লেখ্য, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন জুলাই মাসেই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন এবং আমাদের ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন।

সাক্ষাৎকারের তারিখ : ২৮-৯-১৯৭৩
সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দশম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়
জুন ১৯৮৪। পৃ. ৭১৪-৭১৫

২.

নবীন সৈনিকদের ট্রেনিং শেষ হলো একসময়, এবার তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষা করার পালা। জেড ফোর্সের কমান্ডার মেজর জিয়া প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের মাধ্যমে কামালপুর বিওপি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

শেরপুর [প্রকৃত অর্থে জামালপুর—সম্পাদক] জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম কামালপুর। এখানকার বিওপি এলাকায় শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে পাকিস্তানি নিয়মিত সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্টের প্রায় দেড় শ সৈনিক (কোম্পানি প্লাস)। রক্ষাব্যূহের চারদিকে মোটা গাছের গুঁড়ি এবং কংক্রিটের সাহায্যে তারা গড়ে তুলেছে দুর্ভেদ্য বাংকার। এসব বাংকার ধ্বংস করতে প্রয়োজন গোলন্দাজ বাহিনীর মিডিয়াম কামানের গোলা। পদাতিক বাহিনীর ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলার আঘাতে এর কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। এর চারদিকে পাতা রয়েছে অ্যান্টিট্যাংক ও অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন, রয়েছে যথারীতি কাঁটাতারের বেড়া। সর্বোপরি, এ ঘাঁটির চারদিকে দেড় শ থেকে দুশো গজ পর্যন্ত এলাকার গাছগাছালি কেটে রাখা হয়েছে, যাতে আক্রমণকারী (মুক্তিবাহিনীর) সৈনিকদের রাইফেল ও মেশিনগানের গুলিতে সহজেই ঘায়েল করা সম্ভব হয়। পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীর ১২০ মিলিমিটার কামানও তাদের সাহায্যে ছিল

সদা প্রস্তুত। অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যাপারে তারা কোনো ত্রুটি রাখেনি।

শত্রু এলাকার যাবতীয় খোঁজখবর নেওয়ার জন্য অনুসন্ধানী তৎপরতা (রেকি) শুরু করলাম আমি ও সালাহউদ্দীন। কামালপুরের উল্টো দিকে ভারত সীমান্তের ভেতরে অবস্থিত মহেন্দ্রগঞ্জ বিওপি। তার পাশেই মুক্তিবাহিনীর ১১ সেক্টরের যুব (এমএফ) ক্যাম্প।

সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বশেষ তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হলাম। একদিন বিকেলে আমি প্লাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার হোসেন আলী, সুবেদার ফয়েজ ও সিদ্দিককে নিয়ে কৃষকের ছদ্মবেশে কামালপুরে শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি রেকি করতে গেলাম। আমাদের পরনে মালকোচা মারা লুঙ্গি, কোমরে লুকানো পিস্তল, উদোম গা। মাথায় গামছা বেঁধে হাতে ধান কাটা কাঁচি নিয়ে আমরা শত্রুর বাংকারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের খাঁটি কৃষকের মতো দেখাচ্ছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি মনে মনে। মাঠে অন্য কয়েকজন কৃষক ধান কাটার ফাঁকে ফাঁকে বারবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। একজনের কাছাকাছি হতেই চোখ বড় বড় করে বলল, 'ভাই আর এগোবেন না, পালান এখান থেকে। আমরা সবাই মারা পড়ব।' বুঝলাম, আমাদের ছদ্মবেশ মাঠে মারা গেছে। শরীরের গড়ন এবং অপরিচিত মুখ সহজেই জানিয়ে দেয় আমরা কারা। কৃষকেরা বিপদের আশঙ্কায় পালাতে চাইছে, ১০০ গজ দূরেই শত্রুর ডিফেন্স। যাহোক তাদের আশ্বস্ত করে শত্রুর অবস্থান এবং যাতায়াতের রুটিন সম্পর্কে কিছু খবরাখবর নিয়ে দ্রুত ফিরে এলাম।

২৮ জুলাই রাতে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনও গেল কামালপুর শত্রু এলাকায় রেকি করতে, সঙ্গে লেফটেন্যান্ট মান্নান, সুবেদার হাই, টি জে হাসেম ও ল্যান্স নায়েক ইউসুফ। অন্ধকার রাত, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। দুঃসাহসী সালাহউদ্দীন ধীরে ধীরে শত্রু বাংকারের পঁচিশ গজের মধ্যে চলে এল। হঠাৎ দুজন পাকিস্তানি সেনা অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হলো, চেঁচিয়ে উঠল, 'হল্ট'। কিছু বোঝার আগেই সালাহউদ্দীন একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হলো দুজনের মল্লযুদ্ধ। বিশালদেহী পাকিস্তানি সেনা একপর্যায়ে তাকে নিচে ফেলে গলা টিপে ধরে। এগিয়ে এল সুবেদার হাই, পাকিস্তানি সেনার পিঠে স্টেনের ব্যারেল ঠেকিয়ে চাপাস্বরে সালাহউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, ওপরে কে?'

সালাহউদ্দীন বলে ওঠে, 'ওপরে সে।'

বিপদ বুঝতে পেরে পাকিস্তানি সেনা তাকে ছেড়ে দৌড়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়, পরমুহূর্তে হাইয়ের স্টেন গর্জে ওঠে। উভয় শত্রুসেনা ধরাশায়ী হয়। তাদের মাথার ফৌজি ক্যাপ এবং দুটি জি থ্রি রাইফেল নিয়ে রেকি পার্টি বীরদর্পে ফিরে আসে।

ক্যাপ ও জি থ্রি রাইফেল দেখে বোঝা গেল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট কামালপুরে অবস্থান করছে।

অবশেষে কামালপুর আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলো। যে সুরক্ষিত ঘাঁটি ভারী কামানের সাহায্য ছাড়া আক্রমণ করার কথা শুনে পেশাদার সৈনিকেরা শিউরে উঠবে, আমরা সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত ২০০ গ্রামীণ যুবক নিয়ে সেই ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাচ্ছি ৩১ জুলাই ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে। ভারতীয় মাউন্টেন ব্যাটারি হালকা গোলাবর্ষণ করে প্রথাগত (কনভেনশনাল) আক্রমণে আমাদের সহায়তা করবে বলে জানানো হলো। সামনের অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ হানবে আমার ব্রাভো কোম্পানি এবং সালাহউদ্দীনের ডেলটা কোম্পানি। শত্রুর অবস্থানের পেছনে এক মাইল দক্ষিণে কামালপুর-শ্রীবর্দী সড়কে উথানিপাড়াতে ব্লক পজিশন নেবে ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে আলফা কোম্পানি। এদের দায়িত্ব কামালপুরে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আগুয়ান শত্রু বাহিনীকে প্রতিরোধ করা এবং কামালপুর থেকে পশ্চাদপসরণরত শত্রুসেনাকে ঘায়েল করা। কামালপুর শত্রু অবস্থানের ৬০০ গজ সামনে আমাদের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে একত্র হওয়ার স্থান ফরমিং আপ প্লেস (এফইউপি) নির্ধারণ করা হলো। এর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো লেফটেন্যান্ট মান্নানের ওপর। সিও মেজর মঈন এবং ব্রিগেড কমান্ডার জিয়া থাকবেন আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার কাছাকাছি।

অধীনস্থ সৈনিকদের মডেলে সামরিক কায়দায় নির্দেশ (ভারবাল অর্ডার) দেওয়ার পর ৩০ জুলাই সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরই আমরা সামরিক যানে চড়ে যাত্রা করলাম মহেন্দ্রগঞ্জের উদ্দেশে। পথে নামল একটানা বৃষ্টি, সৈনিকেরা সবাই ভিজে গেল। আমি সবার আগে একটি কাভার্ড জিপে থাকায় তেমন ভিজিনি। পেছনে আসা সালাহউদ্দীন ভিজেছে খোলা জিপে। মহেন্দ্রগঞ্জে সবাই গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে সীমান্তের কাছাকাছি ভারতীয় এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাংলোয় (অ্যাসেম্বলি এরিয়া) পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বিরতি হলো।

চা খেয়ে কিছুটা ফ্রেশ হলাম, এত ভিজেও সৈনিকদের মনোবল চাঙা রয়েছে। সালাহউদ্দীন তার প্যান্ট-শার্ট খুলে বারান্দায় মেলে দিয়ে আক্ষেপ করে বলল, 'আমরা অফিসার, জিপে চড়ে এসেছি, বেচারা সৈনিকেরা খোলা ট্রাকে এভাবে ভিজল, কিছুই করতে পারলাম না।'

গভীর রাত। ঘরের কোণে একটি চৌকির শক্ত কাঠের ওপর পাশাপাশি শুয়ে আমরা মৃদুস্বরে যশোরে ফেলে আসা আনন্দমুখর দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করছিলাম। বছর দুয়েক আগে তেহরান, আঙ্কারা, ইস্তাম্বুলে পাকিস্তান জাতীয় দলের হয়ে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম। সেখানকার বিলাসবহুল পাঁচ তারকা হোটেলে অবস্থানের স্মৃতি, ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত স্টেডিয়ামে খেলার সুখকর

অভিজ্ঞতার কথা মনে ভেসে এল। হোটেল থেকে বেরোনোর সময় তরুণীরা অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ছেঁকে ধরত আমাদের। সেই আনন্দমুখর দিনগুলো কত দ্রুত হারিয়ে গেল! আজ বৈরী পরিবেশে জঙ্গলের ভেতরে শুকনো কাঠের ওপর শুয়ে আছি। এত দিন ছিলাম রক্ষণাত্মক ভূমিকায়, একটু পরই আক্রমণের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হবে আমাদের। হয়তো অনেকেরই জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে, অঙ্গহানি হবে। কার ভাগ্যে কী আছে একমাত্র ওপরঅলাই জানেন। যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে দেশবাসী কি আমাদের কথা মনে রাখবে, এ কথাই বারবার মনে আসছিল। আমাদের বাবা-মা, পরিবার-পরিজনের কথাও মনে হচ্ছিল। কারও খবরাখবর জানি না। সালাহউদ্দীনের বাল্যকাল তেমন আনন্দে কাটেনি। মা, সৎমা আর ভাইবোনেরা মিলে বৃহদায়তন সংসারে বেড়ে উঠেছে, আজ কে কোথায় কে জানে! হয়তো এসবই ভোলার জন্য সে তার প্রিয় গানটি নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় গুনগুন করে গাইছে, 'এইচ্যা কতা কইও না... ।'

একসময় বিশ্রামের পালা শেষ হলো। সামরিক রীতিনীতি অনুযায়ী শেষ মুহূর্তের চেকআপ, মেরি আপ করে, এফইউপির উদ্দেশে যাত্রা করলাম। লেফটেন্যান্ট মান্নান আমাদের সেনাদলকে এফইউপিতে পজিশন নেওয়ার স্থান দেখিয়ে দিল। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই অনির্ধারিতভাবে মাউন্টেন ব্যাটারি শত্রু অবস্থান লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু করে আমার কোনো নির্দেশ ছাড়াই। ঘটনার মুখে আমরা হতভম্ব, বেতার সেটে গান পজিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম, কোনো সাড়া নেই ওখান থেকে। একটি গোলাও শত্রু অবস্থানে পড়েনি, লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে, তদুপরি শত্রুকে চমকে দেওয়ার সুযোগ অর্থাৎ সারপ্রাইজ নষ্ট হলো। শত্রু আমাদের উদ্দেশ্য আঁচ করে আমাদের ওপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগল। তখনো আমরা শত্রুর অবস্থানের দিকে মুখ করে সৈনিকদের পাশাপাশি দাঁড় করাতে পারিনি। সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তবু বহু কষ্টে একসময় এফইউপিতে পজিশন নিয়ে আমরা 'আল্লাহ আকবর', 'জয় বাংলা' রণধ্বনি দিয়ে শত্রুর বাংকার অভিমুখে আক্রমণ চালালাম।

আক্রমণের দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। শত্রুর অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছি, পাশেই আমার বেতারযন্ত্র অপারেটর। শত্রু আমাদের অগ্রসরমাণ পুরো শরীর দেখতে পাচ্ছে, আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি তাদের বাংকারের মধ্যে রাইফেল বা মেশিনগানের কালো নল আর গুলির ফ্লাশ। একটি ছোট নালা পেরিয়ে, কাঁটাতারের বাধা অতিক্রম করে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছি আমরা। মাইন ফিল্ডে পড়ে গেলাম। হঠাৎ অপারেটর সিরাজ মাটিতে পড়ে গেল, তার একটি পা অ্যান্টি-পারসোনেল মাইনের আঘাতে উড়ে গেছে। একটি শেলের টুকরো এসে আমার

হাতের চায়নিজ স্টেনের বাঁটটি উড়িয়ে নিল, ব্যারেল কাছেই ছিটকে পড়ল। কামান এবং মর্টারের গোলায় চতুর্দিক আতশবাজির আলোর মতো আলোকিত হয়ে উঠছে। গোলার বিকট শব্দের সঙ্গে যোগ হয়েছে আমাদের হতাহতের আর্তচিৎকার। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। বেতারযন্ত্র আরেকজনের কাঁধে দিয়ে আমরা গ্রেনেড ছুড়ে এগিয়ে গেলাম দ্রুত এবং সামনের দুটি বাংকার দখল করলাম। চারদিকে আর্তনাদ শুনছি, আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে, ভোরের আলো ফুটছে। বেতারযন্ত্রে সালাহউদ্দীন ও মঈনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো পক্ষ থেকেই সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। শত্রু কিছুটা পিছিয়ে বাঁ দিকের অবস্থান থেকে আমাদের ওপর মেশিনগান ও রাইফেলের অবিরাম গুলিবর্ষণ করে চলেছে। আমাদের সামনে তেমন কোনো আড়ালও নেই। একটু পরই আমার কোম্পানি টুআইসি সুবেদার খায়রুল বাশার এসে জানাল আমাদের অনেক সৈনিক হতাহত হয়েছে। ডেল্টা কোম্পানির ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনও শহীদ হয়েছেন। এমন সময় কাছেই মর্টারের একটি শেল ফাটল। তাৎক্ষণিকভাবে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। হাতে ও কাঁধে কয়েকটি তীক্ষ্ণ টুকরো প্রবেশ করল। শার্টের কিছু অংশ রক্তে ভিজে গেল। দুজন ধরাধরি করে আমাকে পেছনে নিয়ে যায়। আমাদের দুটি কোম্পানিই কমান্ডারবিহীন হয়ে পড়ে। এত অধিকসংখ্যক হতাহত (৩০ জন নিহত, ৬৬ জন আহত) হওয়ার কারণে শত্রু অবস্থানের কিছু এলাকা দখল করেও একপর্যায়ে আমাদের পিছিয়ে আসতে হয়।

সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনভিজ্ঞ গ্রামীণ যুবকেরা কামানের সাহায্য ছাড়াই মাইন ফিল্ড, কাঁটাতার ডিঙিয়ে প্রমত্ত ঢেউয়ের মতো এগিয়ে গিয়ে কীভাবে এই সুরক্ষিত ঘাঁটির কিছু অংশ দখল করেছিল, সে কথা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। কোনো পেশাদার দক্ষ সৈনিকের পক্ষেও গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থন ছাড়া এ ধরনের মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। একমাত্র গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয়ী সুইসাইড স্কোয়াডের পক্ষেই এমন আক্রমণে অংশগ্রহণ সম্ভব, যাদের কাছে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন!

সূত্র : অধ্যায় ১২, রক্তেভেজা একাত্তর
মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ
সাহিত্য প্রকাশ
জুলাই ২০০৬, পৃ. ৭৬-৮০

৩.

এই আক্রমণ এবং যুদ্ধে আমাদের পক্ষে একজন অফিসারসহ ৩১ জন যোদ্ধা শহীদ হন এবং দুজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ ৬৫ জন আহত হন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, শত্রুপক্ষের প্রায় ৫০ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়। এই আক্রমণ যদিও পুরোপুরি সফলকাম হয়নি, তবু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় আক্রমণ ছিল। এই যুদ্ধে এটা প্রমাণ হয় যে, বাঙালি সেনারা সম্মুখসমরে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী ও সাহসী। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সেনাদের দ্বারা কাঁটাতারের ঘেরা এবং মাইন বসানোকে উপেক্ষা করে আমাদের যোদ্ধারা যেভাবে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, স্বল্পকালীন সামরিক ট্রেনিং নেওয়া যুবকেরাও অসীম বীরত্বের অধিকারী। এ যুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করায় নিম্নলিখিত কয়েকজনকে বাংলাদেশ সরকার বীরত্বের পুরস্কার দেন। (১) শহীদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ (বীর উত্তম), (২) ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম), (৩) লেফটেন্যান্ট আবদুল মান্নান। (বীর বিক্রম), (৪) সিপাহি আবদুল আজিজ (বীর বিক্রম), (৫) সিপাহি গোলাম মোস্তফা কামাল (বীর বিক্রম), (৬) নায়েব সুবেদার আ. হাই (বীর প্রতীক), (৭) নায়েক শফিকুর রহমান (বীর প্রতীক), (৮) শহীদ ল্যান্স নায়েক সিরাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক), (৯) ল্যান্স নায়েক রবিউল্লাহ (বীর প্রতীক), (১০) ল্যান্স নায়েক তাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক), (১১) সিপাহি তারিকুল ইসলাম (বীর প্রতীক), (১২) সিপাহি শফিউদ্দিন (বীর প্রতীক), (১৩) সিপাহি সাইদুর রহমান (বীর প্রতীক)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ : ২৮-৯-১৯৭৩

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দশম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়
জুন ১৯৮৪। পৃ. ৭১৬

ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, বীর বিক্রম

ক্যাপ্টেন (পরে মেজর জেনারেল) আমীন আহম্মেদ চৌধুরী চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পালিয়ে এপ্রিলে ভারতে যান। তাঁকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৪ আগস্ট নকশী-বিওপির যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে তিনি আহত হন। স্বাধীনতার পর তিনি কামালপুর-নকশী বিওপির যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেন, এমনকি গুয়াহাটি হাসপাতালে আহত যোদ্ধাদের কাছেও যান। এসব সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত তাঁর রচনাটি 'বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প' কর্তৃক গৃহীত ও মুদ্রিত হয়। রচনাটির কামালপুর অংশটি নিচে গ্রন্থিত হলো।

জেড ফোর্সের অপারেশনগুলো : প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর যুদ্ধ

মুক্তিসংগ্রামে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই শুরু করি আগস্ট '৭১-এর পর থেকে। এর আগে আমরা ছিলাম ডিফেন্সে, আর শত্রুরা আমাদের ওপর আক্রমণ করত। বিলোনিয়া যুদ্ধের পর থেকে শত্রুরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করে, আর আমরা আক্রমণকারীর। আমাদের ব্রিগেডের (জেড ফোর্স) প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন মেজর (বর্তমানে লে. কর্নেল) মঈনুল হোসেন চৌধুরী। (প্রথম ইস্ট বেঙ্গল) ডেলটা কোম্পানি নিয়ে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ ও ব্রেভো কোম্পানি নিয়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ এ আক্রমণের ব্যূহ রচনা করেন। আর ক্যাপ্টেন মাহবুব (পরে সিলেট রণাঙ্গনে শহীদ হন) কাট অফ পার্টি নিয়ে ওত পেতে বসেন শত্রুর ডিফেন্সের পেছনে। আক্রমণ করার সময় একটি বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তা হলো সিংহহৃদয়। ইংরেজিতে যাকে বলে লায়নহার্ট। ডিফেন্সে যারা থাকে, তারা বাংকারে থাকে, ফলে স্বভাবতই ছোট ছোট হাতিয়ার এমনকি ডাইরেক্ট আর্টিলারি শেল থেকে রক্ষা পায়। সে জন্যই সাধারণত দেখা যায় যে, একটি

ডিফেন্সকে আর্টিলারি থেকে শুরু করে ট্যাংক ও বিমান হামলা করে সেই ডিফেন্সকে তছনছ করে ফেলার পরও মাত্র দু-একজন সাহসী যোদ্ধা অকুতোভয় মনোবলে বলীয়ান হয়ে বাংকার থেকে সেই প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে মাথা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে না থেকে আক্রমণকারীর আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়। সকল প্রকার সুষ্ঠু আক্রমণই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়। আর সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন কমান্ডার নিজে চুপি চুপি শত্রুশিবির দেখে আসে। মিলিটারি ভাষায় এই চুপি চুপি দেখে আসার নাম হচ্ছে রেকি প্যাট্রোলিং। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ ছিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, অনন্যসাধারণ সৈনিক। পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন তিনি। যোগ দেওয়ার পর থেকে শত্রুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন।

ময়মনসিংহের কামালপুর বিওপি ছিল শত্রুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি, কারণ জল ও স্থল উভয় পথেই জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের প্রবেশদ্বার ছিল এ কামালপুর। তাই শত্রুরা এখানে বাংকারগুলো অত্যন্ত মজবুত করে তৈরি করে। বাংকারের প্রথম আস্তরে মাটি ও টিনের দেয়াল, তারপর ৬ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট ব্যবধানে রেলের লোহার বিম। এই একই প্রকার ব্যবধানে পাকা সিমেন্টের আস্তর। বাংকারের ওভারহেড কাভারের বেলায়ও একই প্রকার প্রস্তুতি নেওয়া হতো। প্রত্যেকটি বাংকারই প্রায় ঘরের মতো উঁচু, অন্যদিকে সমস্ত ডিফেন্স টানেলের মারফত যোগাযোগব্যবস্থা ছিল। এদিকে মাইন, বুবিট্র্যাপ ও বাঁশের কঞ্চি সমস্ত ডিফেন্সটিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো করে রেখেছিল। পর পর দুদিন রেকি করার পরও সালাহউদ্দীন স্বচক্ষে শত্রুশিবির দেখার জন্য লেফটেন্যান্ট মান্নানকে সঙ্গে করে তৃতীয়বারের মতো রেকি প্যাট্রোলিং নিয়ে নিজে শত্রুশিবিরের দিকে গেলেন। বিওপির কাছে পৌঁছে জমির আলের ওপর লেফটেন্যান্ট মান্নান, সুবেদার হাসিম, নায়েক শফি ও দলের অন্য সবাইকে রেখে শুধু সুবেদার হাইকে সঙ্গে করে শত্রুর বাংকারগুলো রেকি করতে গেলেন। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানিরা রাতে সব সময় সেকেন্ড লাইন ডিফেন্সে চলে যেত। কামালপুর রণাঙ্গনে শত্রুরা সাধারণত দিনের বেলায় অনেক এলাকাজুড়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকত, কিন্তু রাতের বেলায় দূরের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট অথচ ঘন ডিফেন্সে চলে যেত। খালি বাংকারগুলো দেখে সালাহউদ্দীন ও হাই আরও ভেতরে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় দুজন শত্রুসেনা সম্ভবত প্যাট্রোলিং করে ফিরে আসার সময় এদের দুজনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ১০৫ পাউন্ড ওজন আর ৫'-৫" উচ্চতাবিশিষ্ট ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছ'ফুট লম্বা খানসেনার ওপর, যার হাতে ৩০৩ রাইফেল। অন্ধকারে খানসেনা ভেবাচেকা খেয়ে 'আমি খালেদ' বলে নিজেকে সঙ্গীর কবল থেকে ছাড়াতে গিয়ে

নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। আসলে তারা মুক্তিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে খানসেনা সালাহউদ্দীনের হালকা দেহ মাটিতে ফেলে দিয়ে গলা টিপতে শুরু করল। সালাহউদ্দীন 'মান্নান' বলে চিৎকার করে উঠলেন। মান্নান ছুটে এসে স্টেন ধরে জিজ্ঞেস করল 'ওপরে কে?' সালাহউদ্দীন গোঙানির স্বরে বলল, 'ওপরে তো ওই শালা'। লেফটেন্যান্ট মান্নান গাবগাছের নিচে তাড়াতাড়ি পজিশন নিলেন। এদিকে সুবেদার হাই [অপর শত্রু সৈনিককে—সম্পাদক] 'হ্যান্ডস আপ' বলার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে খানসেনার জি-থ্রি রাইফেল কেড়ে নিলেন। কিন্তু খানসেনা মুহূর্তের মধ্যে পেছনের বাংকারে ঢুকে পড়ল। আর নায়েক শফি, যে এতক্ষণ ইতস্তত করছিল গুলি করবে কি করবে না (কেননা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কার গায়ে গুলি লাগে বলা মুশকিল), মুহূর্তের মধ্যে ধাবমান শত্রুর দিকে গুলি ছুড়ল। অবশ্য গুলি হাই ও খানসেনার মাঝখান দিয়ে চলে যায়। এদিকে শত্রু বাংকার থেকে গুলি ছুড়ল। সম্ভবত অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি বলে বাঁ পাশের দালানে গিয়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হাই বাংকার লক্ষ্য করে স্টেনের এক ম্যাগাজিন গুলি ছুড়ল। গুলি ছুড়ে জি-থ্রি রাইফেলসহ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের দিকে এগিয়ে এল। গাবগাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মান্নান আস্তে জিজ্ঞেস করল, কে? ত্বরিত বেগে 'আমি হাই' বলে সালাহউদ্দীনের ওপরে অবস্থানরত খানসেনাকে স্টেনের ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দিল। ওপরের লোকটি সালাহউদ্দীনকে ফেলে দৌড়াতে শুরু করল। সুবেদার হাই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। অতঃপর রাইফেল দুটি নিয়ে ওরা ত্বরিত বেগে শত্রুশিবির ত্যাগ করে।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসে সালাউদ্দীনের সাহস গেল আরও বেড়ে। এ রেকি প্যাট্রোলিং থেকে দুটি জিনিস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তা হলো, সুবেদার হাই ও ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের অদম্য সাহস ও অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। কিন্তু এতে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা প্রকাশ পায় যে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ আসন্ন, ফলে রাতারাতি শত্রুরা তাদের সেনাসংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল, তাতে কামালপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর ৩১-বালুচ ব্যাটালিয়নের সেনাসংখ্যা দাঁড়াল দুই কোম্পানিতে (রাজাকার ছাড়া)। দুদিন পর ৩০-৩১ জুলাই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল (সিনিয়র টাইগার) রাতের আঁধারে রওনা হলো। প্রথমে সালাহউদ্দীনের ডেল্টা কোম্পানি, ফলোআপ কোম্পানি হলো ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্রেভো, যার পেছনে হলো ব্যাটালিয়ন 'আর' গ্রুপ এবং এই 'আর' গ্রুপে ছিলেন মেজর (বর্তমানে লে. কর্নেল) মঈন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন কর্নেল (বর্তমানে মেজর জেনারেল) জিয়াউর রহমান। সম্ভবত ব্রিগেডের প্রথম অ্যাটাক সরেজমিনে তদারক করার জন্য কর্নেল জিয়া নিজেও অ্যাটাকিং ট্রুপসের সঙ্গে রওনা হন। আক্রমণের এইচ-আওয়ার ছিল ৩০/৩১ জুলাইয়ের রাত ৩টা ৩০ মিনিট। কিন্তু গাইডের অভাবে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল

এফ-ইউ-পিতে সময়মতো পৌঁছাতে পারেনি। ফলে, ৩টা ৩০ মিনিটের সময় টাইম প্রোগ্রাম মোতাবেক আমাদের নিজস্ব আর্টিলারি ফায়ার যখন শুরু হয় (ফায়ারের সংকেতধ্বনি ছিল হিস করে ওয়্যারলেসের ওপর শব্দ করা) তখনো আমাদের ছেলেরা এফইউপিতে পৌঁছার জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে। কাদামাটিতে এতগুলো লোকের এই দৌড়াদৌড়ির ফলে যথেষ্ট শব্দ হয়, তাতে দুশমনের পক্ষে আক্রমণের ডাইরেকশন নির্ধারণ করা একেবারে সহজ হয় এবং নিমেষের মধ্যে তাদের আর্টিলারি ফায়ার এসে পড়তে থাকে। এদিকে প্লাটুন পর্যায়ে ডেপথ (টু-আপ) হওয়ার ফলে লোক আগেপিছে হয়ে যায়। ফলে, কমান্ড কন্ট্রোল কায়েম করা ভয়ানক মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অ্যাসেম্বলি এরিয়া থেকে পূর্বনির্ধারিত এফইউপিতে আসার মাঝপথে আমাদের নিজস্ব আর্টিলারি ফায়ার শুরু হওয়াতে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতেই কোনোক্রমে ফর্ম-আপ হতে থাকে। ফলে সে কী চিৎকার আর হট্টগোল! আবার ডাইরেকশনের অভাবে অ্যাডভান্স করাকালীন একে অন্যের ওপর চড়ে বসে। আর অপেক্ষাকৃত নিচু কর্দমাক্ত জমির ওপর আসার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি ও আমাদের যুগ্ম আর্টিলারি ক্রসফায়ারিংয়ের নিচে আসার ফলে আমাদের বেশকিছু ছেলে হতাহত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ওয়্যারলেস সেট জ্যাম হওয়াতে সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। তাতে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, হাটবাজার বসেছে আর নীলকর আদায়কারী সাহেবদের দেখে কে কোথায় পালাবে পথ পাচ্ছে না। এ অবস্থায় প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। বরং সেনাদের পক্ষে পালিয়ে আসাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ, অ্যাটাকিং ট্রুপস যদি ঠিকমতো ফর্ম-আপ না হতে পারে, তবে তাদের পক্ষে আক্রমণ করার প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বার্কি সেক্টরে বিআরবির ওপারে ভারতের এক ডিভিশন সেনা যখন ফর্ম-আপ হচ্ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানি তিনটি মাত্র ট্যাংক আচম্বিতে সে সেনাদলের ওপর হামলা চালায়। ফলে, ভারতীয় সেনাদল পালিয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে এ ঘটনা অহরহ ঘটেছে ও ঘটবে। এদিকে কর্নেল জিয়াউর রহমান বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, 'কাম অন, অ্যাট অ্যানি কস্ট উই লঞ্চ দি অ্যাটাক।' মেজর মঈন (বর্তমানে লে. কর্নেল) ওয়্যারলেস ছেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিলেন। আর ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন ও হাফিজ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল প্রসিডিউরের চামড়া পর্যন্ত তুলে ফেলেছে, অন্যদিকে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মেগাফোনে বাংলা-ইংরেজি-উর্দুতে মিশিয়ে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল তার সেনাদলকে। কারোর বা কলার ধরে লাইন সোজা করে আগের দিকে (টারগেটমুখী) মুখ করে দিচ্ছে, আর কাউকে বা হাফিজ স্টেনের বাট দিয়ে মারছে। মোগল-রাজপুতের প্রথম যুদ্ধে আশিটি যুদ্ধে

বিজয়ী রানা সংগ্রাম সিংহের বিপুল রণাভিজ্ঞ সেনাবাহিনীকে দেখে আকারে ছোট মোগল বাহিনী ভড়কে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রারম্ভেই। কিন্তু ভেলকিবাজির মতো বাবর সেনাবাহিনীকে বাগে এনে বিপুলবিক্রমে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। তাই সামরিক নেতা হিসেবে ইতিহাসে বাবরের স্থান অতি উঁচুতে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন ও হাফিজের কৃতিত্ব বুঝি সেখানেই। চরম বিশৃঙ্খলার মাঝে শুধু মনের জোর ও অদম্য সাহসে বলীয়ান হয়ে সালাহউদ্দীন ও হাফিজ সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজ নিজ কোম্পানিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত করতে সক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আক্রমণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। যুদ্ধের ময়দানে ফলাফলটা সব সময় সবকিছুর পরিমাপক নয়, বরং ঘটনাটি কীভাবে সংঘটিত হলো, সেটাই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় মহাসমরে মন্টগোমারির কাছে রোমেল চরমভাবে মার খেলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, মাইলের পর মাইল পশ্চাদপসরণ অভিযান অব্যাহত রাখতে হয়েছে তাঁকে সাহারার দুস্তর মরুর পথে পথে। অথচ মন্টগোমারির বিজয়াভিযানের চেয়ে তাঁর এই পশ্চাদাভিযানই সবার মনে অনুপ্রেরণা জোগায়। তাই বুঝি রোমেল শুধু রোমেলই।

এফইউপির চরম বিশৃঙ্খলা থেকে সামান্য রেহাই পেয়ে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল সবেমাত্র অগ্রসর হয়েছে, অমনি পাকিস্তানি আর্টিলারি সেলভো ফায়ার এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হতোদ্যম সেনারা মাটিতে শুয়ে পড়ল। শেষ মুহূর্তে বুঝি আর আক্রমণ করা সম্ভব হলো না দেখে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। একদিকে সমগ্র বাঙালি জাতির মান-ইজ্জতের প্রশ্ন, অন্যদিকে দুশো ছেলের জীবন। সালাহউদ্দীন তখন 'ক্ষ্যাপা, দুর্বাসা ছিন্নমস্তা চণ্ডী-রণদা সর্বনাশী, জাহান্নামের আগুনে বসে হাসছে পুষ্পের হাসি' মারছে লাথির পর লাথি। করিও বা কলার চেপে ধরে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল, 'বেশরম, বেগায়রত, শালা নিমক হারামির দল, আগে বাড়ো।' আবার সেনাদলের মন চাঙা করার জন্য নিজের অবস্থান জাহির হয়ে যাবে জেনেও পাকিস্তানি বাহিনীকে লক্ষ্য করে মেগাফোনে উর্দুতে বলছিল, 'অভিতক ওয়াকত হায়, শালালোক সারেন্ডার করো। নেহিতো জিন্দা নেহি ছোড়েঙ্গা।' তার পরের ইতিহাস প্রতিটি বাঙালির গৌরবের ইতিহাস। এ যেন শুধু ইতিহাস নয়, মুক্তিকামী মানুষের প্রাণবন্যার ইতিহাস। বাঙালি সেনারা তখন ছুটছে ঝড়ের মতো করতালি দিয়ে স্বর্গ-মর্ত্য করতলে। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মতো প্রথম ইস্ট বেঙ্গল মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ডিফেন্সের প্রথম সারির বাংকারগুলো। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো গুরুগর্জন করে সিনিয়র টাইগাররা 'জয় বাংলা' আর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তুলল যুদ্ধের ময়দান। বাংকার অতিক্রম করে ২০-২৫ জন কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকে

পড়লেন। তাদের মধ্যে মাত্র দু-একজন আহত অবস্থায় ফেরত আসতে পেরেছিলেন, আর বাকি সবাই হাতাহাতি যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। প্রচণ্ডভাবে তখন হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। বাঘের থাবাতে যত্রতত্র ভূপাতিত পাকিস্তানি সেনারা। পেছনে তখন আমাদের পক্ষের লাশ আসা শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল জিয়া তখন বলছেন, 'আই উইল একসেপ্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাজুয়েলটি বাট সর্ট দেম আউট মঈন।' আহত-ক্ষতবিক্ষত জওয়ানরা বলছে, 'স্যার, নিয়ে এলেন কেন? আর সামান্য বাকি, কী হতো, আমি না হয় মরে যেতাম।' গর্বে বুক ফুলে উঠছিল। পেছনের উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকেরাও বুঝতে পারছিলেন বাঙালিরা শুধু বসে বসে (এমনকি না খেয়ে) কবিতা লিখে কিংবা গালগল্প করে আর স্লোগান দিয়ে ভাবালুতার মাঝে দিন কাটায় না। যুদ্ধও করতে জানে বৈকি। আজ শুধু আফসোস হচ্ছে যে, আজকের পেপার-টাইগাররা যদি সেদিন যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন, তবে সম্ভবত আজ আর তারা আমাদের 'খোদার খাসি' বলার দুঃসাহস প্রকাশ করতেন না। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের গায়ে তখনো সেই রিলিফের সাদা শার্টটা ছিল। মহানগরের নিউ মার্কেটে গিয়ে মার্কেটিং করার অবসর তার ছিল না, না ছিল সংগতি কিংবা তেমন নিচু মনোবৃত্তি। তবে হ্যাঁ, বন্য পশুদের মতো আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি। তাই বুঝি লুঙ্গি মালকোচা বেঁধে সিভিল সার্ভিস অফিসার তৌফিক এলাহী যশোর রণাঙ্গনকে কাঁপিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এদিকে মাইন ফিল্ডে ফেঁসে যাওয়া সুবেদার হাইয়ের প্লাটুনের ডানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন বুঝতে পারলেন যে, শত্রুরা মাইন-ফিল্ডের পেছনের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে আরও পেছনে সেকেন্ড লাইনে সরে গিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মেগাফোনে হাইকে প্লাটুন নিয়ে ডানে যেতে বললেন। প্রথম আক্রমণ শুরুর কালে সুবেদার হাইয়ের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ থেকে ২০ জনে। এদিকে মাইনের আঘাতে নায়েক শফির হাত উড়ে গেল আর ধাবমান শত্রুদের পিছু নেওয়ার কালে জওয়ানরা বরাবর সালাহউদ্দীনকে অনুরোধ করল, 'স্যার, পজিশনে যান (মাটিতে শুয়ে পড়া)।' সালাহউদ্দীন ধমকে উঠল, 'বেটা, স্যার স্যার করে চিৎকার করিস না, শত্রুরা আমার অবস্থান টের পেয়ে যাবে। চিন্তা করিস না, তুই বেটা আমার কাছে এসে দাঁড়া, গুলি লাগবে না, ইয়াহিয়া খান আজও আমার জন্য গুলি বানাতে পারেনি।' দুদিকে বৃষ্টির মতো গুলির মাঝে দাঁড়িয়ে এ কথা বলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তাই বুঝি আজও প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রাণপ্রিয় সালাহউদ্দীনকে। দ্বিতীয়বার মেগাফোনে 'হাই' বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের সামনে দু-তিনটি বোমা এসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সে ধরাশায়ী হলো। তার দেহটা প্রথমে বাঁয়ে, পরে আধা ডানে ও

শেষে দড়াম করে পেছনের দিকে পড়ে গেল। আশপাশের জওয়ানরা ছুটে আসে, 'স্যার, কলেমা পড়েন।' কিন্তু বাংলার একান্ত গৌরব সালাহউদ্দীন উত্তর দিল, 'আমার কলেমা পড়ার দরকার নেই। খোদার কসম, যে পেছনে হটবি, তাকে গুলি করব।' তারপর বিড়বিড় করে আবার বলে উঠল, 'মরতে হয় এদেরকে মেরে মর, বাংলাদেশের মাটিতে মর।' এমন মরণ দুনিয়ার ইতিহাসে যে বিরল তা নয়, তবে এ মৃত্যুতে আছে আনন্দ, আছে গর্ব। উঁচু মাটির ঢিবিতে পড়ে থাকা সালাহউদ্দীনের লাশটাকে দু-তিনজন জওয়ান শত্রুর এলাকা থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সবাই মৃত্যুবরণ করে। পরিশেষে একটি বিহারি ছেলে আটটি গুলি খেয়েও শেষবারের মতো চেষ্টা করে নিজে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং লাশটি আনতে ব্যর্থ হয়। সালাহউদ্দীনের গায়ে তখনো সেই সাদা শার্টটা ছিল, যা তার খুলে ফেলার কথা ছিল, কারণ, সাদা শার্ট রাত্রিবেলায় বেশি দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের ঘড়ি, স্টেন ও অন্যান্য কাগজ নিয়ে আসা হয়।

ওদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজ বেঁচে গেলেন অলৌকিকভাবে। হাতের স্টেন তোপের মুখে উড়ে গেলেও সামান্য আহত হয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বেঁচে গেলেন, কিন্তু ৬০০ গজ পেছনে এফইউপি তত্ত্বাবধানে কর্মরত লেফটেন্যান্ট মান্নান উরুতে গুলি খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন, যদিও বা একই জায়গায় একইভাবে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকতও শুয়েছিলেন। অন্যদিকে আহত ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধারকল্পে ল্যান্স নায়েক রবিউল ছুটল শত্রু-অভিমুখে। কয়েক কদম যাওয়ার পর দুই হাতেই গুলি এসে লাগল, তথাপি তার প্রাণপ্রিয় তথা বাংলাদেশের অমূল্য রত্ন ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধার করার সংকল্প থেকে এতটুকু টলাতে পারেনি। যথাস্থানে পৌঁছে দেখে হাফিজকে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। পড়ে থাকা ওয়্যারলেস ও রকেট লঞ্চার ওঠানোর সময় রবিউলের বুকে গুলি লাগল। রবিউল মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পাশের জওয়ান সাহায্যের ভয়ে পাশ কেটে চলে গেল। রাগে-দুঃখে রবিউল গ্রেনেডটা হাতে নিয়ে (উদ্দেশ্য, বন্দী হবে না) জীবনের আশা ত্যাগ করে নিকটবর্তী আখখেতের দিকে দিল ভোঁ দৌড়। বৃষ্টির মতো শত্রুর গুলি আসছিল। কিন্তু আশ্চর্য, রবিউলের গায়ে লাগল না। কোনোমতে টেনে-হিঁচড়ে আখখেতে গিয়ে পৌঁছাতেই রবিউলের প্রতীতি জন্মাল সে সহজে মরছে না, আর অন্যের সাহায্য ছাড়াই সে বাঁচতে পারবে। বাঁ হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ডান হাতের হাড়টি বের হয়ে আছে। নাকে-মুখে রক্তের ছোপ। এ অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখে এগিয়ে এসেছিল গ্রামের গৃহবধূরা, যদিও গৃহস্বামীরা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। নিজের সাথি যখন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল তখন সে আর কারও সাহায্য-প্রত্যাশী নয়। তাই গৃহবধূদের হাত ছাড়িয়ে সে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পরের ইতিহাস আজও তার কাছে ঝাপসা হয়ে আছে। তার বিশ্বাস, দুই রমণীর কাঁধে ভর

দিয়ে সে এফইউপি এরিয়া পর্যন্ত পৌঁছাবে। এদিকে সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পর আমাদের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও সেই অবস্থায় ছোট ছোট গ্রুপে ওরা শত্রুর বাংকারগুলোর ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। তখন সকাল সাতটা বাজে। অযথা লোকক্ষয় না করে উইথড্র করা শ্রেয় জেনেও মেজর (বর্তমানে লে. কর্নেল) মঈন তাঁর সেনাদলকে কিছুতেই পশ্চাদপসরণ করাতে পারছিলেন না। আমাদের আর শত্রুর লাশে কমিউনিটি সেন্টার ভরে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সকাল সাড়ে সাতটার দিকে আমাদের সেনাদল পশ্চাদপসরণ করে। এ যুদ্ধে আমাদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন নিহত কিংবা নিখোঁজ আর দুজন অফিসারসহ ৬৬ জন আহত হয়। শত্রুদের লাশ তিনটি ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যেতে গ্রামের লোকেরা দেখেছে। পরদিন হেলিকপ্টারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা, সম্ভবত জিওসি আসেন কামালপুর পরিদর্শন করতে। বলা বাহুল্য, ওই দিনই পাকিস্তান বেতারে কামালপুর যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, প্রায় ৪০০ দুষ্কৃতকারী নিহত হয়েছে। এক অপারেশনে এত বড়সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর নিহত হওয়ার সংবাদ ইয়াহিয়ার বেতারে আর কখনো প্রচার করা হয়নি।

ফলাফল : বাংকারে বসে থাকা খানসেনাদের মনে ভীতি সঞ্চার করাই এ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হলো বাঙালিরা দূর থেকেই আর পালিয়ে যাবে না, বরং বাংকার থেকে খানসেনা তাড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। তাই বুঝি এ আক্রমণের পর থেকে খানসেনারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা কামালপুরের নাম শুনলেই আঁতকে উঠত। তখনকার দিনে পাকিস্তানি শিবিরে বন্দী মেজর আজিজের ভাষায় বলতে হয়, পাকিস্তানিদের নিজেদের মতে, কামালপুর হলো পাকিস্তানি সেনাদের মরণঘাঁটি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আজিজকে জিজ্ঞাসা করা হতো, 'হয়ার ইজ ধানিয়া-কমালপুর কিংবা হয়ার ইজ ইওর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।' কথা প্রসঙ্গে সেই জুলাই-আগস্ট (১৯৭১) মাসে অফিসাররা কখনো বা হঠাৎ বলে ফেলত, 'ইওর বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইজ ফাইটিং লাইক রিয়াল টাইগার্স।' আক্রমণটি ব্যর্থ হলেও এর চরম সাফল্য এ উক্তির মধ্যেই নিহিত আছে। তাই বুঝি পরবর্তীকালে বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে মেজর আজিজ শত দুঃখ-কষ্টকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে যুগ সৃষ্টিকারী কামালপুর রণাঙ্গনে যোগ দেন।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দশম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়
জুন ১৯৮৪। পৃ. ৬৮২-৬৮৯

লেফটেন্যান্ট মো. আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম

লেফটেন্যান্ট (পরে লে. কর্নেল) মো. আবদুল মান্নান স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। পরে জেড ফোর্সের অধীনে এবং পরবর্তী সময়ে ১১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। লেফটেন্যান্ট মান্নান জুলাই মাসে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কামালপুর আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হন, পরে তিনি নভেম্বর মাসে কামালপুর দখলের জন্য মেজর তাহেরের নেতৃত্বে সংগঠিত যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি ১৯৭৯ সালে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'-এ তাঁর কামালপুর যুদ্ধে নভেম্বর মাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, যা নিচে সংযুক্ত হলো।

কামালপুর যুদ্ধ

আমি (৩০-৩১ জুলাই 'জেড' ফোর্সের কামালপুর সংঘর্ষে) আহত হওয়ার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় পুনা। সেখানে এক দিন চিকিৎসার পর হেলিকপ্টারযোগে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় গুয়াহাটিতে। সেই হাসপাতালে আমি এক মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন ছিলাম। আগস্ট মাসের শেষের দিকে জে. জিয়া আমাকে দেখতে সেখানে যান। ক্রমে আমি কিছুটা আরোগ্য লাভ করি। আমি খবর পাই যে, আমার পেরেন্টস কলকাতার দিকে গেছেন। তখন আমি জে. জিয়ার কাছে ক'দিনের ছুটি প্রার্থনা করি। তিনি আমার ছুটি মঞ্জুর করেন। আমি কলকাতা চলে যাই। সেখানে চার-পাঁচ দিন থাকার পর জেনারেল ইসলামের কাছে খবর পাই যে সমস্ত সেক্টর কমান্ডারদের ৮ থিয়েটার রোডে কনফারেন্সে ডাকা হয়েছে এবং জেনারেল জিয়াও কনফারেন্সে আসবেন। ওই কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোর রূপরেখা ও নানাবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এরপর আমি

আমার ১ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটে ফিরে আসি। তারপর শুনতে পাই যে ১১ নম্বর সেক্টর নামে একটি নতুন সেক্টর গঠিত হয়েছে। কর্নেল তাহের সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। আমি যেহেতু অসুস্থ ছিলাম, তাই আমাকে ২ নম্বর সাব-সেক্টরে দেওয়া হয়। সেক্টর এক্সিকিউটিভ হিসেবে আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করি। এই সেক্টরে আমার যোগদান করা থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ছোট-বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোই আমি বলব।

কামালপুরে পাকিস্তানি আর্মির যে ঘাঁটি ছিল তা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। ওই ঘাঁটির সমস্ত বাংকার ছিল সিমেন্টের আরসিসি বাংকার। কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ দিয়ে সেগুলো কানেক্টেড ছিল। কামালপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। তাই তারা এটাকে খুব শক্ত করেছিল। কারণ, কামালপুরের যোগাযোগ বিস্তৃত ছিল বকশীগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, মধুপুর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত। তাই এই সেক্টর পাকিস্তানিদের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি আমাদের দিক থেকেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পাকিস্তানিরা জানত, এই সেক্টরে তাদের পতন হলে ঢাকা পৌঁছানো তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়বে। আমি আমার সহকর্মীদের বলেছিলাম, কামালপুরের পতন হলে সাত দিনের ভেতর ঢাকারও পতন ঘটবে। মূলত কামালপুরের পতন হলো ৪ তারিখ বিকেলে এবং এর কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকারও পতন ঘটল। এই বাহিনীর ঢাকা পৌঁছাতে সময় লাগল সাত-আট দিনের মতো। উল্লেখ্য, কামালপুরে যে ট্রুপস ঢুকেছিল, তারাই প্রথম ঢাকা পৌঁছেছিল। কামালপুরের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অবশ্য তারা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচুর মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিল। তাদের প্রচারণার এক-দশমাংশ সম্ভবত সত্য।

আমি এই সেক্টরে যোগদানের পর আরও অনেক ঘটনা বা যুদ্ধ হয়, যেমন, ধানুয়া-কামালপুরের যুদ্ধ। ধানুয়া-কামালপুর কামালপুরের পরেই একটি গ্রাম। এই গ্রামের কন্টিনিউয়েশন ভারত সীমান্তের ওপারে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। সীমিত হাতিয়ার নিয়ে যেহেতু আমরা পাকিস্তানিদের সুগঠিত ক্যাম্প থেকে উৎখাত করতে পারছিলাম না, তাই বিকল্প পন্থায় ধানুয়া-কামালপুর থেকে অ্যামবুশ করার চেষ্টা করছিলাম একটা ডিফেন্স নিয়ে। এই ধানুয়া-কামালপুরের একটা কন্টিনিউয়েশন ছিল ফিরোজপুর হয়ে বকশীগঞ্জের দিকে। এই পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমি চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ছয়-সাতখানা পাকিস্তানি আর্মির গাড়ি মাইনের সাহায্যে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বকশীগঞ্জ থেকে কামালপুরের দূরত্ব সাত মাইল। পরবর্তী পর্যায়ে তারা কোনো গাড়ি নিয়ে কখনো মাইনের ভয়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেনি। অতিক্রম করতে চাইলেও গরু কিংবা মহিষের গাড়ি দিয়ে আগে পথ পরীক্ষা করে নিত। তার পরও পরীক্ষিত পথে তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। আমার মনে আছে, একদিন আমরা ছোট দল নিয়ে কামালপুর এবং

বকশীগঞ্জের মাঝখানে অ্যামবুশ লাগিয়ে পাকিস্তানিদের অপেক্ষায় বসেছিলাম। এ পথে সন্দেহজনক এক লোক যাওয়ার সময় আমরা তাকে ধরি এবং এক অফিসারের জন্য প্রেরিত খাবারদাবার এবং পাকিস্তানিদের কিছু চিঠিপত্র হস্তগত করি। উর্দু-ইংরেজিতে লেখা ওইসব চিঠির পাঠোদ্ধার করে আমরা জানতে পারি, দিন আর বেশি নয়, তারা হ্যান্ডসআপ করবে।

আরও একটি ঘটনা, তারিখ ঠিক মনে পড়ছে না। সেদিন আমরা ৬০-৭০ জনকে নিয়ে আখখেতের ভেতর ডিফেন্স নিয়েছি। পাকিস্তানিরা বেরিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়। এতে পাকিস্তানিদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমার দুজনের একটা ছোট্ট দল ছিল। তাদের নাম মনে পড়ছে না। ১১ নম্বর সেক্টরের ১১৩ জনের যে লিস্ট আছে (পরিশিষ্ট-৫), তাদের কেউ হবে। তারা ট্রেঞ্চের পেছনে বসা ছিল। সেখান থেকে তারা পাকিস্তানিদের আক্রমণে ব্যস্ত ও মরিয়া হয়ে উঠেছিল। একপর্যায়ে বুলেট শেষ হয়ে গেলে এরা পাকিস্তানিদের হাতে মারা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানিদের মতো লাস্ট বুলেট পর্যন্ত এরা লড়াই করেছিল। এদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে সামরিক মর্যাদায় দাফন করি।

ধানুয়া-কামালপুরে আমরা যে ডিফেন্স নিয়েছিলাম, তার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময়ে ঘটেছিল। সেটা পরিচালনা করেছিলেন প্রথম বেঙ্গলের একটি কোম্পানি। অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। তাঁর সঙ্গে অফিসার ছিলেন বর্তমান কর্নেল পাটোয়ারী। তাঁরা ধানুয়া-কামালপুরে ডিফেন্স নিলেন। পাকিস্তানিরা এসে আক্রমণ করে, ফলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। পাকিস্তানিদের প্রায় ৩০-৪০ জন মারা যায়, আমাদের পক্ষে মাত্র একজন আহত হয়। পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই অপারেশনে আমরা পাঞ্জাবিদের একটা মৃতদেহ নিয়ে আসতে সক্ষম হই। মৃতদেহের কপালে গুলি লাগে। এই মৃতদেহ আমাদের সব সেনাকে দেখানো হয়। ফলে, তাদের মনোবল বেড়ে যায়। অবশ্য পরে মুসলমান হিসেবে কবর দেওয়া হয়। পরে আমরা যখন ফিরে যাই, তখন শুনতাম পাকিস্তানিরা কার নাম ধরে ডাকছে। সম্ভবত মৃত লোকটিরই।

এ ছাড়া কামালপুরে এমন কোনো দিন ছিল না যে পাকিস্তানিরা শান্তিতে বসবাস করতে পারত। কামালপুর-বকশীগঞ্জে পাকিস্তানিদের যে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল, আমরা তা কেটে দিতাম। একপর্যায়ে ১০-১২ জনের একটা ছোট দলকে এ ধরনের অপারেশনে পাঠাই। তারা প্রথমে টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে ওত পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পরে যখন পাকিস্তানিদের তার ঠিক করার পার্টি আসে, তখন তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। গোলাগুলি করে। পাকিস্তানিদের ক্ষতিসাধন করে ফিরে আসে। আমাদের কোনো ক্ষতিই হয়নি।

আরও একটি ঘটনা। অক্টোবর মাসের কোনো এক সময় ইন্ডিয়ান আর্মির একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ চালানো হলো। সেই আক্রমণে ইন্ডিয়ার একটি কোম্পানি কামালপুরের একটু পেছনে অ্যামবুশ করে। যখন তাদের ওপর আক্রমণ চলছিল, তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি কোম্পানিও তাদের সঙ্গে ছিল। কামালপুরের ফোর্সকে সহায়তা করার জন্য বকশীগঞ্জ থেকে মর্টার নিয়ে তিনটি পাকিস্তানি গাড়ি আসছিল। তখন রাস্তায় অ্যামবুশ করে গাড়িসমেত পাকিস্তানিদের খতম করা হয়।

তারপর সম্ভবত নভেম্বর মাস হবে। ইন্ডিয়ান আর্মির ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে কামালপুর আক্রমণ করানো হয় এবং একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে কামালপুর-বকশীগঞ্জের মাঝে অ্যামবুশ লাগানো হয়। আমাদের দুটি কোম্পানি। একটির কমান্ডার আমি নিজে, সেটা নিয়ে আমি একটা ব্লকিং পজিশন তৈরি করি। সেটা কামালপুর মেইন পজিশন থেকে প্রায় ১৫০ গজ দূরে। আমার বিপরীতে ছিলেন বর্তমান মেজর মিজান। তাঁর কোম্পানিসমেত তাঁকে নিয়ে একটা ব্লকিং পজিশন তৈরি করা হয়। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল, আমরা আখখেতের ভেতর ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পজিশন নিয়ে বসে থাকব, যেন পাকিস্তানিরা এই দিক থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। যখন আমরা এই পজিশনে পৌঁছালাম তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। আমাদের সাপোর্টে ছিল ইন্ডিয়ান একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং একটি মর্টার বাহিনী। তারা কামালপুরের ওপর শেলিং করছিল। সকালের দিকে যোগাযোগের জন্য আমাদের কাছে ছোট ছোট ওয়্যারলেস সেট দেওয়া হয়। কর্নেল তাহের থাকলেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের সঙ্গে, যিনি ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের বিগ্রেড কমান্ডার ছিলেন। ওখানে তিনি তাদের সঙ্গে এই অপারেশনটা কো-অর্ডিনেশন করছিলেন। আমি যখন আমার পজিশনে পৌঁছে গেলাম, তখন ছিল ভোর সাড়ে চারটা। তখন ইন্ডিয়ান আর্টিলারি ফায়ার করছিল। বেশ কতগুলো আর্টিলারি শেল আমাদের পজিশনের ওপর এসে পড়ল। আমার এই কোম্পানিতে মোট ১০৯ জন ছেলে ছিল। তার মধ্যে নয়জন ছেলে আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। এরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এলোপাতাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে পালিয়ে যেতে লাগল। মাত্র ক'জন ছেলে নিয়ে আমি সেই পজিশনে পৌঁছালাম। তারপর ওয়্যারলেস সেটে কর্নেল তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং আমাদের পজিশনের ওপর শেলিংয়ের বিস্তারিত ব্যাপার তাঁকে জানালাম এবং ফায়ারিং বন্ধ করানোর জন্য অনুরোধ করলাম। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না, ফায়ারিং কোন পক্ষের। কারণ, এই পজিশনের ওপর ফায়ার করার কথা ছিল না। তিনি ফায়ার বন্ধ করালেন। সম্ভবত রেঞ্জিংয়ে কোনো ডিফিকাল্টি ছিল, যার জন্য এটা হয়েছিল। পরে তাকে আমি ফায়ারিং কারেকশন জানাই। তখন সকাল হয়ে আসছে। কর্নেল তাহের একপর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস

করলেন লেফটেন্যান্ট মিজানের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ আছে কি না। আমি বললাম, এখন নেই। তিনি বললেন, 'তাকে কল দাও, আমিও তার খোঁজ নিচ্ছি।' তিনি পাঁচ-ছয়জনকে নিয়ে মিজানের পজিশনের দিকে গেলেন। প্রায় ৪৫ মিনিট থেকে ঘণ্টা খানেক পর আমি সেটে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বেলাল [কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই—সম্পাদক] বলতে লাগল, শেলিংয়ে তাহের ভাইয়ের পা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মিজানের পজিশনের কাছে পাকিস্তানিরা তাঁকে দেখতে পেয়ে ৬০-এমএম মর্টার শেলিং করে। তাঁর একটি পা নষ্ট হয়ে যায়। ৩০-৪৫ মিনিট পর একটা হেলিকপ্টার এসে কর্নেল তাহেরকে নিয়ে যায়। ১০-১১টা পর্যন্ত সেই পজিশনে থাকলাম। পরে আমার কাছে এক মেসেঞ্জার একটা কাগজ নিয়ে আসেন কর্নেল তাহেরের লেখা। তাতে লেখা ছিল, আমাকে এই সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। লেখাটুকু পুরোপুরি স্মরণ নাই। সম্ভবত এ ধরনের, 'ক্লিয়ার দ্য রোড ফ্রম হিয়ার টু ঢাকা। লুক আফটার মাই বয়েজ, আই লিভ এভরিথিংক টু ইউ অ্যান্ড গড ব্লেস ইউ।' আরও অনেক কিছু ছিল। আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। কারণ, আজ এই সেক্টরের দায়িত্ব আমার ওপর দেওয়া হয়েছে। আমি জানি না, এই দায়িত্ব আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারব কি না। আমার মনে হচ্ছিল, যেন আকাশটা আমার মাথায় ভেঙে পড়েছে। যাহোক, সেই অবরুদ্ধ অবস্থায় আমরা বিকেল পর্যন্ত সেখানে থাকলাম। স্কোয়াড্রন লিডার হামিদউল্লাহকে এই দায়িত্ব না দিয়ে আমার ওপর তিনি এই দায়িত্ব দেন। অবশ্য পরে হামিদুল্লাহ আসার পর তিনি নামেমাত্র কমান্ডার রইলেন। অপারেশনের দায়িত্ব আমার ওপর দেন; কারণ, তিনি বিমানবাহিনীর লোক। অপারেশনের এসব ব্যাপারে তিনি তত অভিজ্ঞ নন। কর্নেল তাহের আহত হওয়ার পর আমরা সবাই মর্মাহত হই। একটা বিরাট শূন্যতারও সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকটা গোটা পরিবার আকস্মিক পিতৃহীন হয়ে পড়ার মতো। যাহোক, অনেক কষ্টে আমি এই পরিস্থিতি সামলে নিয়েছিলাম।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখ ভারত আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১ তারিখ থেকে আমরা কামালপুর অবরুদ্ধ করে রাখি। আমাদের সঙ্গে ছিল এক ইন্ডিয়ান রেগুলার ব্যাটালিয়ন, মুক্তিযোদ্ধা তিন কোম্পানি। আর ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের দুটি ব্যাটালিয়ন কামালপুর বাইপাস করে কামালপুর পতনের আগেই বকশীগঞ্জের দিকে চলে যায়। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বকশীগঞ্জ থেকে পেছনে হটে যাচ্ছে। ৪ তারিখ সকালে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের দুটি বিমান কামালপুরের ওপর স্ট্রাফিং শুরু করে। দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয় বেলা ১২টা কি ২টায়, তৃতীয়বার আক্রমণের কথা ছিল বিকেল চারটায়। ইতিমধ্যে পাকিস্তানিরা যথেষ্ট হেস্তনেস্ত হয়েছে। আমরা ওয়্যারলেস সেটে ইন্ডিয়ানদের কনগ্র্যাচুলেশন শুনছিলাম। একপর্যায়ে কামালপুরে তাদের যে ফোর্স ছিল, তারা কন্টাক্ট করে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে এবং সাহায্য চেয়ে পাঠায় ফোর্স পাঠানোর জন্য। তারা জানাল তাদের কিছু করণীয় নাই। এটা বুঝে তখন জেনারেল হীরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ও আমি—তিনজনে বসে বোঝাপড়া করে একটা সারেন্ডার নোট তৈয়ার করি। একজন ফ্রিডম ফাইটারকে একটি সাদা ফ্ল্যাগ হাতে দিয়ে তা কামালপুর ঘাঁটির ভেতর পাঠাই। ঘণ্টা খানেক পর সে যখন ফেরে নাই, তখন আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার আরেকটি ছেলেকে ওয়্যারলেস সেট সঙ্গে দিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কামালপুর ঘাঁটিতে পাঠাই। সে ওখানে যাওয়ার পর পাকসেনারা দ্বিতীয় ছেলেটিকে রেখে প্রথম ছেলেটিকে পাঠিয়ে দেয়। তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে বলে, 'আমাকে তারা ওপরে শেলিং হচ্ছে বলে নিচে বাংকারে নিয়ে যায়। রুটিটুটি খেতে দেয়। তারা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।' যাহোক, দ্বিতীয় ছেলেটির সঙ্গে কয়েকবার সেটে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সে তখন তাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। তা ছাড়া তারা তাকে সেটে কথা বলতে দিতে অ্যালাউ করেনি। কিছুক্ষণ পর সে যখন সেটে এল তখন যোগাযোগ হলো। ছেলেটি জানাল, তারা সারেন্ডার করতে প্রস্তুত আছে। তখন আমি তাকে বললাম, আমি আরেকজনকে পাঠাচ্ছি, তাদের জেসিও বা অফিসার লেবেলের কাউকে তার সঙ্গে আসতে বলো। সে গেল। যাওয়ার পর পাকিস্তানি আর্মির একজন জেসিও মিলিশিয়া কাপড় পরা, সম্ভবত মিলিশিয়াই হবে, ছেলেটির সঙ্গে এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সারেন্ডারের কথা ব্যক্ত করে। তখন আমরা তাদের সারেন্ডারের পদ্ধতি বলে দিই। সে ফিরে যায় এবং হাতিয়ার মাটিতে রেখে সবাইকে সারেন্ডার করায়। আমরা তাদের সব হাতিয়ার এবং সবাইকে আমাদের পজিশনে নিয়ে আসি। এদের মধ্যে একজন অফিসার, ইনি সম্ভবত ক্যাপ্টেন হাসান কোরেশী [প্রকৃতপক্ষে আহ্সান মালিক—সম্পাদক], একজন জেসিও এবং ১০০ জনের মতো সেপাই, ৩০ জনের মতো রেঞ্জার এবং কিছুসংখ্যক রাজাকারও ছিল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১১-১২-৭৯
স্বাধীনতাযুদ্ধকালে পদবি : লেফটেন্যান্ট
সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দশম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়
জুন ১৯৮৪। পৃ. ৬৬৯-৬৭৪

~~সাদা ৭৬~~

গণবাহিনীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার

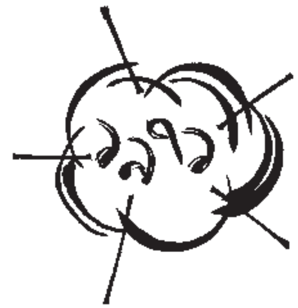

~~সাদা ৭৮~~

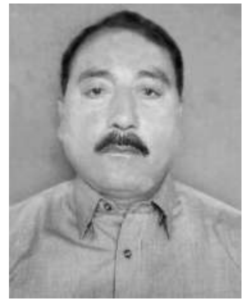

মজিবর রহমান

পিতা : আলহাজ নসিমউদ্দীন সরকার। গ্রাম ও ইউনিয়ন : ধানুয়া, ডাক : ধানুয়া-কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৯। ১৯৭১ সালে পেশা : ছাত্র। বর্তমান পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসা।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চে ঢাকায় আক্রমণ করেছিল—এ খবর আপনি শুনেছিলেন কি?

- হ্যাঁ, রেডিওর মাধ্যমে শুনছি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখন আক্রমণ করল?

- কামালপুর এলাকায় পাকিস্তানিরা আসলো এপ্রিলে। এই এলাকায় ওরা ঘাঁটি করল। ঘাঁটি করার পরে তারা ধানুয়া গেছে, রামরামপুর গেছে, সারমারা গেছে। তারা যাইয়ে মানুষের বাড়ি-ঘরটর পোড়াই দিয়ে আসছে। তারা ঘাঁটি কইরা আট-নয় মাস এখানেই ছিল। সেই সময় তারা বর্ডারে অনেকবার আক্রমণ করছে। সব ঘটনা আমার এখন মনে নাই। একটা ঘটনা মনে আছে। সেটা বলি। একবার তারা হঠাৎ বর্ডারে আক্রমণ করা ইন্ডিয়ার মধ্যে ঢুইকা পড়ছিল। ঢুইকা ঘেগাপাড়া আর নন্দের চর গ্রাম পোড়াই দিয়া আসছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারে কেউ শহীদ হয়েছিলেন?

- না, আমার পরিবারের কেউ শহীদ হয় নাই। এরা তো এখানে কেউ ছিল না।

কামালপুর এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- মে মাসের শেষে বা তার পর থেকে।

আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

- হ্যাঁ।

কেন করলেন?

● দেশের খাতিরে। দেশকে বাঁচানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিছি। আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ায় গেছিলাম। ওখানে ২৮-২৯ দিন ট্রেনিং করছি। ট্রেনিং করার পরে আমি চলে গেছি হালুয়াঘাট। ওখানে ছিছিংপাড়ায় একটা ক্যাম্প ছিল। ওখানে আমি সাত দিন থাকি। সাত দিন পর আমাকে পোস্টিং দেয় পুরাখাসিয়াতে। পুরাখাসিয়াতে থাকার সময় আমি বিভিন্ন জাগায় অপারেশন করছি।

কোথায় কোথায় অপারেশন করেছেন?

● আমি ওখান থেকে অপারেশনে গেছিলাম নান্দিনায়, পাটগুদাম পোড়ানোর অপারেশনে।

আপনি কামালপুরে কোনো অপারেশন করেছেন কি?

● কামালপুরে অপারেশন করছি প্রথম দিকে।

কোন মাসের দিকে?

● মে মাসের শেষের দিকে বা জুন মাসে। সে সময় আমার কমান্ডার ছিলেন আর্মির সুবেদার হালিম সাব।

তখন সেক্টর কমান্ডার কে ছিলেন এই এলাকায়?

● তখন এখানে সেক্টর কমান্ডার কেউ ছিল না। তখন তো নতুন অবস্থা। এখানে সেক্টর হয় নাই। ওই যুদ্ধের পর আমি চলে যাই পুরাখাসিয়া।

পরে আপনি কি কামালপুরে কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

● না, এখানে আমি আসি নাই। আমি কামালপুর আসি ডিসেম্বরে। আমার যত দূর মনে পড়ে, ১১ ডিসেম্বর কামালপুর স্বাধীন হয়। তার আগে আমরা চারদিক থেকে পাকিস্তানিদের ঘেরাও করে রাখছিলাম। প্রায় সাত দিন। সাত দিন পরে ওরা সারেন্ডার করে। সেই তারিখ ছিল ১১ ডিসেম্বর।

তারপর কী করলেন?

● আমি এই এলাকাতেই তখন ছিলাম।

যুদ্ধ শেষে আপনার এলাকার কী অবস্থা দেখলেন?

● গ্রামে দেখলাম আমাদের অনেকের ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র কিচ্ছু নাই। মসজিদটা আছে শুধু।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার এলাকায় কোনো লোক নিহত হয়েছিল?

● যুদ্ধের সময় আমাদের ইউনিয়নে লোক তেমন শহীদ হয়নি। তখন আমাদের এলাকার লোকজন তো সব ইন্ডিয়ায় চলে গেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি প্রথম যে অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন, সে ঘটনা আপনার মনে আছে?

● মনে আছে। প্রথম অপারেশনে আমরা ছিলাম মাত্র ১৪ জন। তার মধ্যে কয়জন ইপিআর সৈনিক ছিল। তখন নতুন অবস্থা। আমরা আসছিলাম টুংরোর চর দেখার জন্য। আমাকে বিএসএফ ক্যাপ্টেন নিয়োগী সাব কামালপুর পাঠাইলেন যে কী অবস্থা, খবরটা তোমরা জাইনা আসো। তখনো কিন্তু আমরা অস্ত্রের ট্রেনিং নেই নাই। সেই সময় শুধু অবস্থাটা দেখার জন্য আমরা আসছিলাম। আইসে ইন্ডিয়ান সীমান্ত পার হয়ে বর্মণপাড়ার ওখান দিয়া এখানে কামালপুর যে গ্রাম, সে গ্রামের উত্তর পাশে একটা জমিতে দুজন ইপিআরের সঙ্গে আমি ছিলাম। আমরা ওখানে শুয়ে থেকে চারদিকটা দেখলাম। তখন আমার হাতে কোনো হাতিয়ার ছিল না। ঘণ্টা খানেক পরে আমরা ওখান থেকে আবার চইলা গেছি। এই হইল আমার প্রথম অপারেশনের কথা।

পরবর্তী অপারেশনে কী করলেন?

● দ্বিতীয় অপারেশনে আমি রেকি করার জন্য আসছিলাম। তখন আমার পোস্টিং ছিল পুরাখাসিয়া। পুরাখাসিয়া থেকে এখানে আসছিলাম রেকি করার জন্য। রেকি করে আমরা চলে গেছিলাম। সেই অপারেশনে আমার তেমন ভূমিকা ছিল না।

ওই অপারেশনের সময়ে কি কোনো যুদ্ধ হয়েছিল?

● হ্যাঁ, যুদ্ধ হয়েছিল। আমি ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি নাই। শুধু রেকিতে ছিলাম।

যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছিল?

● যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছিল, সেটা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে ওই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই।

আর কোনো অপারেশনে আপনি অংশ নিয়েছিলেন কি?

● হ্যাঁ, আমি আরেকটা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সেটা বান্দরঘাটায়। সেখানে আমি গেছিলাম। আমাদের এই দিক থেকে শুধু আমিই ওই যুদ্ধে ছিলাম। তখন আমার পোস্টিং ছিল ঢালুতে।

এর পরে কি আর কোথাও যুদ্ধ করেছেন?

● না, এর পরে আর কোনো যুদ্ধে যাই নাই। কামালপুর যখন মুক্ত হয়, তখন ওখানে ছিলাম। কিন্তু ওখানে আমাদের যুদ্ধ করতে হয় নাই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
২৩ আগস্ট ১৯৯৬

মজিবর রহমান

পিতা : মোজাফফর হোসেন। গ্রাম : কামালপুর, ইউনিয়ন : ধানুয়া-কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৯। ১৯৭১ সালে পেশা : ছাত্র। বর্তমান পেশা : বেকার।

১৯৭১ সালের কথা আপনার মনে আছে?

- মনে আছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তো পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ চালাল। তখনই আমার মনের ভিতরে প্রতিহিংসা জাগল যে, এই পশ্চিমাদের এ দেশ থেকে হটাতে হবে।

আপনি কীভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের সংবাদ শুনলেন?

- রেডিওর মাধ্যমে শুনছি।

ধানুয়া-কামালপুর কত তারিখের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলো?

- সে তারিখটা তো আমার সঠিক মনে নাই।

মাসের কথা মনে আছে কি?

- এপ্রিল-মে মাসের দিকে হবে বোধ হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কীভাবে এই এলাকায় আক্রমণ করল?

- ইপিআর তো এখানে আগে থেকেই ছিল। ২৫ মার্চের পর আমরা সবাই মিলে অবাঙালি ইপিআরদের তাড়ায় দিছি। কয়েকটারে আমরা মাইরেও ফালাইছি। তারপর এপ্রিল বা মে মাসে পাকিস্তানি সেনা আসলো। আইসা ঘাঁটি করল।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

- ঠিক তাদের হাতে আক্রান্ত হই নাই। তবে খুব বিপদে পড়ছিলাম। আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিছিলাম। মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিয়া আমি ইসলামপুরে এক অপারেশনে আসছিলাম। ওই অপারেশনে আমরা এক রাজাকারের বাড়িতে আক্রমণ করি। ওই টাইমে আমাদের কমান্ডার দুজনকে সঙ্গে নিয়া ভিতর দরজা দিয়া রাজাকারের ঘরে ঢুকছে। আর আমি ছিলাম আরেকটা দরজার ধারে এসএলআর নিয়া। তো ওরা তিনজন যাইয়ে ঘরের দরজায় লাথি মাইরে দরজা ভাইঙে যখন ঘরে ঢুকছে, তখন ওই রাজাকার আমি যে দরজার কাছে দাঁড়ানো ছিলাম, সেই দরজা খুলে পালাতে ধরছে। তার খুব জায়গান্ডিক টাইপের (বিরাট দেহধারী) শরীর ছিল। সে হঠাৎ করি আইসে আমার ওপর পড়ে। তখন আমার এসআলআরের ব্যারেল তার বুকে আটকে যায়। ওই সময় আমার মনে একটা আতঙ্ক হয়। আর আমার ডান হাতের কবজি প্রায় মচকে যায়। পরে আমি কোনোরকমে বাম হাত দিয়া এসএলআরের ট্রিগার টাইনা তাকে শেষ কইরা দেই।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- মা-বোনের ইজ্জত এবং দেশকে বাঁচাবার জন্যেই আমি যুদ্ধে গেছিলাম।

সেই সময় আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছিলেন?

- না, আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই।

যুদ্ধের শেষে ফিরে এসে আপনি আপনার গ্রামের কী অবস্থা দেখেছিলেন?

- গ্রামে দেখলাম, অনেক বাড়িঘর পোড়া। আমার বাড়িটাও পুড়ায়ে দিছিল। গ্রামের প্রায় সমস্ত বাড়িই পাঞ্জাবিরা পুড়ায় দিছিল। বিশেষ করে, আমাদের পাড়ার কিছু ছিল না। গাছগাছড়া পর্যন্ত শেষ কইরা দিছিল। ঘরবাড়ি তো ছিলই না।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- প্রথম কামালপুরেই যুদ্ধ করছি। তার আগে অবশ্য আমি ট্রেনিং নিছি। তুরায় এক মাস ট্রেনিং নেওয়ার পর ঢালুতে পোস্টিং হইল আমার। ঢালু থাকে এক দিন না দুই দিন পরেই কামালপুর আসলাম। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের সাথে আমি এখানে প্রথম অপারেশনে আসি। সেদিন ১৩ আগস্ট কিংবা ১৪ আগস্ট ছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে আমরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা ছিলাম। ইন্ডিয়ান ফোর্সও ওই দিন আমাদের সাথে ছিল। আমরা আসার পর গুলিবিনিময় আরম্ভ হইল। একসময় হঠাৎ কইরে পাঞ্জাবিরা গুলি বন্ধ করে। তখন আমরা মনে করলাম যে হয়তো পাঞ্জাবিরা সম্পূর্ণ শেষ হয়া গেছে। কেন জানি ওরা একদম চুপ হয়া আছিল। ওই সময় ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব অ্যাডভান্স কইরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংকারের ওপরে যাইয়ে দেখে যে, ওখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কেউ নাই। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন তখন বাংকারের মধ্যে ঢুইকে পড়ে। একটা বাংকারে ঢুইকা ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন একজন পাঞ্জাবিরে চুলের মুঠো ধইরা টান দিয়া বাইর কইরা আইনা বেয়নেট দিয়া তাকে শেষ কইরা দেয়।

এই পাঞ্জাবি ওই বাংকারের মধ্যে লুকায়ে ছিল। তারে শেষ করে দেওয়ার পরে উনি আরেকটা বাংকারে যান। যাইয়ে দেখে, ওখানে আরেকটা পাঞ্জাবি। উনি ওটারেও মারে। মাইরে উনি গোডাউনের ওদিকে যান। গোডাউনের ওখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আরেকটা বড় বাংকার ছিল। ওই বাংকারের ওখানে যাইয়ে বাংকারের ওপরে চড়ে উনি বলেন যে, 'জয় বাংলা', তোমরা অ্যাডভান্স করো। আর তখনই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের ওখান থেকে একটা মেশিনগানের গুলি আরম্ভ হয়। ওই গুলিতে উনি সাথে সাথে মারা যান। ওই অবস্থায় আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সবাই পেছনে সরে যাই। আর তার লাশটা ওখানেই পড়ে ছিল।

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের লাশ আপনারা উদ্ধার করতে পারেননি?

- না।

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন কি ওই যুদ্ধের কমান্ডার ছিলেন?

- ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে ওই যুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু মূল কমান্ডার ছিলেন আরেকজন।

এরপর কোথায় যুদ্ধ করলেন?

- এরপরে যুদ্ধ করছি বান্দরঘাটা আর ঢালু বর্ডারে।

কামালপুরে আর যুদ্ধ করেন নাই?

- কামালপুরে পরে টুকটাক অপারেশনে আইছি। তারপরে ইসলামপুর, জামালপুর গেছি। আমাদের যখন যে অর্ডার করছে, সেমতো আমরা কাজ করছি বা যুদ্ধ করতে গেছি। যখন যে অপারেশনে পাঠাইছে, তখন সে অপারেশনে গেছি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার সবচেয়ে বড় অপারেশন ছিল ইসলামপুরে। সেদিন আমার জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিছিল।

আরেক দিন আরেকটা অপারেশন করি। সেটা হলো, মুক্তিযুদ্ধের সময় কামালপুরের পশ্চিমে ধানুয়া গ্রামের ওখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বাংকার ছিল। বাংকারটার নাম ছিল ১৪ নম্বর। সেই ১৪ নম্বরের কাছে আমরা অ্যামবুশ কইরা বইসে আছি। পাঞ্জাবিরা বিকেল টাইমে ওই বাংকার থাইকা গুলি ছোড়া আরম্ভ করল। তার পরে ওরা বাংকার থাইকে বাহির হইয়া হঠাৎ অ্যাডভান্স শুরু করল। সেদিন পাঞ্জাবিরা খাড়া (দাঁড়িয়ে) হইয়া অ্যাডভান্স করছে। এরা মরণের চিন্তা করে নাই। কেন করে নাই, সেটা আল্লাহ জানে আর ওরাই জানে! ওরা অ্যাডভান্স শুরু করতেই আমরা গুলি আরম্ভ করি। ওরাও গুলি করতে থাকে। আমরা গুলি শুরু করতেই একটা পাঞ্জাবি পড়ি গেল। সেটা দেখে আমরা আরও সাহস করলাম যে পাঞ্জাবি যহন পড়ি গেছে, তহন তো চিন্তা নাই। গুলি আরও বেশি করে করো। আমাদের তুমুল

গোলাগুলিতে পরে পাঞ্জাবিরা আস্তে আস্তে ব্যাক করা শুরু করল। এর মধ্যে ওরা ওদের ঘাঁটিতে ওয়্যারলেস করে দিছে। ওয়্যারলেস ছিল ওদের কাছে। তখন ওদের ক্যাম্প থাকি শেলিং করা আরম্ভ করছে। যখন শেল দুইডা না তিনডা আমাদের আশপাশে পড়ছে, তখন তো আমাদের অবস্থা খুব টাইট। দুই-তিনডা পড়ার পরেই আমি দৌড় দিছি। দৌড় দিয়া ওখান থাইকে এক মাইল, আধা মাইল দূরে গেছি। পরে আমরা ওই পাঞ্জাবির লাশটা নিয়া আসি; মানে, যে পাঞ্জাবি আমাদের গুলিতে মারা গেছিল। ওই লাশটা আমরা খেত থাইকে টাইনে আমি মহেন্দ্রগঞ্জ পৌছাই দেই। এদিনের ঘটনাটা আমার কাছে খুব স্মরণীয়।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
২৩ আগস্ট ১৯৯৬

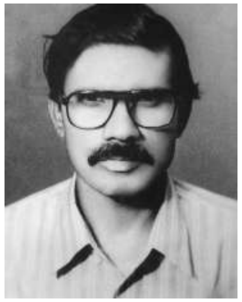

মো. দেলোয়ার হোসেন

পিতা : মরহুম উজির আলী। গ্রাম ও ইউনিয়ন : ধানুয়া, থানা : বকশীগঞ্জ (সাবেক শ্রীবর্দী), জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, এলএলবি, ১৯৭১ সালে বয়স : ১৮। ১৯৭১ সালে পেশা : ছাত্র। বর্তমান পেশা : আইন ব্যবসায়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং তার পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

● ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আমি ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য হিসাবে জামাতে ইসলামের পক্ষে কাজ করেছিলাম। কিন্তু তখন দেশের জনগণ একবাক্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী দেশের সব মানুষের মতো আমিও আশা করেছিলাম যে, পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দিবে। কিন্তু পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগকে তখন ক্ষমতা দেয় নাই। তখন দেশে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে '৭১ সালের মার্চ মাসের ৭ তারিখে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব একটা ভাষণ দেন। শেখ সাহেবের সেই ভাষণ অনেকের সাথে আমিও শুনেছিলাম রেডিওতে। তখন আমি দেওয়ানগঞ্জ কলেজে পড়ি। ওখানে একটা বাড়িতে আমি লজিং থাকতাম। সেই বাড়িতেই আমি পরদিন ওই ভাষণটা শুনি। ওই সময় থেকে আমি বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ি। পরবর্তী সময়ে বাঙালির সেই চেতনার প্রতি সমর্থন দিয়ে আমি সংগ্রামের পথে পা বাড়াই এবং ওই সময় আমি ইসলামী ছাত্র সংঘ ত্যাগ করলাম। তাদের ওই মনোভাব ত্যাগ করে আমি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ঝুঁকে পড়ি। তার পর থেকে আমি বাঙালির পক্ষেই সমর্থন দিছি। তখন আমাদের এলাকার শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি লোক বাঙালি জাতীয়তাবোধেই উদ্বুদ্ধ ছিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চের আক্রমণ সম্পর্কে আপনি কী জানেন, বা এ সম্পর্কে আপনি কী শুনেছিলেন?

● ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের পরে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। তখনো আমি দেওয়ানগঞ্জেই ছিলাম। ২৫ মার্চের কয়েক দিন আগে আমি দেওয়ানগঞ্জ থেকে বাড়ি আসি। তখন কলেজের স্যারেরা দু-একজন আমাদের বলেছিল, তোমরা বাড়ি যাও। বলা যায় না দেশের পরিস্থিতি কখন কী হয়! তখন আমি একটু ভীতসন্ত্রস্ত হয়েই বাড়ি চইলা আসছিলাম। ২৫ মার্চ রাতে আমি আমার বাড়িতেই ছিলাম। ২৬ মার্চ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি বাড়িতেই ছিলাম। দুপুরের পর থেকে আমি বিভিন্নভাবে এ সম্পর্কে খবর পাওয়া ধরলাম। আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের খবর প্রথম পাই ইপিআরদের কাছ থেকে। তখন আমাদের এদিকে ইপিআর ছিল। ওই ইপিআরদের মধ্যে বাঙালি, পাঞ্জাবি এবং বালুচিরাও ছিল। ২৬ মার্চ তাদের মধ্যে দেখা যায় একটা ডিভিশন ভাব। আমাদের এখানে কয়েকটা বিওপি ছিল। যেমন কামালপুর বিওপি, পাথরের চর বিওপি, কর্ণজোড়া বিওপি, নকশী বিওপি। প্রতিটি বিওপিতেই বাঙালিদের সাথে পাঞ্জাবি বা বালুচি ইপিআরগুলাও ছিল। পাকিস্তানিরা ওই দিন নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে ছিল। মানে বাঙালি ইপিআরদের কাছ থেকে তারা একটু দূরে ছিল। পরে আমাদের বাঙালি ইপিআররা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এটাই প্রথম যুদ্ধ আমাদের এলাকায়। ওই সময় দুই পক্ষেই গোলাগুলি হয়। বাঙালি ইপিআরদের মধ্যে একজন খুব দুর্ধর্ষ ছিল। আমার যত দূর মনে পড়ে, তার নাম মাহবুব। এই মাহবুব এলএমজিধারী এক পাঞ্জাবি ইপিআরকে ঘায়েল করে বাকি পাঞ্জাবিদের কাবু করে।

এই যুদ্ধ কোন এলাকায় হয়?

● কর্ণজোড়ায়, এটা পাহাড়ি এলাকা। কর্ণজোড়া আমাদের এলাকারই একটা পার্ট। ওই এলাকায় একটা ইপিআর বিওপি ছিল। ওই ক্যাম্পে ইপিআর বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা ভালো রকম শেল্টার নিয়ে ছিল। তাদের একজন এলএমজি ফিট করে ওখান থেকে ফায়ার করতে ছিল। বাঙালি ইপিআর মাহবুব ক্রলিং করে ওখানে গিয়ে এলএমজিধারী পাঞ্জাবি ইপিআরটাকে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়। সেই দিনই আমাদের এই এলাকার তিনটা ইপিআর বিওপি—মানে তৎকালীন সময়ের পাথরের চর, কামালপুর এবং নকশী ইপিআর বিওপির পশ্চিম পাকিস্তানি ইপিআররা হয় মারা পড়ে, না হয় পালিয়ে যায়। কর্ণজোড়া বর্তমানে শ্রীবর্দী থানার অন্তর্গত।

১৯৭১ সালে আপনি কি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● আমি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় কয়েকবারই পাকিস্তানি আর্মির সামনে

পড়েছি। কিন্তু সরাসরি আক্রান্ত হই নাই। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমি প্রতিবারই রক্ষা পেয়েছি।

আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

- আমি মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলাম। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেইনি। পরবর্তী সময়ে আমার ওপর বিশেষ একটা দায়িত্ব ছিল। ওই সময় আমাদের কয়েকজনকে নিয়া একটা দল করা হয়েছিল। এই গ্রুপের নাম দেওয়া হয় 'ধানুয়া গাইড গ্রুপ'। এই গ্রুপে আমরা ১৪ জন ছিলাম। আগস্ট থেকে কামালপুর মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করি।

আপনাদের কাজ কী ছিল?

- সে সময় এই এলাকায় যে অপারেশনগুলা হতো এবং তাতে যারা অংশ নিত, তাদেরকে আমাদের গাইড করতে হতো। প্রতিটা গ্রুপের সঙ্গে আমাদের দুজন করে লোক দিতে হতো প্রতিটা অপারেশনের সময়। যে অপারেশনই হোক না কেন, আমাদের দল থেকে দুজন করে গাইড তাদের প্রত্যেক গ্রুপকে দেওয়া লাগত। আমরা মুক্তিবাহিনী, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বা ভারতীয় সৈন্যদের গাইড করতাম।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখন আক্রমণ করল?

- আমার এলাকায় তারা আসে এপ্রিলে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে তারা আসা শুরু করে। ওই সময় তারা হঠাৎ করে আমাদের এলাকায় এসে দুই-একটা বাড়ি পোড়ায় দিয়ে আবার চলে যেত। তখন বকশীগঞ্জ থানা হয় নাই। তারা জামালপুর থেকে অনেক সময় ওই ট্রাক বা জিপে করে প্রায় প্রতিদিন আসত। এসে দুই-একটা মর্টার ফায়ার করে বা দুই-একটা বাড়িতে আগুন দিয়া তারা চইলা যাইত। এভাবে কয়েক দিন তারা আসে।

তখন কি এই এলাকায় তৎকালীন বাঙালি ইপিআররা ছিল না?

- তখন বাঙালি ইপিআররা এখানে নাই। তারা তাদের কোনো কমান্ডারের নির্দেশে বা নিজেদের সুসংগঠিত করার জন্য অনত্র চইলা গেছিল। কিছুদিন পর আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ চইলা গেলাম। মহেন্দ্রগঞ্জ আমাদের পার্শ্ববর্তী, ইন্ডিয়ার ভিতরে। সেখানে আমাদের ১১ নম্বর সেক্টর ছিল। এপ্রিলের শেষ দিক থেকে পাঞ্জাবিরা ঘন ঘন আসা ধরল। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কামালপুর বিওপিতে আরও বাংকার বানিয়ে ওখানে তাদের জন্য স্থায়ী ক্যাম্প বানাল। তাতে অনেক পাকিস্তানি সেনা ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারে কেউ শহীদ হয়েছেন?

- আমার পরিবারের কেউ শহীদ হয়নি। কিন্তু আমার পরিবার ওই সময় একটা বড় বিপদে পড়ছিল।

কী বিপদে পড়েছিল?

- পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই এলাকায় স্থায়ীভাবে আসার পর আমাদের পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরের কয়েকটা বাড়ি পোড়ায়ে আসছে। কয়েকটা বাড়িতে রেইড করে মালামালও তারা লুট কইরা নিয়া আসছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে যেসব বাড়িতে লুটপাট করে, তার মধ্যে একটা আমাদের বাড়ি ছিল। ইন্ডিয়ার ভিতরে আমাদের আত্মীয়স্বজন বাস করত। ওখানে আমাদেরও একটা বাড়ি ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমাদের জিনিসপত্র ভারতের বাড়িতে নিয়ে যাই। সেখানে আমাদের সব মালামাল ছিল। আমাদের ওই বাড়িঘর থেকে সমস্ত কিছু পাকিস্তান সেনাবাহিনী লুটপাট কইরা নিয়া বাড়িটা পোড়ায় দিয়া আসে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন ওখানে আক্রমণ করে তখন আমার মা, বোন, ভাই ওই বাড়িতেই ছিল। ওই সময় তারা দৌড়াইয়া পালাইছিল। পালায়ে জীবনটা কোনোরকমে বাঁচাইছে।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- আমার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় মে মাসের শেষে। ওই সময় এই এলাকায় জেড ফোর্সের যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অ্যাটাক করতেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিল লেফটেন্যান্ট মাহফুজ। আর আমরা যারা মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাইছিলাম, তারা হালকা ট্রেনিং নিলেও তখন তেমন কিছু করতাম না। ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন নিয়োগী আমাদের পরিচালনা করতেন। তিনি অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। মানে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। প্রথম দিকে আমরা তার নির্দেশমতো চলেছি।

গাইড হিসেবে কোনো যুদ্ধে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

- হ্যাঁ। একটা যুদ্ধের কথা বলি। সেই যুদ্ধে আমি গাইড হিসেবে ছিলাম। সেটা হয় রমজান মাসে। ওই সময়ে রমজান শুরু হয়ে গেছিল। সেই সময় মহেন্দ্রগঞ্জ সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে কিছুটা দূরে নন্দীরবাজারের ঘেগাপাড়ায় আমরা ছিলাম। একদিন মেজর তাহের খবর পাঠালেন যে, আমি এবং দেলোয়ার যেন তাঁর কাছে যাই। একজন আমাকে সকালে খবরটা দিল। আমি দুপুরের পরে উনার নির্দেশ মোতাবেক দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি, ক্যাম্পের পিছনে একটা জাগায় কয়েকজন ইন্ডিয়ান অফিসার এবং বাংলাদেশের জেড ফোর্সের কয়েকজন অফিসার বসে। টেবিলে একটা ম্যাপ। আমাকে তাদের একজন সেই ম্যাপ দেখিয়ে বলল, কামালপুরে গোডাউনটা কোনখানে? আমরা প্রায়ই তখন বাংলাদেশের ভিতর রেকি করতে আসতাম।

কোথায় কী আছে, আমাদের সব জানা। ওই ম্যাপটা কামালপুর এলাকার ছিল। কোন স্থানে গোডাউন, সেটা আমি তাদের দেখিয়ে দিলাম। তারপর মেজর তাহের সাহেব আমাকে বলল যে আজ কামালপুরে অ্যাটাক করা হবে।

সেদিন কয় তারিখ ছিল?

- এটা রমজান মাসের গোড়ার দিকে। তখন রমজান মাস ছিল, এটা আমার পুরোপুরি খেয়াল আছে। তারিখ মনে নাই। মেজর তাহের সাহেব, ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল, তাদেরকে কামালপুর থেকে উত্তর দিকে প্লেস করলেন। আরও কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে জেড ফোর্সসহ পশ্চিম ও পূর্ব দিকে প্লেস করলেন। আরেকটা গ্রুপকে তিনি কাট অফ পার্টি হিসাবে বকশীগঞ্জ এবং কামালপুরের মাঝখানে প্লেস করলেন। পশ্চিমে, মানে ধানুয়া গ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১১টা বাংকার ছিল। সেটা তিনি কভার দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা। আর অ্যাটাক শুরু করল আমাদের কিছু সুদক্ষ বাঙালি সেনা। ইন্ডিয়ান আর্মির কিছু সেনাও ওই দিনের যুদ্ধে ছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি। কী ব্যানার্জি, তা জানি না। উনি মারাঠা রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ছিলেন।

তো সেদিনের অ্যাটাকটা হলো গাঙচিলের মতো। কামালপুর বিওপির পশ্চিম থেকে আমরা গাঙচিলের মতো আসছিলাম। রাতের শেষ পর্যায়ে কামালপুর বিওপির পশ্চিমে ৩০০ গজের মধ্যে আমরা চলে যাই। আমাদের যোদ্ধারা পুরোপুরিভাবে পজিশন নেওয়ার আগেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফায়ার শুরু করে। আমাদের গতিবিধি তারা কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়। যেভাবেই হোক, টের পেয়ে তারা ফায়ার শুরু করল। তখন আমাদের পক্ষ থেকেও ফায়ার ওপেন হলো চতুর্দিক থেকে।

কিন্তু এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্য ভর করে। আমাদের লিডারসহ কয়েকজন আহত হয়ে গেলেন। ইন্ডিয়ান বাহিনীর ম্যাক্সিমামগুলা এখানে মৃত্যুবরণ করল। তারপর সকাল আটটা-নয়টা হয়ে গেল। তখন আমরা আর ব্যাক করতেও পারছি না। আবার অ্যাডভান্সও করতে পারছি না। আমাদের সকলের সঙ্গিন অবস্থা আর কি।

ওখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংকারগুলো খুব সুরক্ষিত ছিল। দেখা গেল, আরআর গান ছাড়া বাংকারে আক্রমণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু আরআর গান আমাদের দলের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নাই। এলএমজি বা এসএমজির গুলি বাংকারের ওয়াল ভেদ করতে পারছে না বা তার কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সুরক্ষিত বাংকারের ভিতর থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ফায়ার করছিল। সেদিন যুদ্ধের সময় আরেকটা সমস্যা হলো। বকশীগঞ্জের ওই দিক থেকে, মানে পিছন থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর থ্রি ইঞ্চ, সিক্স ইঞ্চ মর্টার আমাদের ওপর পড়া ধরল। সেই মর্টারের চাপে আমরা অ্যাডভান্স করা তো দূরে থাক, ব্যাক করাও আমাদের জন্য সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যদিকে আমাদের পক্ষের মর্টারগুলাও পড়ছে আমাদের সামনে, আর শত্রুদের মর্টারগুলা পড়ছে আমাদের পিছনে। এই অবস্থায় আমরা না পারি সামনে যাইতে, না পারি পিছনে যাইতে। গাইড হিসেবে আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম, তারা ছিল অ্যাডভান্স পার্টি। একপর্যায়ে মর্টার আসা একটু কমে গেল। তখন আমি পিছনে চলে গেলাম।

সেদিন আমি একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। মনে মনে ভেবেছিলাম যে আজকে বোধহয় আল্লাহ পাক আমাকে এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফেরত নিবেন না। সেদিন আমার সঙ্গী গাইড সাইদুর ওখানে আহত হয়। শেলিং কমে যাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান আর্মির যে অফিসার ছিল, তাকে আমি বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে বললাম যে মেরা দোস্ত উনডেড হ্যায়। তাকে নিয়ে যেতে হবে। সে বলল, নিয়ে যাও। তার পরে আমি আমার সেই সঙ্গীটাকে জড়িয়ে ধরে ক্রলিং করে কোনোরকম করে পিছনে নিয়ে যাই। কিছু শক্তি তারও ছিল। সে জন্য আমাকে বেশি কষ্ট করতে হলো না। পিছনে একটা জলা ছিল। সেই জলার ভিতর দিয়া কোনোরকম করে পিছাই গিয়া ওকে আমি পিছনের দলের কাছে হ্যান্ডওভার করি, আমিও তখন পিছনে সরে যাই। আমি যাইয়ে পিছনের দলের সঙ্গে যোগ দিলাম।

এই যুদ্ধে নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন?

- মেজর তাহের সাহেব, যাঁর কথা আগে বললাম। উনি নিজেই যুদ্ধ ফিল্ডে ছিলেন। শুধু উনিই না, উনার এক সহোদর ভাইও ছিলেন সেই যুদ্ধে। তার নাম সাইদুর। উনার আরেক নিকটতম লোক বেলাল, বাহার এবং উনার বোন টুলীও সেদিন ওই যুদ্ধ ফিল্ডে সহযোগী হিসেবে ছিলেন। মেজর তাহের সাহেব ছিলেন কভারিং পার্টিতে। এই পার্টিটা বাড়ুর ওখানে ছিল। এই জায়গাটা ছিল বর্ডারের সঙ্গে। সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মর্টারের স্প্লিন্টার ওনার পায়ে লাগে। স্প্লিন্টারের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন। সেদিনের ওই অপারেশনটা খুব জোরালো রকমের ছিল। কিন্তু এই অপারেশনে আমাদের পক্ষে ফলাফল খুব একটা ভালো হয়নি। ওই দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মর্টার ফায়ারের কারণে আমরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম।

আসলে জুনের পর থেকে এই এলাকায় প্রায় দিনই যুদ্ধ হয়েছে। যেদিন হয়নি, সেদিন এই এলাকার লোক বলত, আজকে গুলি বা শেল ফোটে না কেন! গুলি ফুটাকে মানুষ অনেকটা স্বাভাবিকই ধরে নিয়েছিল। অনেকের মধ্যে আবার

নেশা ধরে গেছিল যে গুলি ফুটতে হবে। গুলি না ফুটলে আজ কিছু হলো না, এই ধরনের কথাবার্তা মানুষ বলত।

কামালপুর মুক্ত হলো কত তারিখে?

● সম্ভবত ৫ ডিসেম্বর বা তারপর। মুক্ত কামালপুরে বাংলাদেশের পতাকা তোলেন তৎকালীন ক্যাপ্টেন মান্নান।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার স্কুল-মাদ্রাসা, বাড়িঘর এইগুলোর কী অবস্থা দেখলেন?

● আমার এলাকা ধানুয়া-কামালপুর বলতে এখানে কয়েকটা গ্রামকে বোঝায়। ফিরে এসে আমার এলাকাটাকে মনে হলো একটা শ্মশান। গোটা এলাকাটার একদম শ্মশানের মতো ভাব। বাড়িঘর তেমন নাই। গাছগাছড়ার ডালপালা নাই। অনেক ভিটাবাড়ির চিহ্ন নাই। সেসব স্থানে আগাছা ভর্তি এবং পোড়া মাটি। রাস্তাঘাটের খুব খারাপ অবস্থা। তখন রাস্তাঘাটে চলাচল করা যেত না। কেননা, রাস্তাঘাটের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মাইন, শেল বা গ্রেনেড এগুলি পড়েছিল। ওসব বিস্ফোরিত হয়ে স্বাধীনতার পরে অনেকে আহত হয়েছে বা মারা গেছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
২৪ আগস্ট ১৯৯৬

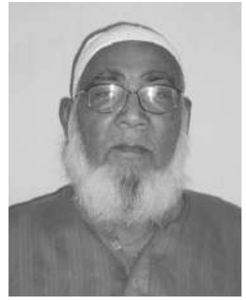

মো. আবদুল করিম

পিতা : ইব্রাহীম আলী। গ্রাম : দুপুরিয়া, ইউনিয়ন : কানশা, ডাক : ধানশাইল বাজার, থানা : ঝিনাইগাতি, জেলা : শেরপুর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমএ, বিএড। ১৯৭১ সালে বয়স : ৪১। ১৯৭১ সালে পেশা : প্রধান শিক্ষক (ধানুয়া-কামালপুর কো-অপারেটিভ উচ্চবিদ্যালয়, বর্তমান পেশা : অবসরপ্রাপ্ত।

১৯৭১ সালে আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দল করতেন?

● হ্যাঁ, আমি তখন আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি থানা আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম। ২৬ মার্চে ঢাকার খবর শুনে ২৭ তারিখে এখানকার জনগণের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এর পরপরই এক সুবেদার সাব এখানে আসেন এবং উনি আমাদের স্থানীয় কিছু লোককে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বর্বর হামলা শুরু করল—এ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

● শুনেছি যে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকাতে পিলখানায় তদানীন্তন ইপিআর ক্যাম্প এবং রাজারবাগের পুলিশ ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ চালাইয়া বহু লোককে হতাহত করেছে। রাজনীতিবিদ বা অন্যান্য যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের ওপরও আক্রমণ হচ্ছে।

আপনি কীভাবে শুনেছেন?

● এটা কিছুটা জনমুখে এবং কিছুটা রেডিওর মাধ্যমে শুনেছি।

১৯৭১ সালে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● আমি সরাসরি আক্রান্ত হই নাই। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত আসে, তখন আমার ভিতরে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। কারণ, আমার একটা

তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল '৬৯ সনের গণ-আন্দোলনের সময়। ওই গণ-আন্দোলনে আমার কামালপুর স্কুলের ছাত্ররা সক্রিয় ভূমিকা নেয়। পুরা আন্দোলনে তারা ছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের পরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, তখন কর্তৃপক্ষের সমস্ত চাপটা আমার ওপর আসে। আমাকে বহু কৈফিয়ত দিতে হয় এবং বহুখানে বহু সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়। তখন অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই কারণে আমার একটা ধারণা হলো যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি কামালপুর এসে যায়, তাহলে এরা যেভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে, তাতে আমার জানমাল যে নিরাপদ থাকবে, এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কাজেই আমি বেশ ভীত হয়ে পড়লাম। এই কারণে আমি বাড়িতে শুধু বলছি, গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি—এ কথা বইলা আমার সবকিছু ফেইলা, মানে আমার যা কিছু ছিল, ঘরদুয়ার, জিনিসপত্র, কাপড়চোপড় সব ফেইলা শুধু আমার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে, আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমার গ্রামে চলে গেলাম। আমি ভাবলাম, ওই জাগাটা নিরাপদ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখানে আসার সপ্তাহ দুই বোধহয় আগে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমি বাড়িতে চলে যাই। পরে আবার আমি আসছি।

এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মনে হয় ৬ জুন পাকাপাকিভাবে আসে। এর আগে মাঝেমধ্যে আসত। আবার চলে যেত। এরা স্থায়ীভাবে আইসা এখানে আস্তানা গাড়ে ৬ জুন। আমি আবার ঠিক ৬ জুন কামালপুর আইসা হাজির। কেননা, ৬ জুন আমাদের ওপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল যে তোমাদের সবাইকে স্কুলে যেতে হবে বা স্কুলে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, মনে হয় গেদরা পর্যন্ত আইসা, জানতে পারলাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আইসা গেছে। কিন্তু এরা মানুষের সাথে ভালো আচরণ করতেছে। কোনো ভয় নাই। যাওয়া যায়। এই খবরটা একজনে দিল। তো আমি বললাম, আসছিই যখন তখন স্কুলে যাই। কোনো অসুবিধা তো নাই। কিন্তু যখন আমার শিক্ষকদের সাথে নিয়া স্কুলে আসতে থাকি এবং আমি যখন স্কুলের কাছাকাছি আসছি, তখনই দেখলাম যে আশেপাশে কোনো লোকজন নাই। কোনো বাড়িতে লোকজন নাই। তখন আমার ভিতরে কিন্তু ভীতির সঞ্চার হয়। আমি তখন ভাবলাম যে নিশ্চয়ই জানমাল এখানে নিরাপদ না। এটা না হইলে জনগণ গেল কোথায়? কিন্তু তখন তো আবার ব্যাক করতেও পারতেছি না। কেননা, আমরা ওদের দৃষ্টির সীমানায় আইসা গেছি। আমি আমার শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করলাম। আমি বললাম, এখন যদি আমরা ব্যাক করতে যাই, তাহলে কিন্তু আমাদের ওপর ফায়ারিং হবে। আস্তে আস্তে যখন এসে পড়ছি, তখন আল্লাহ ভরসা, এখন দেখা যাক কী হয়। আমরা তো স্কুলে আসে পড়লাম। আমার স্কুলের সামনে তখন সেন্ট্রি ছিল। সে সেখানে আমাদের হল্ট করছে। সেন্ট্রিকে আমি বললাম যে, এইডা আমাদের স্কুল। বুঝানোর চেষ্টা করলাম। ওরা উর্দু বলে, আমি বাংলা বলছি। আমি

উর্দু বুঝি না, ওরাও বাংলা বুঝে না। অনেকভাবে বুঝালাম যে, এইডা আমাদের স্কুল, আমাকে এখানে যেতে হবে। ওই সেন্ট্রি আমাকে ডেকে এনে স্কুলের পাশে দাঁড় করাইল। তারপর সে অকথ্য ভাষায় যা মুখে আসে, সেই ভাষায় বকাবকি শুরু করে দিল। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম যে সর্বনাশ, বোধহয় আমরা আর ফিরে যেতে পারব না। কারণ, এরা যে আচরণ করতেছে! তখন আমি সাহস করে ওকে বললাম যে, আমি ক্যাপ্টেন সাহেবের সাথে দেখা করব। এই কথা বলার পর ওই পাক আর্মি অন্য মাস্টার সাহেবদের ওখানে রেখে আমাকে নিয়ে আসলো। স্কুলের সামনে আইসা আমি বাজারের যে দৃশ্য দেখি, তাতে আমি খুবই মর্মাহত হই। আমি তখন আরও ভীত হয়ে পড়ি। দেখলাম, সমস্তখানে আগুন দিয়ে পোড়ানো। একটা ঘরও তারা রাখেনি। এন্টায়ার বাজারটা জ্বালাই দিছে। শুধু স্কুলটা দাঁড় করানো। স্কুলটা দাঁড় করানো ব্যতীত আর সমস্ত মার্কেটে যত ঘরদরজা ছিল, সব জ্বালাই দিছে। শুধু আগুন আর আগুন আর ধোঁয়া। এইটা কিন্তু জুনের ৬ তারিখের ঘটনা।

যাহোক, তারা আমাকে কিছুক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাইখা মনে হয় ক্যাপ্টেনের পারমিশন নিতে গেল। লোকটা বোধহয় একজন সুবেদার। ওই সুবেদার বা ওই-জাতীয় কোনো সৈনিক কিছুক্ষণ পরে ফিরে আইলো। ফিরে আইসা আমাকে বলল, আসেন। তো আমি তাকে ফলো করলাম। পরে ডাকবাংলায় গিয়া উঠি। ডাকবাংলায় উইঠা উনাকে খবর দিলে উনি বের হয়ে আসলেন। আমি হাত বাড়াই দিই হ্যান্ডশেক করার জন্য। আমার সাথে উনি হ্যান্ডশেক করার পর আমাকে বসতে বললেন। দেখি যে, ইউনিয়ন পরিষদে যে সোফাসেটটা ছিল, সেই সোফাসেটটা নিয়ে ডাকবাংলায় সেট করছে। উনিও বসলেন। বসার পর উনি কথা বলা শুরু করলেন। কিন্তু আমি তো উর্দু কথা বুঝি না। তখন বললাম যে, আই ক্যাননট আন্ডারস্ট্যান্ড উর্দু। আই মে টক টু ইংলিশ, ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি। তখন বললেন, প্লিজ গো অন। আমি বললাম যে, আই অ্যাম দ্য হেডমাস্টার অব দিজ ইনস্টিটিউশন। আই হ্যাভ কাম হিয়ার টু জয়েন। তখন উনি বললেন যে ঠিক আছে। তো উনি তখন হাবিলদার বা সুবেদারকে ডেকে বললেন যে এইটা কিন্তু স্কুল, আর স্কুলের যেন কোনো জিনিস তছনছ না হয়, নষ্ট না হয়। তারপর আমাকে উনি বললেন যে আপনি কর্তৃপক্ষকে জানান যে, আমরা স্কুলটা দখল করে নিয়েছি, অন্যখানে যাতে স্কুল করা যায়—সেই ব্যবস্থা যেন তারা নেয়।

আমি ফিরে আসলাম। উনি কিন্তু আমার সাথে খুব একটা খারাপ ব্যবহার করলেন না। এর আগে পাকিস্তানি ফোর্সের লোকটা আমার সাথে যে খারাপ ব্যবহার করছিল—ওই অফিসারের সঙ্গে কথা বলার পর ওরাও কিন্তু আর খারাপ ব্যবহার করল না। ইন দ্য মিন টাইম আমার সহকর্মীদের সাথে আর্মির লোক খুবই খারাপ ব্যবহার করছে। তারা তো তখন স্কুলের পাশে ছিল। পরে আমি নমিনাল স্কুলের

ভিতরে ঢুকলাম। দেখি যে, না, মোটামুটি জিনিসপত্র এবং আলমারিগুলা ঠিকই তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। আমার ভিতরে একটু ভয় ছিল। কারণ, আমি আওয়ামী লীগ করতাম। অনেক সময় চিঠিপত্র যোগাযোগ হইত। আওয়ামী লীগের খোঁজখবর পাইলে তো সর্বনাশ। চিঠিপত্র কিছু কিছু আছে আমার, আছে এখানেই। তখন আমি আলমারি খুলে যতটুকু পারছি, এগুলি বের কইরা নিয়া সরাইয়া ফেললাম। যদিও আগেই আমি চেষ্টা করছি সরাই ফেলার জন্য। তবু আরেকটু, যতটুকু পারা যায়, দেখলাম। পরে ওদের সঙ্গে কথা বইলা আমি চইলা আসি। সেদিন আর কোনো অসুবিধা হইল না।

পরে আরেকটা ঘটনা, সেদিন খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হইছিল। আমি মেজর না ক্যাপ্টেন আইয়ুবের সাথে দেখা করলাম এই ক্যাম্পে। আইয়ুবের সাথে আমার দেখা করার কারণ হলো, আমরা তো '৭১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বেতন পাই না। শিক্ষকরা খুব অর্থাভাবে ছিল। আমি নিজেও খুব অর্থাভাবের মধ্যে ছিলাম। তখন সরকার থেইকা একটা ঘোষণা দিল যে, যার যে বেতন পাওনা আছে, এইডা বিল করে টাকা নিয়ে যেতে পারে। তখন লোভ হইল আর কি। কী করব? বিল করতে গেলে স্কুলের রেকর্ড বের করতে হয়, নিতে হয়। এইটা আমার মনে পড়ে জুন মাসেরই ঘটনা। তহন আমি আবার এলাম। আমার মাস্টার সাহেবদের সাথে এটা নিয়ে কথা হয়। সবাই আমার সঙ্গে যাবে বলল। কিন্তু আমার টিচাররা কিছুদূর যাওয়ার পর আর আমার সঙ্গে আসলো না। বলে, না, আপনি একাই যান, স্যার। আমরা এইখানে অপেক্ষা করছি। আমি ভাবলাম যে, এরা ভয় পাইছে। আমার ধারণা হলো যে সেদিন তো তারা ভালো ব্যবহার করছে। সুতরাং তাদেরকে আমাদের ব্যাপারটা কইতে তো অসুবিধা নাই। সাধারণ যে পথ, সেই পথ দিয়ে আসলাম না। আসলাম ফুটা মিয়ার বাড়ি দিয়া। আইসা আমি আমার জেঠারে সাথে নিলাম। আমার জেঠার কাছে শুনলাম যে আর্মি অফিসার আরেকজন আসছে। এই কথা শুনার পর তখনই কিন্তু আমার ভয় ধরল। আগের অফিসারের সাথে পরিচয় ছিল, কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন না জানি উনি কী করেন? জেঠারে বললাম, চলেন আমার সাথে। তো উনিও আমার সাথে চললেন আর কি। আমি বললাম, আপনার সাথে পরিচয় আছে, আপনে চলেন আমার সাথে। একসঙ্গে ক্যাম্পে আমরা গেলাম। ডাকবাংলায় গিয়ে প্রথমেই পূর্ববর্তী ক্যাপ্টেনকে পেলাম। উনি থাকতেই তখন ক্যাপ্টেন [?] আইয়ুব বাইর হইল। ক্যাপ্টেন আইয়ুবকে দেখেই আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ক্যাপ্টেন আইয়ুবের চেহারাডার একটু বর্ণনা দেই। চেহারাটা দেখলাম সুদর্শন, বেশ লম্বা। একটা মানুষকে সুন্দর চেহারার হতে গেলে যা দরকার হয়, সে সবই ছিল তার। চুলগুলা ঝাঁকড়া, ঘন। সে বের হয়ে আইসা হুংকার ছাড়ি দিল। কয়, ক্রিমিনাল, সব

ক্রিমিনাল। ক্রিমিনাল কওয়া শুরু করে দিল। সে কয় যে, আপনারা দেশটাকে শেষ কইরা ফেলছেন। আপনার সব ছাত্র ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। সব মুক্তিবাহিনীতে চলে গেছে। এইভাবে যখন আমাকে সে ধমক দিল, তখন আমি বললাম, না, তারা তো মুক্তিবাহিনীতে যায় নাই। তখন কয়, কোথায় গেছে? ওই গুলি তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব না—আমি কলাম। তখন কিন্তু আমি তার সামনেই বললাম যে উর্দুতে আপনি বলতেছেন, আমি কিন্তু উর্দু জানি না। আই ক্যান টক ইন ইংলিশ। তখন বললেন যে, ইয়েস, ইউ টক টু মি ইন ইংলিশ। আমাকে কিন্তু সে বসতেও বলল না। কেবল ধমকের ওপরে ধমক দিয়ে উনি শুরু করলেন। তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হইল যে, সে আমাকে গুলি করবে, আমাকে সে ছাড়বে না। আমিও তার কথার জবাব দিয়া যাইতেছি। সেদিন আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইল যে একটা মানুষ, যখন তার মৃত্যু অবধারিত বলে মনে করে তখন, সে আর মৃত্যুকে ভয় করে না। আমিও ভাবলাম, আমাকে তো ছাড়ছে না, আমাকে মেরে ফেলবে। সুতরাং আমি তার কথার স্পষ্ট জবাব দিব। তো কথার জবাব দিতেছি। একপর্যায়ে উনি বললেন, আপনারা স্কুলে কী পড়ান? ইসলাম ধর্ম পড়ান? আমি বললাম যে, না। কেন পড়ান না? তো আমি বললাম যে এইডা আমার করণীয় কিছু নাই। যে স্কুলের যে সিলেবাস। স্কুলের সিলেবাসে তো এইটা নাই। কর্তৃপক্ষ যেভাবে সিলেবাস তৈরি করে দেন, সেভাবেই আমরা পড়াই। তারপরে উনি আমাকে বললেন যে, ডিড ইউ সেন্ড ইউর সাজেশনস টু দ্য অথরিটি কনসার্ন? তখন আমি বললাম, ইয়েস, আই স্যাল সেন্ড মাই সাজেশনস টু দ্য অথরিটি। তখন উনার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তার কথাবার্তা স্বাভাবিক হইল। উনি বললেন, দেখেন ইসলামিক স্টাডিজ আপনারা স্কুলে পড়ান না, ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেন না এবং তার জন্যই আমাদের এই দেশের সমস্ত ছেলেপেলে হিন্দু বনে যাচ্ছে। হিন্দুদের সঙ্গে এরা আঁতাত কইরে এখন আমাদের দেশটাকে নষ্ট করে দিতে চাচ্ছে। তখন উনি আমাকে অ্যাডভাইস দিলেন যে ইসলাম ধর্মটা প্রতিদিনই একটা পিরিয়ডে প্রত্যেকটা ক্লাসে পড়ানো দরকার। আর যদি প্রতিদিন না হয়, তাহলে উইকলি একবার একটা পিরিয়ড আপনারা করবেন। এইটা না করার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। আমি বললাম যে এটা ঠিকই। তার কথায় আমি সম্মতি প্রদান করি। উনি ইংরেজিতে বললেন, টেল ইউর কান্ট্রি ম্যান, উই হ্যাভ কাম হিয়ার নট টু কিল ইউ, বাট টু প্রোটেক্ট ইউ। আমি তখন জোরালোভাবে বললাম যে, মেনি থ্যাংকস ফর সেভিংস আওয়ার মাদার ল্যান্ড। তহন আমার ভিতরে আবার যেন প্রাণ ফিরে পাইছি। আমার মনে হইল যে আর মারব না আমারে। এরপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে আমার গল্প হইল। আমি ভাবলাম যে এর কাছ থেকে এখন সরে যাওয়া দরকার। কেমনে যাই? আমি তখন বললাম, আমাকে বহুদূর যাইতে হবে, লেট মি

গো। উনি তখন বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেছেন এবং বললেন যে, প্লিজ মেইক কো-অপারেশন উইথ আস অ্যান্ড টেল ইউর কান্ট্রি ম্যান টু মেক কো-অপারেশন উইথ আস। তো আমি বললাম, হোয়াই নট! এরপর আবারও বললাম যে, আমাকে বহুদূরে যাইতে হবে। তখন উনি বললেন, ইয়েস, ইউ মে গো। উনি আবার মনে করিয়ে দিলেন যে, কর্তৃপক্ষকে বলবেন যে, আমরা আপনার স্কুল দখল করে স্কুলে ক্যাম্প করেছি, এখানে এখন লেখাপড়া হবে না। অন্যখানে আপনারা ব্যবস্থা করেন। আমি মনে মনে বললাম, তোমরা এইডা দখল কইরা লইছো, ভালো হইছে। আমার তো আর স্কুল খোলা লাগবে না এই সময়ে। আর স্কুলই বা হইব কেমনে? তখন এই এলাকার মধ্যে কোনো লোকজন ছিল না। এরপর আমি ওখান থেকে চলে আসি।

শুনেছি, ২৬ মার্চের পর পাকিস্তানিদের মোকাবিলা করার জন্য এখানকার জনগণ ট্রেনিং নেওয়া শুরু করেছিল? এ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- এখানকার সীমান্তে যে ইপিআর ক্যাম্প ছিল, সেই ক্যাম্পের বাঙালি ইপিআরদের নিয়ে এখানে একটা বাহিনী তৈরি করা হয়। এই বাহিনীতে আনসার ছিল, অন্যরাও ছিল। এই বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার জন্য অত্র অঞ্চলের জনগণের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া হয়। জনগণ এগিয়ে আসে। এই ট্রেনিং এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিষয়টি আমি এখানে থেইকা যাওয়ার আগ পর্যন্ত চলছে। এরপর যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখানে আসা শুরু হইছে, তখন সবাই তো ছত্রভঙ্গ হয়ে ইন্ডিয়ার দিকে চলে গেছে। এরপর তখন যে ভূমিকাটা আরম্ভ হয়, সেটা ইন্ডিয়ায় গিয়া।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের মধ্যে আপনি উপস্থিত ছিলেন—এ রকম কোনো যুদ্ধের ঘটনা আপনার মনে আছে কি?

- আমার একটা যুদ্ধের ঘটনা মনে আছে। তারিখটা মনে নাই। ফাইডাঙ্গাতে একটা ক্যাম্প ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। এই ক্যাম্পটা আমার বাড়ির কাছে। খুবই কাছে। দুই-তিন কিলোমিটারের ভিতরে। হঠাৎ শুনি যে, পাকিস্তানি সেনাদের ওই ক্যাম্প মুক্তিবাহিনী ঘিরে ফেলছে। সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে এবং লোকমুখে তখন শুনতে পেলাম যে পাকিস্তানি ঘাঁটির পতন অনিবার্য। কিন্তু একটু পরেই আবার জানতে পারলাম যে, যুদ্ধের মোড়টা ঘুরে গেছে। শ্রীবর্দী থেকে মেজর আইয়ুবের নেতৃত্বে কিছু ফোর্স ফাইডাঙ্গার দিকে অভিযান চালায় এবং এর ফলে মুক্তিবাহিনী তাদের যে অবস্থানে ছিল, সেই অবস্থান থেকে পিছু হইটা যায়। অনেক মুক্তিবাহিনীর ছেলেপেলে আমার বাড়ির পাশ দিয়া, বাড়ির আঙিনা দিয়া ইন্ডিয়ার দিকে চইলা যায়। তখন ফাইডাঙ্গাটা ছিল শ্রীবর্দী থানার মধ্যে। শ্রীবর্দীতেও একদিন ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং সেদিন দু-একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

ডিসেম্বর মাসে কামালপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে, আপনি কি তারিখটা বলতে পারবেন?

- তারিখটা সঠিক আমার মনে নাই। তবে আমার যতটা মনে হয়, এইটা ১৫ ডিসেম্বর হবে বা ১৪ তারিখের দিকে হবে। সেদিনটা আমার খেয়াল আছে এই জন্যই যে, ওই দিনই আমার স্কুলের যে সমস্ত ছাত্র মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়, তারা কিন্তু এই বকশীগঞ্জ দিয়ে বের হয়ে এসে আমার বাড়িতে গিয়ে জমা হয়।

আপনার এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়টা কি আপনি বলতে পারবেন?

- পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন বকশীগঞ্জ থেকে বেরিয়ে কামালপুর ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল, তখনই তারা মুক্তিবাহিনীর ঘেরাওয়ের ভিতরে পইড়া যায়। তখন তারা তো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। আমারই স্কুলের ছাত্র ইকবাল আজাদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে ইকবাল আজাদই যান তাদের আত্মসমর্পণ করানোর জন্য। ইকবাল আজাদের প্রস্তাবে তারা সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং আত্মসমর্পণ করে। আমি পরে শুনতে পাই আত্মসমর্পণের দিন ১৯৩ জনের মতো পাকিস্তানি সেনা ছিল। এদের মধ্যে পাঞ্জাবি ছাড়াও কিছু বাঙালি আলবদর বাহিনী বা রাজাকার ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছিলেন?

- না, মুক্তিযুদ্ধে কেউ শহীদ হয় নাই।

যুদ্ধের শেষে আপনার এলাকার অবস্থা কেমন দেখলেন?

- যুদ্ধের শেষে এলাকার সবই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে মাসাধিক সময় লেগে যায় বা তারও বেশি সময় লাগে।

যুদ্ধের শেষে আপনি কী করলেন?

- খুব সম্ভব ১৫ ডিসেম্বর তারিখে আমি কামালপুরে চলে আসি। আইসা দেখি, কামালপুর একেবারে যুদ্ধবিধ্বস্ত। তখন আমি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমি এসে দেখি যে, আমার নিজের ঘরও ধ্বংস হয়ে গেছে। এক কথায় কামালপুরে কারোরই কোনো বাড়িঘর ছিল না। সবই ধ্বংস হয়েছিল। এই ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আবার নতুন কইরা সবাই বাড়িঘর করার কাজে যে যার মতো করে লেগে যায়। আমি বেশি কইরা সময়টা দিই আমার স্কুল গড়ার কাজে। আমি প্রথম দিকে তো স্কুল শুরু করি খোলা মাঠের ওপরে। খোলা মাঠে গাছের নিচে আমি সুদীর্ঘ দিন কিন্তু স্কুল করি। ছাত্ররা চাটাই বিছাইয়া ক্লাস শুরু করে। তারপর আস্তে আস্তে এই স্কুল বর্তমান অবস্থাতে ফিরে আসে। বেশ সময় লেগেছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মো. মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

পিতা : মরহুম তসলিম উদ্দিন সরকার। গ্রাম : ধানুয়া সরকারবাড়ি, ডাকঘর : ধানুয়া কামালপুর, ইউনিয়ন : ধানুয়া, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৯। ১৯৭১ সালে পেশা : বেকার। বর্তমান পেশা : চাকরি (মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট)।

৭ মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনেছিলেন?

● শুনেছি।

কীভাবে শুনলেন?

● রেডিওর মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের পরবর্তী দিনগুলোতে যে অবস্থার সৃষ্টি হলো, সে সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

● আমাদের এলাকায় বিওপিগুলিতে যারা বিহারি বা অবাঙালি ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের বেশ গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বিহারি মারা হইছে কামালপুর ও কর্ণজোড়ায়।

২৫-২৬ মার্চে তো ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আক্রমণ করে অনেক মানুষকে হত্যা করল, বাড়িঘর পোড়াল—এ খবর আপনি কখন পেলেন?

● আমরা ২৬ মার্চেই পাইয়া গেছি।

এটা শোনার পর আপনারা কী করলেন?

● তখন তো আমরা ভারতে যাওয়ার চিন্তা করলাম।

আমরা শুনেছি যে ২৬ মার্চ বা ২৫ মার্চের রাতে ঢাকাতে পাকিস্তানি সেনাদের ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরের দিন থেকে কামালপুরে যে ইপিআর ক্যাম্প ছিল, সেই ক্যাম্পগুলোর বাঙালি ইপিআর এবং স্থানীয় জনসাধারণ মিলে পাকিস্তানি বা অবাঙালি ইপিআরদের ক্যাম্প

থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল? আবার কাউকে কাউকে নাকি মেরেও ফেলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?

● আমরা ছাত্র, কৃষক এবং ইপিআররা মিলে কর্ণজোড়া ক্যাম্প এবং কামালপুর ক্যাম্পে, মানে ইপিআর বিওপিতে লাঠি ফালা, রাইফেল দিয়ে হামলা করি অবাঙালি ইপিআরদের ওপর। ওই দুই বিওপি থেকে পাকিস্তানি ইপিআরদের কাউকে মারা হইছে, আর কেউ কেউ পালায় গেছে।

'৭১ সালে আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

● হ্যাঁ, মাতৃভূমি রক্ষার্থে যুদ্ধে গেছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুবক, ছাত্র, কৃষক যাদের পাচ্ছে, তাদের ওপরই অত্যাচার করছিল, এদের বাঁচানোর জন্য যুদ্ধে গেছি। বর্ডার আমাদের কাছে। আমরা বর্ডার পার হয়ে গেছি। পরাই গ্রাম থেকে আমরা ৩০-৩২ জন একসঙ্গে গেছি।

কয় তারিখে গেলেন?

● আমরা গেলাম এপ্রিলের ৭ তারিখে।

আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন '৭১ সালে?

● আক্রান্ত হইছি।

কীভাবে আক্রান্ত হলেন?

● আমি ২৯ নভেম্বর কামালপুরে আক্রান্ত হইছি। মনে করছি, আজ আমরা এলাকা স্বাধীন করব, কামালপুরে বিজয়ী হব। কিন্তু সেদিন তো হতে পারি নাই। ২৯ নভেম্বর দিনগত রাত ১১টা ৫-এ গুলি লাগে আমার পায়ে। গুলি এবং শেল দুনোটাই লাগে। আমার ডাইন পায়ে গুলি লাগে। গুলি লাগার পরও আমি টিপপুরের ব্রিজ পর্যন্ত ক্রলিং করে চলে আসছি। তাতে আসতে টাইম লাগছে। পরাই এলাকায় ভোর ৪টা-সাড়ে ৪টার সময় আইসে পৌঁছি। আমাদের গ্রামের দুই-তিনজন—গোলাপ হোসেন ছিল, বাহাজ ছিল—আমাকে নিয়া আসে। ওরা আমাকে কান্দে তোলার পরে আমার আর জ্ঞান ছিল না। এর আগ পর্যন্ত আমার জ্ঞান ঠিকই ছিল। তখন ক্যাপ্টেন আজিজ এখানেই ছিলেন, এই কামালপুরেই। আর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন হেলাল সাহেব।

ক্যাপ্টেন আজিজ সাহেব কোন দায়িত্বে ছিলেন তখন?

● ধানুয়া-কামালপুর সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

● মনে হয় ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়।

তারা কীভাবে আক্রমণ করল?

● বিভিন্নভাবে আক্রমণ করেছে। বকশীগঞ্জ থেকে পাকিস্তানি সেনা আসে। পরে তো বদরবাহিনী, রাজাকার বাহিনীও আসে। তারা মানে পাকিস্তানি সেনারা লিফট দিচ্ছে, তারপর রাজাকার-বদর বাহিনী আইস্যা মারধর, নারী নির্যাতন,

বাড়ি পোড়ানো শুরু করল। যেদিন আমাদের ধানুয়া গ্রাম পোড়ে, তখন আমি ছিলাম আন্ডার চর এলাকায়। এই এলাকায় আমাদের হাইড আউট ছিল। ওখান থেকে আগুন দেখতে পাইলাম। মনে হইল, আমাদের গ্রামডা পুড়ে যাচ্ছে। তার পরের দিন চলে আসি। দেখি যে শুধু মাটি, গ্রামে আর ঘর নাই।

পুরো গ্রামই পোড়াইয়া দিছে?

- হ্যাঁ, পুরো গ্রামই পুড়াই দিছে। দু-একটা ঘর বোধ হয় বাদ ছিল। এর মধ্যে চেয়ারম্যান বাড়ি ছিল অক্ষত। আমার চাচা, হায়দর সাহেবের বাড়ি ছিল অক্ষত। এ ছাড়া আর সব বাড়িই পুড়াই দিছিল। কিছুই ছিল না।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ৯ মাসে আপনার এই ধানুয়া গ্রামে কী করল?

- ধানুয়া গ্রাম পুড়ায়ে ছারখার করে দিল। অনেক নারী নির্যাতন করল। কামালপুরে পাকিস্তানি বাংকারে অনেক নারীকে পাওয়া গেছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা লাঞ্ছিত হয়েছে। বহু ইন্ডিয়ান আর্মি মারা গেছে। মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে। আমি একজন পঙ্গু মানুষ। কিছু করে খাওয়ার মতো সুযোগ আমার নাই। আমিও যুদ্ধে পঙ্গু হইছি এখানে।

আপনার পরিবারে কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- না, আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই। এখানে গোলাগুলিতে একজন সিভিলিয়ান মারা গেছে। সে আমার সম্পর্কে চাচা হয়। তাঁর নাম হলো হোসেন আলী। পাঞ্জাবির গুলিতেই মারা গেছেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এই গ্রামের আমরা তিনজন গুলি খাই। একজনের নাম হলো লাল মিয়া, আরেকজনের নাম নুরুল ইসলাম, সে-ও বীর প্রতীক; আর আমি একজন। কামালপুরেরও একজন গুলি খাইছে, নয়াপাড়ার একজন খাইছে। তারা দুনোজন মারা গেছে ইদানীং। আমরা কল্যাণ ট্রাস্টের সামান্য কিছু ভাতা পাই, সরকার দিচ্ছে, তার ওপর নির্ভরশীল।

ধানুয়া গ্রামে কি আর কেউ শহীদ হয়েছেন?

- হ্যাঁ। শহীদ দুটার বাড়ি হলো কুমিল্লা, একটার নাম হলো হুমায়ুন। আর দুজনের নাম আমার স্মরণ নাই। জোড়া কবর পড়ছে আমাদের এই পিছনের রাস্তার সাইডে, একটা শ্যাওড়াগাছ ছিল, সেখানে জোড়া কবর। মাডি দিছিলাম।

যুদ্ধের সময় এই এলাকার লোকজন কি প্রায় সবাই ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিলেন?

- বেশির ভাগই চলে গেছিলেন। ৮০% চলে গেছিলেন ইন্ডিয়া। আর ২০% দূরে দূরে বিভিন্ন জায়গায় থাকত।

আপনি তো '৭১ সালে এই ধানুয়া-কামালপুর এলাকায় বিভিন্ন অপারেশনের সাথে জড়িত ছিলেন, আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়—এমন অপারেশন সম্পর্কে বলবেন কি?

- এখানে একটা অপারেশন আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। একদিন আমাদের ৩ নম্বর বাংকারের ওখানে খাসি জবাই করে রান্না উঠাইছি। সেই

টাইমে অপি ছিলেন আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধা। অপি টিন বাড়ি দেওয়ার পরে দেখি যে পাঞ্জাবিরা আসতাছে কামালপুরের দিক থেকে। তখনই খাওয়াদাওয়া বন্ধ কইরা সব ফালাই থুইয়া আমরা রাস্তায় আইসা পজিশন নিলাম। ফার্স্ট বেঙ্গল ছিল এই খাসের গ্রামে। আমরা দুই দিক দিয়ে অ্যাটাক করি। সেই যুদ্ধে বেশ কিছু পাঞ্জাবি সৈন্য মারা গেছিল। একটা হাবিলদারও মারা গেছিল। হাবিলদারের লাশ নিয়া আসা হইছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের কি কোনো ক্ষতি হয়েছিল?

- সেই দিন মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয় নাই বা ভারতীয় আর্মিরও কোনো ক্ষতি হয় নাই। আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টেরও কোনো ক্ষতি হয় নাই।

এর পরে আরও কোনো অপারেশনের কথা মনে পড়ে কি?

- এর পরে কামালপুরের এক যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মারা গেলেন।

ওই অপারেশনে কি আপনি ছিলেন?

- ওই অপারেশনে আমি ছিলাম।

যুদ্ধ করেছেন?

- হ্যাঁ, কাট অফ পার্টিতে ছিলাম আমি। ইন্ডিয়ার নাম ছিল বংশীপাড়া [ইন্ডিয়ার একটি গ্রামের নাম ছিল বংশীপাড়া]। সেদিনও আমরা মনে করেছিলাম জয়ী হব। ভীষণ বৃষ্টি ছিল। ইন্ডিয়ান জনগণ আমাদের দুধ এনে বেশ খাওয়াইছে। পরে আমরা ব্যাক করছি। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনসহ আমাদের ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বহু সদস্য মারা গেছেন সেদিন। মুক্তিযোদ্ধা বা এফএফ কম মারা গেছে।

  ফার্স্ট বেঙ্গল ছিল, এইট বেঙ্গল [এইট বেঙ্গল নয়, এখানে শুধু ফার্স্ট বেঙ্গল ছিল] ছিল। তবে ফার্স্ট বেঙ্গলের বেশি ক্ষতি হইছে। সেদিন প্রচুর লোকজন মারা গেছে। তার মধ্যে একজন এখনো জীবিত আছে। সে আমার বন্ধু, মাইনুল নাম, ঢাকাতে আছে এখন। তার পায়ে গুলি লাগছিল। তিনি ফার্স্ট বেঙ্গলের যোদ্ধা ছিলেন। তাঁকে আমাদের একজন ধানখেত থেকে উঠাইয়া নিয়া ইন্ডিয়া চইলা গেছিল। তারপর আরও অনেক যুদ্ধ আছে। কামালপুরের এক যুদ্ধে মেজর তাহেরও আহত হন।

এটা কত তারিখে?

- মেজর তাহের আহত হন সম্ভবত ১৪ নভেম্বর ১৯৭১।

কীভাবে উনি আহত হলেন?

- আমরা ছিলাম বালুর গ্রামে। বালুর গ্রামে থাইকা মনে করছিলাম যে আজকে ইনশাল্লাহ জয় লাভ করব। আমরা আগাইয়া যাইতেছি। এমন সময় দেখি, পাঞ্জাবি দুই-তিনটা দৌড় মারছে। আমি বললাম যে, গুলি করি। মেজর তাহের বললেন যে না, গুলি করব না। জীবিত ধরব তাদের। জীবিত ধরার

কথা কইয়া আমরা কিছুক্ষণ আগাইছি। তার পরেই আমাদের কামালপুর স্কুল থেকে মর্টার শেল এসে মেজর তাহেরের পায়ে লাগল। তাঁর ভাই বিল্লাল ছিল আমার সঙ্গে। মেজর তাহেরের সে আপন ভাই। আমরা মেজর তাহেরকে কান্দে করে নিয়া ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিই। তাঁকে নিয়া যায়। আমরা ব্যাক করি সেদিন।

মেজর তাহের আহত হওয়ার পর কে সেক্টর কমান্ডার হয়ে আসলেন?

- উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান। উনি পরবর্তী সময়ে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন।

আপনি কি আরও কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

- হ্যাঁ, বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশনে গেছি।

আপনি যুদ্ধ করতে গিয়ে পায়ে গুলি খেয়েছেন কোন মাসের দিকে?

- ২৯ নভেম্বর দিনগত রাত ১১টা ৫-এ, যে কথা আগে বলছি। আমরা কামালপুরে ইপিআর ক্যাম্পে আক্রমণ চালাইছি। ওখানে পাকিস্তানি সেনারা ছিল। বিলডোবাতে ইন্ডিয়ান হাইড আউট ক্যাম্প ছিল। বিলডোবা ক্যাম্প থেকে মর্টার ছাড়ছি। ওখান থেকে আমরা সেকশন বাই সেকশন ভাগ হয়ে আসছি। ইন্ডিয়ান এক ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, উনি বললেন যে, তোমাদের দেশ, তোমাদের স্বাধীন করতে হবে। আমরা তোমাদের সহযোগিতা করব। আমাদের কিছু খানা দিয়ে বললেন, এটা তোমাদের সাত দিনের খানা হইতে পারে, আবার এক ঘণ্টার খানাও হইতে পারে। কামালপুর স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই খানাই তোমাদের জন্য থাকবে। এটা ২৯ নভেম্বরের কথা, সেই রাতেই আমি গুলি খাই।

সেই রাতে কি আরও কেউ আপনার মতো গুলি খেয়েছিলেন?

- মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আমি একা। আমার সঙ্গে শরাফত ছিলেন কামালপুরের।

কামালপুর কবে থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত হলো?

- এটা বোধ হয় ডিসেম্বরের ৭ বা ৮ তারিখ। আমি তখন হাসপাতালে। ২৯ নভেম্বর গুলি খেয়ে হাসপাতালে গেলাম। ডিসেম্বরের ৭ কি ৮ হবে, সিস্টারে বলছে যে তোমাদের কামালপুর স্বাধীন হয়ে গেছে। আমাকে রহমান বলে ডাকত। পুরা নামে ডাকত না। তারপরে আমি ১৬ তারিখে গোহাটিতে চলে গেলাম। কর্নেল ওসমানী আমাকে দেখতে গেছিলেন। সান্ত্বনা দিয়ে ছিলেন অনেক। ১৬ ডিসেম্বর তারিখে ওরা বলতেছে, তোমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে।

আপনি তখন ইন্ডিয়াতে?

- ইন্ডিয়ার পুনা হাসপাতালে। আমার পা কাটার জন্য আমাকে পুনা হাসপাতালে পাঠাইছিল। শুনলাম, এর আগের ফ্লাইটেই মেজর তাহের ওখানে গেছেন। আমি যেদিন গেছি তার আগের আগের তারিখেই মেজর তাহেরকে পুনাতে পাঠাইছে।

একদিন পুনা হাসপাতালে আমি যখন একটা নাটকে গেছি, আমি তখন হুইল চেয়ারে বসা, একজন ইন্ডিয়ান হাবিলদার হুইল চেয়ার ঠেলতাছে, সেখানে যাইয়া দেখি মেজর তাহের। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। তিনিও নাটক দেখতে আসছেন। আমাকে দেইখা তিনি নাইমা আসলেন। নাটক দেখব কি, শুধু চোখের পানি ফেললেন। তারপর বলছে, মতি, তুমি এখানে আসলা? আমি দেখি তারে কান্দন ধরছে। তারপর বলল, কিছু না, আমারও তো পা নেই। তোমার তো পা আছে, কান্দ কেন? এই কথা কইয়া আমাকে নিয়া গেল। ইন্ডিয়ান আর্মিকে বলে দিল, ওর যা যা প্রয়োজন, দিবেন। তারা অফিসার ওয়ার্ডে আর আমি কমন হাসপাতালে।

আপনি কোন মাসে ফিরলেন বাংলাদেশে?

- আমি স্বাধীনতার পর ৭২-এর জুলাইয়ের দুই তারিখে বাংলাদেশে ফিরলাম।

আপনার পায়ে যেদিন গুলি লাগল, অর্থাৎ ২৯ নভেম্বরের অপারেশনের কথা আরেকটু বিস্তারিত বলবেন কি?

- সেই দিন ধানুয়াতে ছিল এক পার্টি, খাসের গ্রামে ছিল আরেক পার্টি, গলাকাটা গ্রামে আরেক পার্টি গেছে। আমরা কালু গ্রামে এক পার্টি, মৃধাপাড়াতেও এক পার্টি। প্রথম 'জয় বাংলা' দেওয়া হলো। তারপর ওদের সারেন্ডার করার জন্য বলা হলো। যখন ধানুয়া থেকে 'জয় বাংলা' বন্ধ করল, তখন খাসের গ্রাম দিল। খাসের গ্রাম বন্ধ করলে গলাকাটা দিল। তারপর ওরা বন্ধ করলে আমরা দিলাম। চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করলাম পাকিস্তানি সেনাদের। আমরা এলাকা স্বাধীন করবই—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা যখন স্লোগান দিলাম, গুলি চালালাম, তখন পাকিস্তানিরা নীরব ভূমিকা পালন করল। যখন আমরা ওদের রেঞ্জের ভিতরে ঢুকে গেলাম, কামালপুর বাজারে একটা বটগাছ আছে, ওখানে ঢুকলাম, আমরা গ্রেনেড চার্জ বা গুলি করতে করতে যাচ্ছিলাম, যেখানে যেখানে বাংকার ডাউট লাগছে, সেখানে গ্রেনেড চার্জ করছি। ওখানে যাওয়ার পরে মানে বটগাছটার ওখানে যাওয়ার পরে, ওরা আমাদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো আরম্ভ করল গুলি। তখন আমাদের সবটি ব্যাক করছে। আমার গুলি লাগার পর আমার পিছনের ইন্ডিয়ান হাবিলদার বলল, রহমান, তোমার পায়ে রক্ত দেখা যায়। আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের পেছনে যে জমি ছিল সেখানে আইনা আমাকে ফেলাইয়া থুইল। দেখি, আমাদের বহু আর্মি পইড়া আছে। আমি ভাবলাম, এখন কী করি? তারপর ওখান থেকে ব্যাক করা শুরু করলাম। আমি ক্রলিং আরম্ভ করলাম। আমার কাছে তিনটা গ্রেনেড ছিল, সাতটা ম্যাগাজিন ছিল ও একটা স্টেনগান। তখন একটা পাগাড়ে আমি পাঁচটা ম্যাগাজিন ফেলে দিলাম। গ্রেনেড তিনটাও ফেলে দিলাম। খালি স্টেনটা, দুইটা

ম্যাগাজিন আমার হাতে রাখলাম আত্মরক্ষার জন্য। এর পরে স্টেনটাও ফালাইয়া দিলাম। আর পারি না। একটু মাংস ঝুলছে, মাংসটা আমি ছিঁড়া ফেলাই দিছি। তারপর তারা আমারে নিয়া আসলো। আমি তখনো সেন্সলেস হই নাই। যখন মহেন্দ্রগঞ্জে উঠছি, তখন আমার এক ভাই, খোকা, সে দেখছে আমাকে। আমার ফ্যামিলির মধ্যে সেই দেখছে আমারে। আর কেউ দেখে নাই। আমি ভাইকে বললাম, ভাই, বাড়িতে কাউকে বলবেন না। আপনি আমার সঙ্গে গাড়িতে ওঠেন। সে সান্ত্বনা দিল যে, আমি উঠতেছি। কিন্তু সত্যিকারে তো সে উঠতে পারে না। তখন আমি বুঝতে পারি নাই যে সে উঠবে না, সে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তুরা গেছি, তুরা থেকে তো আমাকে হেলিকপ্টারে পাঠাই দিল। ক্যাপ্টেন মান্নান বলল, তোমার কোনো চিন্তা নাই, আমরা আছি। আমি বলছি, বাবা-মা যেন কেউ জানতে না পারে, ভাইবোন কেউ যেন জানতে না পারে যে আমি গুলি খাইছি। তবু তো কথা থাকে না। বাবা জানতে পারছেন। ছবি পাডাইছি পুনা হাসপাতাল থেকে। বিশ্বাস করে নাই। চিঠি দিছি, তবু বিশ্বাস করে নাই। বাবা বলছে যে এটা আমার ছেলের ছবি না, এটা আগের ছবি দিয়া পাডাই দিছে। শুনলাম, বাবা অনেক কান্দাকাটি করছে। ভাইবোন সবাই কাঁদছে।

আপনি '৭২ সালে দেশে ফিরে এলাকার অবস্থা কেমন দেখলেন?

- তখন আইস্যা বেশির ভাগ লাল মাটিই দেখছি। বাড়িঘরের খুব খারাপ অবস্থা ছিল। খুব খারাপই দেখছি। '৭২ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ঘর তো আর তুলতে পারি নাই। আমাদের পুরান বাড়ি ছিল। এখন পর্যন্ত আমি আর ঘর দিতে পারি নাই। অনেকেই হয়তো সমর্থ হইছে, দিছে। অনেকে দিতে পারে নাই।

যুদ্ধের শেষে আপনি কী করলেন?

- যুদ্ধের শেষে বাড়িতে বসেই থাকলাম। তারপর হসপিটালে থাকলাম। বেশির ভাগ আমার লাইফে হসপিটালেই কাটছে। ঢাকার সোহরাওয়ার্দীতে ছিলাম, মেডিকেলে ছিলাম। এর পরে '৭৭-এ আমাদের চাকরি হলো। সি আর দত্ত আসলেন। মেজর নুরুন্নবী বললেন, তোমাদের কল্যাণ ট্রাস্টে চাকরি করতে হবে, প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করতে হবে। তারপর বুকিং মাস্টার হিসেবে চাকরির অ্যাপয়নমেন্ট দিল। তার পরে আবার চাকরি চলে গেল। আবার চাকরি হলো। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে চাকরি যায়, আর অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে চাকরি যায় না।

আরেকটি কথা, কামালপুর এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে প্রধান ছিলেন, উনার নাম কী?

- উনার নাম মেজর আইয়ুব। উনি বলছিলেন যে, কামালপুরে বৃক্ষের পাতা চাই না, চাই লাল মাটি এবং কর্নেল তাহেরের মাথা। যে এনে দিতে পারবে, তাকে তিন লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই মেজর আইয়ুব কামালপুর থেকে যাইতে পারে নাই। বোধ হয় মাস খানেক পরে তাকে মারা হইছে।

এটা কোন মাসের দিকে?

- এটা অক্টোবরের দিকে হবে। মনে হয় সেপ্টেম্বরের লাস্ট অথবা অক্টোবরের দিকে হবে। অক্টোবরের দিকে সেই মেজর আইয়ুব মারা যায়। বকশীগঞ্জ থেকে খাদ্যের গাড়ি নিয়ে আসছিলেন তিনি। আগে-পিছে গরুর গাড়ি দিয়ে মাঝখানে তার গাড়ি ছিল। আমরা সেদিন ছিলাম মাদ্দাতে। সেদিনই তাকে মারা হয়।

কীভাবে মারলেন তাকে?

- তাকে আরসিএলের গুলিতে মারা হয়। আগের গাড়িগুলোতে টাচ করি নাই, মাইন ফিট করে আসছি। যখন তার গাড়িটি আসছে, তখন তার গাড়িটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা আগেই রেকি করে আসছিলাম।

উনার সাথে আর কেউ মারা গেছে?

- অনেক আর্মি মারা গেছে সেদিন। কামালপুরে যে আর্মি আসছে, তারা আর ব্যাক করতে পারে নাই। আসতে দিছি আমরা। যেতে দিইনি কাউকে। লোকাল মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বেশি ছিল। এই জন্য আমাদের অনেক সহজ হইছে কাজ করতে। আমরা সব রাস্তাঘাট চিনতাম, আমাদের কাজ করা সুবিধে হইছে। আমরা যেহেতু ধানুয়া ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম।

এই এলাকায় স্কুল-কলেজ যেগুলো ছিল, সেগুলোর কী অবস্থা করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী?

- কামালপুর হাইস্কুলে তো তাদের ক্যাম্প ছিল। তারা খুব মজবুত বাংকার করছিল ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ালে এবং স্কুলের ওয়ালে। কামালপুর প্রাইমারি স্কুল এভাবেই আছে, কোনো ক্ষতি হয় নাই। এখন নতুন বিল্ডিংটিল্ডিং হইছে। মর্টার কামালপুরে যা পড়ছে, তা কল্পনার বাইরে, ভাবা যায় না আর কি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মহম্মদ হাফিজুল ইসলাম

পিতা : মো. জালালউদ্দিন সরকার। গ্রাম : ধানুয়া সরকারবাড়ি, ডাক : ধানুয়া কামালপুর, ইউনিয়ন : ধানুয়া, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণী। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৭। ১৯৭১ সালে পেশা : ছাত্র। বর্তমান পেশা : চাকরি।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ আপনি শুনেছিলেন কি?

● জি।

কীভাবে শুনলেন?

● আমি সেই সময় মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম।

ঢাকাতে ছিলেন?

● জি।

'৭১ সালে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● আমি আক্রান্ত হই নাই।

আপনি তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

● জি।

কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● অংশগ্রহণ করলাম দেশকে স্বাধীন করার জন্য।

আপনি যুদ্ধের জন্য কি বাংলাদেশ ছেড়ে বা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে গিয়েছিলেন?

● জি।

কয় তারিখে গেলেন এখান থেকে?

● তারিখটা আমার মনে নাই।

কোন মাসের দিকে?

● মনে পড়ছে, ৭ এপ্রিল, হ্যাঁ, ৭ এপ্রিল হবে আরকি।

আপনার সাথে কতজন গিয়েছিলেন?

● আমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল, সংখ্যা মনে নাই।

আপনি সেখানে গিয়ে কি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন?

● আমরা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে ট্রেনিং করেছি। আমাদের হাতিয়ার হিসেবে কোনো ট্রেনিং হয় নাই, ছোটখাটো হাতিয়ার আমাদেরকে দেওয়া হইছে আত্মরক্ষার জন্য।

ইনটেলিজেন্সে আপনাদের দায়িত্ব কী ছিল?

● আমাদের দায়িত্ব ছিল কোথায় অপারেশন চালানো যায়, কোথায় অ্যামবুশ করা যায়, কোথায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আছে, কোথায় আলবদর, আলশামস বাহিনী আছে—এসব খোঁজ নেওয়া। আবার আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে, তারা সহজে কীভাবে শত্রুর সঙ্গে লড়তে পারে, কোথায় তাদেরকে পাঠাইতে হবে—এ সমস্ত খবরবার্তা নিয়া আমরা কেন্দ্রে পাঠাইতাম।

আপনার কমান্ডার কে ছিলেন?

● আমার কমান্ডার ছিলেন মনিরুজ্জামান। তিনি পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর ফ্লাইট সার্জেন্ট ছিলেন। উনার বাড়ি জামালপুরে ছিল।

আপনি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো কি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন?

● জি, আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং সেটা যুদ্ধক্ষেত্রেই আরকি।

কোন এলাকাতে সেটা?

● সেটা সূর্যনগরে। বকশীগঞ্জ এবং কামালপুরের মাঝখানে। সেটা আমি পরিচালনা করছি, মানে গাইড করে নিছি। ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর লোকজন ছিল। আমি তাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেছি।

তার পরে কী হলো সেখানে?

● সেখানে তারা প্রস্তুতি নিতে থাকল। এদিকে কামালপুরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তখন হিন্দুস্তানি ফৌজ নিয়া আমি ওইখানে উপস্থিত হই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন বকশীগঞ্জ থেইকা কামালপুরের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাদের সঙ্গেও অনেক ফাইট হয়। একপর্যায়ে তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু কামালপুরে যুদ্ধ চলতেই থাকে।

এটা কয় তারিখের দিকে বা কোন মাসের ঘটনা?

● এটা জুলাই মাসের দিকে হবে।

সেই আক্রমণে কি আপনাদের কোনো ক্ষতি হয়েছিল?

● আমাদের ক্ষতি হয় নাই, বরং আমরাই তাদেরকে ক্ষতি করেছি।

তারা কেউ আহত বা নিহত হয়েছিল?
● হ্যাঁ, বহু পাকিস্তানি ফৌজ আহত এবং নিহত হয়েছিল।
কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল আপনাদের সাথে?
● ইন্ডিয়ান সৈনিকই ছিল অধিকাংশ এবং মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম আমরা দুইজন গাইড হিসাবে।
আপনারা ওখান থেকে কি ফিরে আসলেন?
● ফিরে আসলাম। ফিরে আসতে আমাদের খুব কষ্ট হইছে। কারণ, যুদ্ধ ফিল্ডে যার যার মতো পথ চলতে থাকছে, কিন্তু আমরা তো মাঝখানে। আলবদর, আলশামসের পাল্লায় পইড়া খুব বিভ্রান্ত হইছিলাম। পরে একত্র হই আমরা রাইতের অন্ধকারে। তারপর সেখান থেইকা আইসা পড়ি।
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ধানুয়া গ্রামে এসে কী করল?
● সম্পূর্ণ গ্রাম জ্বালায় দিছে তারা।
কেন জ্বালিয়ে দিল?
● এখানে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বেশি ছিল, প্রত্যেক ঘরে মুক্তিযোদ্ধা তৈয়ার হইছে—এটা একটা কারণ, আরেকটা গ্রামে বাংকার করা ছিল অনেকে। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে থাইকা পাকিস্তানি ফৌজদের সঙ্গে লড়াই করত। এসব কারণে বোধ হয় সারা গ্রাম জ্বালায় দিছে।
কোন মাসের দিকে গ্রাম পুড়িয়ে দিল?
● জুলাই মাসের দিকে হবে।
এই এলাকায় কি তারা মা-বোনদের ওপর নির্যাতন করেছে?
● না, এই সুযোগ তারা পায় নাই। কারণ, আমরা গ্রামসহ আগেই ইন্ডিয়া চইলা গেছিলাম।
গ্রাম জ্বালানোর সময় কি কেউ মারা গেছেন?
● জি না।
আপনার পরিবারে কেউ কি শহীদ হয়েছেন?
● না, আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই।
ধানুয়া কামালপুর এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হলো?
● এইটা ঢাকাতে যখন পাকিস্তানি সেনারা গণহত্যা শুরু করে, তার পরে-পরেই তৎপরতা শুরু হয়। এটা প্রথম দফায়। তারপর তো ভারতে চইলা যায় এবং তারপর নতুনভাবে তৎপরতা শুরু হয়।
ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের দায়িত্ব পালনকালে আপনি কি কখনো স্থানীয় আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি বা রাজাকারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন?
● জি, একবার বাট্টাজোড়ের সম্মুখে মানে বকশীগঞ্জ এবং কামালপুরের মাঝামাঝি একবার এদের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তারা ফাঁকা আওয়াজ-টাওয়াজ করার পরে উনারা যখন সইরা গেছে, আমরা তখন দৌড়াইয়া পালাইয়া গেছি সেখান থেকে।
আপনি যেহেতু গোয়েন্দা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেহেতু এ কাজে কোনো সংকেত নিশ্চয়ই ব্যবহার করতেন—এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?
● সংকেত মানে ছদ্মবেশ ধরতাম। দিনমজুরের বেশে, কখনো আত্মগোপনে থাইকা অথবা কোনো সময় অফিসার সাইজে বা ভালো পোশাক পইরে খবর সংগ্রহ করছি।
যে যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন নিহত হন, সেই যুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?
● তখন আমি ক্যাম্পেই ছিলাম। আমি এলাকায় যাই নাই।
নয় মাস তো যুদ্ধ হলো, যুদ্ধে আপনার গ্রামের কী অবস্থা হয়েছিল?
● গ্রামের তো সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সব পুইড়া গেছে, কিছুই ছিল না। পরে দেশ স্বাধীন হইলে আস্তে আস্তে কুঁড়েঘরটর তুইলে সবাই বসবাস করার জন্য একটা প্রস্তুতি নিল।
আপনি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে ছিলেন। আপনার সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল কি?
● সাধারণ অস্ত্র ছিল। স্টেনগান, গ্রেনেড—এগুলা আমরা আত্মরক্ষার জন্য সাথে রাখতাম।
যুদ্ধের শেষে এগুলো কী করলেন?
● জমা দিয়েছি।
কোথায় জমা দিলেন?
● এটা জামালপুরে।
যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তো আপনারা গ্রামে ফিরলেন, গ্রামে ফিরে কী করলেন তখন?
● আস্তে আস্তে গ্রামে নিজের বাড়িঘর উঠানোর চেষ্টা করলাম। থাকার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলাম।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

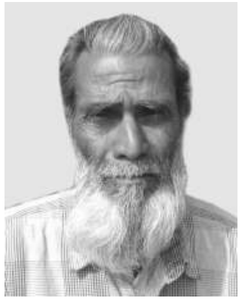

মো. গোলাপ হোসেন

পিতা : উজির আলী। গ্রাম : ধানুয়া, ইউনিয়ন : ধানুয়া কামালপুর, ডাকঘর : ধানুয়া কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণী। ১৯৭১ সালে বয়স : ২৫। ১৯৭১ সালে পেশা : কৃষিকাজ। বর্তমান পেশা : কৃষিকাজ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা আক্রমণ চালায়—এই খবরটা আপনি কীভাবে পেলেন?

● আমরা রেডিওতে পাইছি, লোকমুখেও শুনছি।

তখন আপনার কী মনে হয়েছিল?

● তখন আমরা মনে করছি যে এরা সব ধ্বংস করব। এরা বোধ হয় আমাদেরকে ধ্বংসই করব চিরতরে। বাঙালি জাতি থাকবে না বাংলাদেশের বুকে, থাকবে পাকিস্তানি আর বিদেশিরা।

আপনি তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

● জি।

কেন অংশগ্রহণ করলেন?

● আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ভালোবাইসা যুদ্ধে গেছি।

আপনি ’৭১-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

● আক্রান্ত হইছিলাম, কিন্তু সেটা মারাত্মক না।

কীভাবে আক্রান্ত হলেন?

● আক্রান্ত হইছিলাম, যখন ফায়ারটা আইসা আমার পায়ে লাগছে, তখন আমি উন্ডেড হইছি। পরে ঠিক হয়ে গেছে আর কি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

● আমাদের এলাকায় পাকিস্তানিরা আসলো জ্যৈষ্ঠ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে আইসা কামালপুরে হাইড আউট করল।

ধানুয়াতে কখন আসলো?

● কামালপুর ক্যাম্প কইরা ধানুয়াতে আসলো। বিভিন্ন সময়ে টহলদারি করছে। তার পরে আরও কিছু ঘটনা আছে। একদিন আমাকে ইলেভেন সেক্টর থেকে বলা হলো যে, তোমাকে নঈম মিয়ার বাজারে যেতে হবে খবরাখবর আনার জন্য। আল্লাহর মর্জি, আমি নঈম মিয়ার বাজারে যাইয়া বাজার-টাজারের খবর নিয়া আসতাছি, হঠাৎ করি আমাদের গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে আইসা পাঞ্জাবিদের হাতে পইড়া গেলাম। পাঞ্জাবিরা তখন আমাকে উর্দুতে কথা বলে। আমি তো উর্দু জানি না। আমি বাংলায় বলি। তখন উনাদের সঙ্গে দেখলাম দু-একজন বাঙালিও আছে। ওরা বলল যে, কী বলতাছে, বুঝো? আমি বললাম যে, কিছু বুঝি না। তহন ওরা আমাকে বুঝাই দিল যে তোমার বাড়ি কোথায়? বললাম যে, এই গ্রামে। এই গ্রামে লোক আছে? কই যে, নাই। কোথায় আছে? চর এলাকায় আছে। যাওভাঙ্গা আছে। ভারতের কথা কই না। ভারতের কথা কইলে তো জীবনে মারব। ডিগ্রির চরে আছে, বিলের চরে আছে। অনেক লোক আছে। আমরা ওই হানেই আছি। তুমি ওই দিকে যাইতেছ কেন। এই দিকে আমার গ্রামটা। হয়তো আমরা না থাকি, কিন্তু আমার যে বাঁশের ঝাড় আছে, গাছগাছালি আছে, এই গুলা কোন পজিশনে আছে, সেইডা দেখতে যাইতেছি। এরপর আমারে রাইফেল ধরছে। আমাকে বলে যে, তুমি মুসলমান? আমি বলি, জি মুসলমান। ‘মুক্তি’ হয়েছ নাকি? বলি, না, মুক্তি হই নাই। মুক্তি হইয়াও কিন্তু তখন আমি অস্বীকার করছি। নাহলে তো বাঁচবার কোনো বুদ্ধি নাই। বলে, মুক্তি কাহা? বলি, মুক্তি আমি চিনি না। জীবন বাঁচানোর জন্য আমি কিরা কাটছি। কিরা কাটার পরে অনেক চেষ্টার পরে আমাকে চেক করল। দেইকাটেইকা অনেক কিছু বলা-কওয়াও করল। আমাকে হামকি-ধামকি দিল। এলএমজি দিয়া একটা বাড়ি মারল আমাকে পিডের মধ্যে। মারে কইল, ভাগ হারামজাদা, এখান থেকে। তখন নদীর পাতায় পাতায় আবার আমি ধানুয়ায় পৌঁছি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন এই এলাকায় আসে, তখন আপনি আর কী করলেন?

● যখন এই দেশে পাঞ্জাবিরা আইসা গেল, বকশীগঞ্জ ফাস্টে আসলো। তখন আমরা আগাইয়া গেলাম কামালপুরের দিকে। কামালপুরে যাইয়া দেখি যে, টেলিফোন যোগাযোগ আছে, তখন টেলিফোন যোগাযোগটা আমি বিচ্ছিন্ন

করলাম। টেলিফোন লাইনটা নিশ্চিহ্ন করলাম আমি নিজে। তহন দেহি, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস খোলা। ইউনিয়ন পরিষদে যাইয়া দেখি সেক্রেটারি শমসের আলীরে। সে ইউনিয়ন পরিষদ অফিস খুলিয়ে বইসা আছে পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ উড়াইয়ে। তখন উনাকে আমরা থ্রেট করলাম। বলছি, তুমি ইউনিয়ন পরিষদে পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ উড়াইলা কার কথায়? উনি বলছে যে, আমার ইচ্ছা। এই কথা বলাতে আমরা একটু উগ্র মেজাজ দেখাইলাম। তখন ইপিআর ছিল। এই ইপিআরের নায়েক ছিল হাতেম আলী। উনার কাছে গিয়ে বললাম যে, ভাই, শমসের আলী পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ ইউনিয়ন পরিষদে উড়াইয়া সে সেখানে বইসা আছে। বলল যে, যাও, ওকে নিয়ে আসো। যখন আমরা তাকে আনতে যাই ইউনিয়ন পরিষদে, তখন ওখান থেকে সে পলাইয়া যায়। পলাইয়া যায় কামালপুর বাজারের পশ্চিমের একটা বাড়িতে। আমরা রাস্তা দিয়া মার্চ করছি। যাইয়া তাকে পালাম এক জাগায়। তখন তাকে নিয়া আসলাম ইউনিয়ন পরিষদে। আনে খাতাপত্রগুলো বার করে জমিউলসহ, হাতেম আলী নায়েকসহ উনাকে নিয়া গেলাম। নিয়া যাওয়ার পরে যখন কামালপুরের উত্তরে গেছি, তখন আমারে জমিউল বলল যে, ভাই, আপনি যানগা। দেখি পরে কী হয়। তো আমি বাড়িতে আসলাম। তখন আমার বাবা অসুস্থ, বাড়ির দিকে আসার কিছুক্ষণ পরে শুনি যে, শমসেরকে গুলি কইরা মারছে।

পরের দিন ফির পাঞ্জাবি আসলো। আইসা মিরধাপাড়া মোড় থেকে শেলিং আরম্ভ করল। শেলিং এসে পড়া আরম্ভ করল আমাদের গ্রাম ধানুয়া কামালপুর পাস হইয়া ধানুয়ার সম্মুখে। ২ ইঞ্চ মর্টার ৩ ইঞ্চ মর্টার, আরআর—এই সবের শেল আসতাছে। তখন আমাদের পুরা গ্রাম চইলা গেলাম ভারতের দিকে। ভারতের দিকে যাইয়া ওইহানে বউ-বেডি-পোলাপাইন রাইখা বাড়িতে আসলাম। বাড়িঘরে তো মানুষ নাই। একা থাকাডা অসম্ভব। তখন সেখানে দুই-একজনার সঙ্গে আলাপ হয়। এখানে আরার মধ্যে অথবা বাঁশের তলে বইসা থাকি। কোনোরকমে রাইত কাডাই। কয়েক দিন এইভাবে কাটানোর পরে আইসলো আমাদের মেজর তাহের সাব। তাহের সাব আইসা বলল যে, তোমরা এইহানে কী কাজ করতাছ। তখন উনাকে আমি দুঃখের সাথে বললাম যে, ভাই, কী আর বলব, আমাদের তো এই অবস্থা। আমরা কোথায় থাকি, কী করি? তো আমাগো বলল যে, তোমরা মুক্তিযোদ্ধা হও। মুক্তিসংগ্রাম করো। মুক্তিযুদ্ধের কাজ করো। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমরা করব। তো উনি বলল যে, তুমি আমার সঙ্গে চলে আসো। তখন উনার সঙ্গে আমি চলে গেলাম। আমার নামটা উনি এন্ট্রি করলেন। তারপর বলল যে, গোলাপ

হোসেন, তোমাকে কাজে যাইতে হবে। কলাম, কোথায় যাতে হবে? ক'ল তোমাকে মাইন মাটির নিচে পুঁততে হবে। রাস্তা থেকে সূর্যনগরের সম্মুখে। ব্যস, আমি মাইন নিয়ে তখন তাদের কথায় চইলা গেলাম। যাইয়া দেখি কাজী নামে একটা লোককে। ও আর আমি মিলা মাইন পুঁতা আরম্ভ করছি। সূর্যনগরের সামনে একটা ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজের উত্তর পার্শ্বে। যখন ওইহানে মাইন বসান হইয়া গেছে, মানে আমাদের দুইটা মাইন ফিট করছি, আরেকটা ফিট করব, এই অবস্থায় পাঞ্জাবি সৈন্যরা সার্চলাইট মারা আরম্ভ করল নয়াপাড়া মোড়ের থেইকা। যখন সার্চলাইট মারে তখন তো আমাদের সবকিছু দেখে। তখন আমরা ওইহান থেকে পলাইলাম। পলাইয়া আমি মার্চ করলাম সূর্যনগরের দিকে। জাগায় আইসা দেখি, কাজী নাই। শুনলাম যে সে ওখান থেকে আইসা বলছে যে গোলাপ হোসেন বোধ হয় ধরা পড়ছে। মহেন্দ্রগঞ্জে যত বিএসএফ অফিসার ছিল, ওরা আমার জন্য খুব দুঃখ করছে। আমাদের যত অফিসার আছিল, তারাও দঃখ করছে। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন মাহফুজ, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব, মেজর তাহের সাহেব, তার পরে ক্যাপ্টেন মান্নান, ক্যাপ্টেন আজিজ সাহেব—এঁরা আমার জন্য খুব দুঃখ করছেন। কিছুক্ষণ পর বেলা একটার দিকে আমি আইসা পৌঁছলাম। তখন ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ভাই, এই রকম কাজে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধ আমাদের করতেই হবে। তুমি দুঃখ করিয়ো না। তোমার ফ্যামিলি আমরা দেখব। তুমি তোমার কাজ চালাইয়া যাও। সেইখান থেকে রেশনটেশন কিছু দেয়। এইডা খাইয়া আমার বাল-বাচ্চা বউ-বেডি এখানে বাঁচে।

এরই মধ্যে বাবলুকে ধরে নিয়ে আসলো কামালপুরে। নিয়ে আসার পরে বাবলু ফিরে চলে গেল ভায়াডাঙ্গা ফাইট করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। ভায়াডাঙ্গা ফাইট করতে যাইয়ে পাঞ্জাবিদের কাছে উনি সারেন্ডার করে এবং বদর বাহিনীতে যোগ দেয়। বদর বাহিনীতে নাম লেখাইয়া ওখান থেকে কেমনে কেমনে জানি না সে আসলো কামালপুরে। কামালপুরে আসার পরে আমাদের ধানুয়ায় যে হাইড আউট ছিল, এইডা কেমনে কেমনে যেন উনি জানতে পারে। একদিন সকালে আইসা পুরা গ্রাম সে পোড়াইয়া দিল। পোড়াইয়া দেওয়ার পরে আমরা যে ভারতে যাচ্ছি, আসছি—এইডাও উনি জানে। মুক্তিফৌজে সে যখন ছিল, তখন তো দেখছে কোথায় কোথায় কে আছে। আমাদের বাড়ির কাছে যে বন্ধুবান্ধব ছিল মুসলমান, তাদের বাড়িতে আমরা স্থান নিছিলাম। দুঃখের বিষয়, আমার বাবা সেই টাইমে কিন্তু ইন্তেকাল করেন। আমি একটা চৌকিদার মানুষ। আমার বাবাও কিন্তু চৌকিদারি করত।

আমরা তাকে দাফন-কাফন কইরা চলে গেলাম ভারতে। ভারতের বুকে যাইয়া থাকি। তখন ক্যাপ্টেন মাহফুজ একদিন খবর পাইয়া আসলো। আইসা আমাকে ডাইকা বলল, গোলাপ হোসেন, তুমি দুঃখ নিয়ো না। আমারও যে বাবা মারা গেছে, আমার মা মারা গেছে। অনেকেরই ভাই মারা গেছে, অনেকেরই চাচা মারা গেছে। এতে তুমি দুঃখ নিয়ো না। তোমাকে কাজ করতে হবে। তখন বলি, ঠিক আছে স্যার, আমি করব। উনার সঙ্গে চইলা আসলাম। উনি আমাকে বুঝাইল যে, আমি লেফটেন্যান্ট মাহফুজ যদি এই দেশ স্বাধীন করতে পারি বা এই দেশে থাকতে পারি, তাহলে তোমাদের ধানুয়াতে আমি ইতিহাস সৃষ্টি করব। এই কথা কইয়া একদিন হঠাৎ করে মাহফুজ সাব গেল রেকি করতে। সেই জায়গার নাম হলো হাতিবাগার। হাতিবাগারে একটি নদী আছে। নদীটার নাম হইল হোগাই। হোগাই নদীর পশ্চিম তীরে উনি দাঁড়াইয়ে রেকি করতাছে। নয়াবীর নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে কিন্তু পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প। সেখানে পাঞ্জাবিরা কোন অবস্থায় আছিল জানি না। সেখান থেকে নদীর নিচে থেকে একেবারে ফায়ার এসে আমার অফিসারের ওপর পড়ল এবং তিনি মারা গেলেন।

এর কয়েক দিন পর তিন দিন কি চার দিন পর কামালপুরে অ্যাটাক করা হলো। আমাদের শেলিং পার্টি ছিল মহেন্দ্রগঞ্জে, ভারতে। আমাদের ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাব বেতারযন্ত্রে বলছিলেন যে শেলিং হয় বন্ধ করো, নয়তো ৩০০ গজ দূরে ফেলো। আমরা তখন পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প আক্রমণ করে ক্যাম্পে প্রায় উঠে গেছি। একটা বাংকারের ওপরে তিনি উঠে গেছেন। আল্লাহ মাবুদে জানে, সেই টাইমে হঠাৎ করে একটা শেল এসে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাবের পিঠে পড়ে গেল এবং তিনি ইন্তেকাল করলেন।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

● আমি তখন ছিলাম কামালপুরের উত্তর পার্শ্বে একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তার ধারে একটা পাগাড় ছিল, আমি সেই পাগাড়ের মধ্যে চোখ লাগাইয়া চুপ করে বইসা ছিলাম। খালি আমি না, আরও বহু ছেলে আছিল। এই শেলিংয়ে না হলেও ৩০-৪০ জন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছেলে সেই দিন মারা যায়। তাদের লাশ আমরা বংশীপাড়া আনি। ৩১টা লাশ আরও দুইজন লোক সাথে নিয়া বংশীপাড়া পৌঁছাই। সেইখান থেইকা আমি আইসা দেখি যে আরেকটা লোক উনডেড হয়ে পড়ে আছে। একটা নায়েক, আর্মির। উনাকে আমি ঘাড়ে উঠাইলাম। উঠাইয়া আমি বাড়িতে নিয়ে আসলাম। বাড়িতে তো মানুষ নাই, বাড়ি আছে। সেখানে নিয়া তাকে কিছু সুস্থ করার পরে সে কয় যে ভাই আমি আমার হাতিয়ারডা ছাইড়া আসছি, আমার জীবন যাক, কিন্তু

হাতিয়ারডা ছাড়তে পারি না। হাতিয়ারডা আনতে হবে। সেটা চায়না একটা এলএমজি ছিল। তখন আমি ফের রওনা হলাম এলএমজি আনতে। এলএমজি আনতে যাইয়া দেখি যে পাঞ্জাবিদের গুলি আসতেছে। চায়না গুলি আসতেছে। আমি কী করি। অনেক কষ্টে ক্রলিং করে যাইয়া কামালপুরের পশ্চিম-উত্তর পাড়াতে হাইতে পট্টি নামে একটা জায়গা আছে—সেখানে একটা গাছের নিচে এলএমজিডা বসানো ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করে এলএমজিডা সেখান থেকে নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পরে তাকে আমি এলএমজিসহ ভারতে পৌঁছাই।

তিন দিন পরে আবার কামালপুরে আক্রমণ অইল। তখন আমি তো ওই কাজেই লিপ্ত। ফায়ার আসতেছে। অনর্গল ফায়ার হইতাছে। কামালপুর মসজিদের উত্তর পার্শ্বে আমি একটা পাগাড়ের মধ্যে পজিশনে আছি। তখন মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা আমগাছ ছিল, সেই আমগাছের নিচে হঠাৎ একটা লোক চিৎকার মাইরে উঠল। চিৎকার মারল! ব্যাপার কী! তখন আমি পিছন দিয়ে ক্রলিং করে যাইয়া দেখি যে এক সুবেদার, আর্মির, উনডেড হইছে মর্টারের শেল লাইগা। গুরুতর আহত। তার জীবন থাকব, না থাকব না, তার নিশ্চয়তা নাই। অনেক চেষ্টা করে তাকে নিয়ে আসলাম। পরে তাকে নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জে পৌঁছালাম। যখন মহেন্দ্রগঞ্জ থানার কাছে পৌঁছাই, তখন উনি আমাকে একটা চিঠি দিলেন। শরীর ঠিকই আহত। কিন্তুক জ্ঞান ছিল। একটা চিঠি লিখে দিয়ে বলল, তুমি ডাকবাংলাতে যাইয়া দেখো একটা লোক আছে, সুন্দর করে, চিঠিটা তার কাছে পৌঁছাও। আমি ডাকবাংলাতে গেলাম। সেটা থানার উত্তর সাইডে। ডাকবাংলাতে যাইয়া আমি চিঠিটা পৌঁছালাম। উনি বলল, কোথায়? আমি নিয়ে আলাম। উনার নাম ছিল সুবেদার আবদুল হাই। আবদুল হাই সাবের গলা ধরে সে কান্নাকাটি আরম্ভ করল। তিনি আর বাঁচব না। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা কিছু করলাম না। উনি চইলা গেল।

পরে সে লক্ষ্ণৌ-টখনৌসহ অনেক জায়গা ঘুরেফিরে ভালো হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশে আসলো। তখন আমাদের বঙ্গবন্ধু জনাব মুজিবুর রহমান সাব পাকিস্তান থেইকা বাংলাদেশে আসছেন। ওই সুবেদার বা নায়েক স্বাধীনতার পর ৭৩তম ব্রিগেডে যোগ দিছে। এই ব্রিগেড তখন টাঙ্গাইলে। সে আমার খোঁজে কামালপুরেও আসছে। আইসা অনেক খোঁজাখুঁজি করছে। কেউ সঠিক ঠিকানা দিতে পারে নাই। উনি আবার নিজ ইচ্ছায় মোটরসাইকেলে টাঙ্গাইল থেইকা চইলে আসছে। দুইজন লোক বলছে যে লোকটা বোধ হয় গোলাপ হোসেন, বলে, হ্যাঁ। তখন তার নাম স্মরণ হইয়া গেছে। তখন তার অ্যাড্রেস আর কিছু

টাকা, ২০০-৩০০ টাকা, খরচের জন্য নয়াব আলী নামে এক সুবেদার ছিল, তার কাছে দিয়ে গেল এবং বলে গেল যে ছেলেটাকে তুমি অতিসত্বর টাঙ্গাইলে ৭৩তম বিগ্রেডে পৌঁছাবে। তার চিঠি পাইয়া চলে গেলাম টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইলে যাওয়ার পরে আর্মির অনেক ফৌজ আমাকে যাতে দেয় না। তখন আমি ঠিকানাটা বার করে যখন দিলাম, তখন একটা মেজর আছিল, উনি যাতে অনুমতি দিল। যাওয়ার পর সুবেদার সাব বাইরে আসলো। আমারে দেইখা সে আমার গলা ধইরা কান্না আরম্ভ করল। বহু লোক জমা হয়ে গেল। তার পরে সে তার বাঁচার হিস্টোরিটা সবাইকে বলল। সে বলল, এই ছেলের জন্যই আমি বাঁইচা আছি, নইলে থাকতাম না। আরও বলছে, এ আমাকে যে উপকার করছে, আমার নিজের মা-বাবাও এতটুকু উপকার করতে পারে নাই। তখন বলল যে, দেখো গোলাপ হোসেন ভাই, তোমাদের জন্য তো কিছু করতে পারলাম না, পরে দেখি, তোমাদের জন্য যদি কিছু করতে পারি। দুই বৎসর চইলা গেল। দুই বৎসর-আড়াই বৎসর চইলা গেল। আমাদের জন্য কিছু করতে পারল না। কিছুডা সাহায্য রেডক্রস থেকে করছে। আমাদেরকে এক বান টিন দিল আর কিছু টাকা দিল। এই দিয়ে আমরা কাল কাটাইলাম। ধানুয়ার পুরাটা গ্রামে কোনো কিছু নাই। এক কুসুমউদ্দীন চেয়ারম্যানের বাড়ি ছাড়া আমাদের ধানুয়ায় কোনো বাড়ি নাই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *মো. হাছানুর রহমান*
১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সলিমউদ্দীন

পিতা : তয়িজউদ্দীন, গ্রাম : কামালপুর, ইউনিয়ন : কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৫। ১৯৭১ সালে পেশা : বেকার। বর্তমান পেশা : কর্মজীবী।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকাতে আক্রমণ শুরু করেছিল। সে খবর আপনি কীভাবে শুনেছিলেন?

● রেডিওতে শুনছি। লোকের মুখেও শুনছি। যহনকা এরা (পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী) এই ঘটনাটা করল তখনকা আমাদের মনের মধ্যে একটা আঘাত লাইগ্যা গেল যে, এইভাবে আমাগোর বাঙালিগোর ওপর ওরা অন্যায়-অত্যাচার শুরু করল! তহনকা আমরা মনে করলাম যে, এইডা তো আর সহ্য করা যায় না। তো ঢাকার ওই ঘটনার কিছুদিন পরে পাঞ্জাবিরা আমাগোর এহানে আসলো। আইসা ক্যাম্প কইরা থাকা শুরু করল। তারা ক্যাম্প করল মনে হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের ৪ তারিখে। তার আগে কয়দিন আইসা ঘোরাফেরা কইরা গেল। প্রথম দিন তারা ওই আসলো ১০টা সাড়ে ১০টার সময়। প্রথম দিন মৃধাপাড়ার ওহান থেকা ওরা গুলি করা আরম্ভ করল। তারপর কয়টা মর্টার ছাড়ল। ওগুলা ছাড়ার পর সব মানুষ হই-হুল্লা করে তখনকা দৌড়ি পালাল। মানে ইন্ডিয়ার মুখে গেল গা। আমিও তহন ইন্ডিয়ায় গেলাম গা। যাইয়া আমরা বান রোডের এই পাশে পলাইয়ে থাকলাম। এই বেলা ৪টার সময় পাঞ্জাবিরা চইল্যা গেল গা। তহন আমরা আসলাম। দুদিন পরে পাঞ্জাবিরা আবার আসলো। তারপর কয়দিন প্রতিদিনই আইলো। পরে তারা এহানে একদম ক্যাম্প কইরা ফেলল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোথায় ক্যাম্প করল?

- কামালপুর আসিয়া ক্যাম্প করল। কইরা দুই-তিন দিন উনারা থাকল। তারপর আবার উনারা চইলা গেল গা। পরদিন আবার আরেক দল আইলো ওই সময় আমরা একবারে ইন্ডিয়ায় চইলা গেলাম গা। আমার মা-ভাইয়েরা গেল গা পাতিজোরা। আর আমি গিয়া মুক্তিফৌজে নাম দিলাম। দেওয়ার পর আমরা থাকলাম মহেন্দ্রগঞ্জ কয়দিন। পরে আমাগোরে নিয়া গেল গা ঢালুতে। কয়দিন পর ওই হানতে আমরা চইলা গেলাম গা পুরাকাশি [পুরাখাসিয়া]। রাতের তিনটার সময় ওহানে গেলাম। আমরা সকালে খাইয়া গেছি। সারা দিন গেছে, সারা রাইত গেছে, খাওয়া নাই। ওহানে একটা বাজার আছিল, পুরাকাশি বাজার। আমরা ওহানে কিছু তালাস করলাম। পালাম না। না পাওয়াতে একখানে দেহি যে, এক দোকানে কলা আছে। কলার তিনটা ছড়ি কিন্যা কয়জনে ভাগ কইরা নিয়া খাইয়ে ফেললাম। খাওয়ার পর চেঙ্গাপাড়া গেলাম গা। চেঙ্গাপাড়ার একটা জাগায়, মানে মাঠে ক্যাম্প করছে, ওহানে গেলাম। ওহানে সারা রাইত থাকলাম। সারা রাইত থাকার পর সকালে দেহি আমাদের শরীলডারে জোঁকে খাইয়া শেষ কইরা ফালাইছে। তহন আমাগো ওষুধ দিল। আমরা সেই ওষুধ খালাম। যাহোক, ওহানে চার-পাঁচ দিন থাকলাম। থাকার পর আমরারে নিয়ে গেল গা তুরায়। তুরায় যাইয়া আমরা ট্রেনিং করলাম ১৭ দিন। ১৭ দিন ট্রেনিং করার পর আমগোরে আরেক ট্রেনিংয়ে পাঠাইয়া দিল। জঙ্গলে ট্রেনিং করলাম তিন দিন। তিন দিন করার পর সব মিলা ২০ দিন হওয়ার পরে আমগোরে পাঠাইয়া দিল পুরাকাশি। পুরাকাশি আসার পর আমরা প্রথম ফাইট করি নকশী।

কোন মাসে আপনারা নকশীতে যুদ্ধ করলেন?

- এটা খেয়াল নাই, মূর্খ মানুষ তো আমরা!

আপনারা কতজন নকশীতে যুদ্ধ করতে যান?

- আমরা আসলাম তিনডা কোম্পানি মানে সাড়ে তিন শ লোক। তার মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আছিল ২৫ জন। আমাগোর কোম্পানি কমান্ডার আছিল রুহুল আমিন। ওই যুদ্ধের পর আমরা চইল্যা আসলাম আবার পুরাকাশি।

  পরের দিন আবার আমরা গেলাম ভায়াডাঙ্গা। ভায়াডাঙ্গা যাইয়ে আমরা আক্রমণ করলাম। ভায়াডাঙ্গাতে মনে করেন সন্ধ্যা থেইকা গুলিগোলা আরম্ভ হইল। রাইতের ১১টা পর্যন্ত চলল গুলি। আমরা রাইতে ওহানেই থাকলাম। পরদিন আবার সকাল পাঁচটা থেইকা গুলিগোলা আরম্ভ হইয়া গেল। শেষ হইল সকাল ১০টায়। ১০টার পরে আমরা ওহান থেইকা চইল্যা আসি। মানে পুরাকাশি আইছি। আইস্যা গোসলটোসল করা শুরু করলাম। গোসল কেউ করছে, কেউ করে নাই। এই অবস্থায় আমরারে বলছে কি, তোমরা প্রত্যেকের হাতিয়ার নেও। তোমাদের মহেন্দ্রগঞ্জে যাওয়া লাগবে। তো আমরা কী করব! কেউ খাইছে, কেউ খাই নাই, এই অবস্থায় আমরা মহেন্দ্রগঞ্জে গেলাম। মহেন্দ্রগঞ্জে আমরা রাইতের নয়টার সময় পৌছলাম। রাইতে আমরা ওহানেই থাকলাম।

  পরদিন ভোর পাঁচটার সময় ধানুয়া আসলাম। ওহানে আবার ফাইট আরম্ভ হলো। সেদিন রবিবার আছিল। ওহানে অসম্ভব যুদ্ধ হইল। ওই সময় ভারতের সৈনিকদের সাথে আমাদের একটা গন্ডগোল হইল গা। তাতে তিন দিন যুদ্ধ স্থগিত থাইকল। পরে মীমাংসা হইয়া গেল। তহন আমরা ওহান থেইকা আবার পুরাকাশি গেলাম। দুই দিন পরে আবার আসলাম কামালপুর।

  কামালপুরে আসার পর এই বাট্টাজোরে আমরা গুলি করি পাঞ্জাবিগোর একটা গাড়ি ফেলাই দিলাম। একটা গোলায় পাঞ্জাবিগো গাড়ি সম্পূর্ণ উড়ি গেল গা। তারপর আমরা সোজাভাবে পিছনে মার্চ করলাম। ওই ছনকান্দা গেলাম। ছনকান্দা যাইয়ে ইন্ডিয়ান ফৌজের সাথে মিলা ওহানে পজিশনে গেলাম। ওহানে একটা খেজুরগাছ আছে। ওই খেজুরগাছের ওহানে পাঞ্জাবিরা গাড়ি খাড়া করছে। খাড়া কইরা এক পাঞ্জাবি গাড়ি থেইকা নামি ইয়া আলী বইলা ঝাঁপ মারছে। সে ইয়া আলী বইলা ঝাঁপ মারছে আর আমরাও গুলি করছি। ওহানে অনেক গোলাগুলি হইল। তারপর বকশীগঞ্জ থেইকা পাঞ্জাবিগো গোলা আসা শুরু করল। তহনকা আমরা পিছনে সইরা গেলাম। এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে আট মাস চইলা গেল গা।

  কামালপুরে ৯৩ জন ধরা পড়ছে। তার মধ্যে সাতজন আছিল মহিলা। বাকিরা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিগো সব ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ নিয়া যাওয়া হইল। ভারতে যাইয়া তো মুক্তিযোদ্ধারা পাঞ্জাবিগো মারবার চাইল। ভারতের ফৌজরা তাদের মারতে দিল না। ওগো ভারত সরকারে নিয়া গেছে গা। তো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা গেলাম গা জামালপুর। জামালপুর থেইকা পরে আমাগোরে নিয়া গেল ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ যাইয়ে আমরা এক মাসের মতন থাকলাম। এক মাস পরে আমাগোর হাতিয়ার জমা নিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মো. আবদুর রহমান

পিতা : ইউসুফ আলী সরকার। গ্রাম : ধানুয়া সরকার বাড়ি, ইউনিয়ন : ধানুয়া, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি। ১৯৭১ সালে বয়স : ২১। ১৯৭১ সালে পেশা : বেকার। বর্তমান পেশা : বেকার।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চের আক্রমণের খবর আপনি শুনেছিলেন কি বা এ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- হ্যাঁ, এ খবর আমি শুনেছি। তখন রেডিও এবং ঢাকা থেকে আগত লোকজনের মুখে এ খবর শুনেছিলাম। আমাদের এলাকার কিছু লোক ঢাকায় ছিল। তারা ওই ঘটনার পরই ঢাকা থেকে পালায়ে আসে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

- না।

আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

- জি, করেছিলাম।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে যখন আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলতে লাগল, তখন আমি একজন বাঙালি হিসাবে ভাবলাম, এর একটা উপযুক্ত প্রতিকার চাই এবং এহেন অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেই হবে। এই মনোভাব নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী কখন আক্রমণ করল?

- সঠিক তারিখ আমার মনে নাই। ২৫ মার্চের কিছুদিন পর তারা এই এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে তৎপরতা শুরু করে। প্রথমে তারা এলাকার বাড়িঘর পোড়াতে শুরু করে এবং আশপাশের গ্রামে ঢুকে কিছু সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। তারপর তারা পাকিস্তান-সমর্থক ব্যক্তিদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করে। আমাদের এলাকায়, বিশেষ করে ধানুয়া কামালপুর এলাকায় কোনো রাজাকার, আলবদর ছিল না।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- এই এলাকায় জুন-জুলাই মাসের দিকেই মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে নায়েব সুবেদার সিরাজ সাহেবের নেতৃত্বে তৎকালীন ইপিআর ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে কামালপুর ঘাঁটি প্রথম আক্রমণ করা হয়। আমি একজন গাইড হিসেবে ওই দলের সঙ্গে কামালপুর আসি। ভারতীয় সেনাবাহিনী ওই যুদ্ধে আর্টিলারি সাপোর্ট দেয়।

আপনি কোথায় ট্রেনিং নেন?

- আমার ট্রেনিং নিতে হয় নাই। আমি কিছুদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সৈনিক ছিলাম। সেনাবাহিনীর চাকরি ভালো না লাগায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে ছিলাম। কিছুদিন পর তো যুদ্ধ শুরু হলো। যার প্রেক্ষিতে আমার ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয় নাই। আমি বরং মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের ট্রেনিং করাইছি। আমাদের গ্রামের প্রায় ৩০ জন মুক্তিবাহিনীতে ছিল।

আমরা কামালপুরে প্রথম যুদ্ধ করি। রাত অনুমান ১১টার দিকে আমরা আক্রমণ করি। আমাদের অধিনায়ক ছিল নায়েব সুবেদার সিরাজ সাব, যে কথা আগে বলছি। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকায়। উনি ইপিআর বাহিনীর লোক ছিলেন। আমি একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গাইড হিসাবে আগে আগে যাই। আমাদেরকে ভারতের ক্যাপ্টেন নিয়োগী সাহেব নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা সকালবেলা নাশতা করব কামালপুর বাজারে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সেটা হয় নাই। আমাদের সঙ্গে তখন কোনো ভালো ওয়্যারলেস সেট ছিল না। যেটা দিয়েছিলেন, সেটা কোনো কাজ করে নাই।

আমাদেরকে ইন্ডিয়ান বাহিনী বলেছিল যে, আমরা বেশ কয়েকটা গোলা ছাড়ব। আর লাস্টে একটা স্মোক বোম ছাড়ব। তখন তোমরা অ্যাডভান্স করবা, মানে আক্রমণ করবা। আমাদের পার্টি সেভাবেই বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন একটা এসও পার্টি, একটা কাট অফ পার্টি, একটা অ্যাডভান্স পার্টি। কিন্তু ভাগ্যচক্রে দেখা গেল যে, আমরা নির্ধারিত স্থানে সময়মতো পৌঁছতে পারিনি। আর যদি আমরা পৌঁছতাম, তাহলে আমরা একটাও বেঁচে থাকতাম না। ভারত থেকে ছোড়া গোলাগুলা ঠিক আমাদেরই ডিফেন্সের ওপরে পড়ত। কিছু পড়েছেও, সেটা আমরা লক্ষ করেছি। যার প্রেক্ষিতে আমরা আর অগ্রসর হইনি। সেখান থেকে ব্যাক করেছি। পরে সকাল হয়ে যায়। সকাল হলে পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়। তারা আমাদের ওপর গুলি চালায়। যে কারণে আমরা আর এগোতে সক্ষম হইনি। তখন বাধ্য হয়ে আমরা পিছাইয়ে চইলা যাই। ভারতে ফিরে গিয়ে

আমরা রাশেদ মোশাররফ সাহেব এবং রেয়াজ-উল হক সাহেবকে ঘটনাটা জানাই। তখন তারা এ ব্যাপারটা নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করেন।

যাহোক, যুদ্ধের শেষ দিকে আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামালপুর ফাঁড়ি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে ঘিরে ফেলি। তার আগে কামালপুরে অনেকবার আক্রমণ করা হয়েছিল। একবার ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব-সমেত কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়েছিল। সেদিন আমাদের কমান্ডার ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেবই ছিলেন। সেদিনও আমাদের ওয়্যারলেস নষ্ট হয়ে যায়। ওয়্যারলেস কোনো কাজ করেনি। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব খুব ডেসপারেট টাইপের মানুষ ছিলেন। ওই অপারেশনের দুই দিন আগে রেকি করতে এসে উনি একাই এক পাঞ্জাবিকে উঠাই নিয়ে যান। পরদিন এসে পাঞ্জাবিদের এক বাংকারে ঢুকে একটা পাঞ্জাবি সৈন্যকে মেরে দু'টা হাতিয়ার নিয়া যান। তার এক দিন পরেই আমাদেরকে নিয়ে তিনি কামালপুরে আক্রমণ করেন। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে প্রায় পৌঁছে গেছিলাম। মুক্তিবাহিনী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সকলে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পর ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব আর্টিলারি ফায়ারের নির্দেশ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওয়্যারলেস ঠিকমতো কাজ না করায় আর্টিলারি তাঁর নির্দেশ শুনতে পায়নি। আর্টিলারি ফায়ার ঠিকমতো ছিল না। তখন তিনি ওয়্যারলেস সেট বাদ দিয়ে নিজে মাঠে দাঁড়িয়ে আমাদের কমান্ড করলেন। বললেন, অ্যাডভান্স। ঠিক তখনই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামালপুর গোডাউন বাংকার থেকে তার ওপর ব্রাশফায়ার চালিয়ে তাকে মেরে ফেলা হয়।

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের লাশ আপনারা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন কি?

- আমরা তাঁর লাশ উদ্ধার করতে পারি নাই। যখন আমাদের কমান্ডার শেষ হয়ে গেলেন, তখন আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়ার মতো আর কেউ ছিলেন না। ওই অবস্থায় আমরা পিছিয়ে গেলাম। আমাদের বহু মুক্তিযোদ্ধা সেদিন হতাহত হলো। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব শহীদ হলেন। আমরা আমাদের আহত লোকদের নিয়ে পিছু হটে আসলাম। সালাহউদ্দীন সাহেবের লাশ আমরা উদ্ধার করতে পারলাম না। তার লাশটা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আওতার মধ্যে ছিল।

ওই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন ছাড়া আর কতজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান?

- মুক্তিবাহিনীর কেউ নিহত হয় নাই। মারা গেছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক আর ভারতীয় সৈনিক। মুক্তিবাহিনীর প্রায় ১০-১৫ জন আহত হইছিলেন। ওই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে কতজন নিহত হয়েছে, সেটা আমি বলতে পারব না।

ওই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল?

- পরদিন আমরা সংবাদ পেলাম যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১০-১৫ জন হতাহত হয়েছে। ঠিক কতজন তাদের নিহত হয়েছে, সেটা খোঁজ নেওয়া সম্ভব ছিল না।

যাহোক, এরপরে আমাকে এখান থেকে পাঠায় মিরজুমলার মাজারে। ওখানে আমি ইপিআরদের সঙ্গে থাকি। সেখানে আমার কমান্ডার ছিলেন নায়েব সুবেদার মালেক। সুবেদার মালেকের নেতৃত্বে আমি পরে ঘুঘুমারী ও কোদালকাঠি যুদ্ধ করি।

ঘুঘুমারী কোন এলাকায়?

- রংপুর এলাকায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে দিয়ে আমি আবার কামালপুর আসি। যেদিন কামালপুর স্বাধীন হয়, সেদিন আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিলাম। ওই সময় ক্যাপ্টেন মান্নান সাহেব আমাদের দায়িত্বে ছিলেন। আরও কয়েকজন ছিলেন। সবার নাম আমার মনে নাই। সুবেদার মফিজের নাম আমার মনে আছে। ক্যাপ্টেন আজিজ নামে একজন ছিলেন বোধ হয়। কামালপুর যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিন ওখানে কোনো যুদ্ধ হয় নাই। তার কয়েক দিন আগে যুদ্ধ হয়। সর্বশেষ যুদ্ধের কয়েক দিন আগে ওখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা কোম্পানি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। ওই সময় আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপর একটা কোম্পানির সঙ্গে ছিলাম। পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আরও তিনটা কোম্পানিসহ আমরা, মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলি। ঘেরাও করার পরে তারা আর কোনো মুভমেন্ট করতে পারেনি। তাদের রসদ শেষ হয়ে যায়। ভারতের দুটি প্লেন কামালপুরে ব্যাপক গোলাগুলি করার পরের দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে সারেন্ডার করে।

আপনি কখন নিজ এলাকায় ফিরলেন?

- কামালপুর স্বাধীন হবার পরেই। তার পরে আমি ময়মনসিংহ ১১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে, মানে ময়মনসিংহ টাউন হলে আমি থাকি। সেখানে প্রায় এক মাস আমি নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে ছিলাম। এক মাস পর আবার বাড়ি চলে আসি।

তখন আপনার এলাকার কী অবস্থা ছিল?

- আমার বাড়িঘর কিছুই আমি পাই নাই। শুধু মাটি পাইছি। গাছপালা, ঘরদরজা কিছুই ছিল না।

সেগুলো কী হয়েছিল?

- পোড়াইয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পোড়াইয়ে দিছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার বাড়ির কোনো অস্তিত্ব রাখে নাই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মো. রফিকুল ইসলাম

পিতা : হাজি ইউনুস আলী। গ্রাম, ডাকঘর ও ইউনিয়ন : ধানুয়া, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৯। ১৯৭১ সালে পেশা : বেকার। বর্তমান পেশা : কৃষিজীবী।

১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ পাকিস্তানিদের আক্রমণের খবর আপনি শুনেছিলেন?

- হ্যাঁ, ওই সময়, মানে ২৬ মার্চ সকালে পাকিস্তান রেডিও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি যে ঘটনা কী! তারপর পরস্পর আমরা শুনতে পেলাম যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে অতর্কিতে বাঙালিদের ওপরে আক্রমণ করে বাঙালিদের তারা নির্বিচারে হত্যা করছে।

১৯৭১ সালে আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- না, আক্রান্ত হইনি।

আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

- জি, আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন?

- মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে এবং দেশের স্বার্থে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিছিলাম।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখন আক্রমণ করল?

- সম্ভবত মে মাসের ৯ তারিখে তারা স্থায়ীভাবে এই এলাকায় থাকা শুরু করল। তার আগেও তারা কয়েকবার আসছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করে কী করল?

- আমাদের ঘরবাড়ি একদম ধ্বংস কইরা দিছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোন জায়গা থেকে এসেছিল?

- তারা সম্ভবত আসছিল জামালপুর থেকে। সেখান থেকে তারা প্রথম বকশীগঞ্জ আসে। বকশীগঞ্জ থেকে তারা হঠাৎ করে শেলিং করে কামালপুরে। কামালপুরে শেলিং করলে এখানকার লোকজন সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ওই সময় আমরা পরস্পর জানতে পারলাম, তিন ট্রাক পাঞ্জাবি সৈন্য কামালপুর আসতাছে। তখন মানুষ যে যা পারছে, নিয়া ভারতে পালাতে শুরু করে। আমরাও পালিয়ে যাই। ভারতে গিয়া পরে জানা গেল যে পাঞ্জাবিরা কামালপুরে ক্যাম্প করতাছে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় কী করল?

- তারা আমাদের এলাকায় প্রথম যুবক ছেলেপেলেসহ মা-বোনদের খোঁজা আরম্ভ করল। পরে তারা দেখল যে গ্রামবাসী কেউ নাই। খালি বাড়িঘর পড়ে আছে। তখন তারা গ্রামের বাড়ি, ঘর-দরজা সমস্ত জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করে দিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারের কেউ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছিল কি?

- না, আমাদের পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই। তবে আমার বড় ভাই ওই সময় আহত হয়েছিলেন।

ধানুয়া এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- ধানুয়া এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় মে মাসেই। ধানুয়ার উত্তরে সীমান্তসংলগ্ন এলাহী বখশের বাড়ির কাছে তখন মুক্তিবাহিনীর একটা ডিফেন্স করা হয়। সেটা ১ নম্বর ডিফেন্স। মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর ডিফেন্স ছিল আমার বাড়ির পিছনে। এভাবে আরও কয়েকটা ডিফেন্স ছিল। ৩ নম্বর ডিফেন্স ছিল দিলু উকিলের বাড়ির সামনে। ৪ নম্বর ডিফেন্স সরকারপাড়া মসজিদের কাছে এবং ৫ নম্বর ডিফেন্স ছিল বান রোডের সাইডে আশরাফ উল্লাহর বাড়ির কাছে। ওখানেই ছিল মুক্তিবাহিনীর মেইন ক্যাম্প। সব ডিফেন্সই ছিল একদম সীমান্তের কাছে। কামালপুর বাজারের ওখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাম্প এবং ওপি ছিল। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কয়েকবার ওই সব ডিফেন্সে গিয়ে ডিউটি করেছি। একবার আমরা কিছু মুক্তিযোদ্ধা ওই সব ডিফেন্সে পজিশন নিলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী টু ইঞ্চ শেল মেরে আমাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তখন আমরা কিছু ফায়ার দেই। ফায়ার দেওয়ার পরে দেখা গেল, তারা কোনো পাল্টা ফায়ার দেয় না। আমাদের ওপর কোম্পানি কমান্ডারের নির্দেশ ছিল যে, তোমরা শত্রুকে না মারতে পারলেও নিজে যেন না মরো। সে জন্য আমরা ডিফেন্স ছেড়ে সামনে যাই নাই। পরে আমরা পিছাইয়া যাই মহেন্দ্রগঞ্জ। মহেন্দ্রগঞ্জে গিয়ে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আমরা খবর দেই যে, শত্রু আমাদের সম্মুখে। তোমরা ৪৫ ডিগ্রিতে শেলিং করো। তখন সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর শেলিং করে। আর আমরা পিছনে অবস্থান নিয়ে থাকি।

মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য আপনি কখন ভারতে গেলেন?

- এপ্রিলের শেষে। ওখানে যাওয়ার কিছুদিন পরই আমরা কয়েকজন মুক্তিবাহিনীতে রিক্রুট হই। আমাদের রিক্রুট করেন রিয়াজুল এবং ফজলু। উনারা আমাদের

মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি কইরা নিল। তারপর আমাদেরকে কয়েক দিন ওখানে ট্রেনিং দেয়। আমাদের ট্রেনিং দেন চট্টগ্রামের মফিজ সাহেব। ট্রেনিং শেষ হলে প্রথম অবস্থায় একদিন রাত বারোটা-একটার সময় আমাদের কয়েকজনকে এসএলআর এবং রাইফেল দিয়ে বাংলাদেশের ভিতর পাঠায়। আমরা তখন আমার বাড়ির উত্তর পাশে এসে গুলিগোলা করতে থাকি। আমার বাড়িও একদম সীমান্তসংলগ্ন। ওখানে আমরা ফায়ার করার সময় ভারত থেকে ওই এলাকায় দু'টা শেল মারে। তারা মনে করছে যে, পাঞ্জাবিরা হয়তো আক্রমণ করছে। ওই শেল পড়ার পর আমরা ভারতে ফিরে যাই। যাওয়ার পরে মফিজ সাহেব আমাদের বলল যে, তোমাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। এখন তোমরা বিএসএফ ক্যাম্পে যাও। তখন আমরা ওখানে যাই।

বিএসএফ ক্যাম্পের ওখানে একটা বড় মাঠ ছিল। সেখানে বেশ জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে ঝোপঝাড় সমস্ত আমরা পরিষ্কার করি। পরিষ্কার করার পরে আমাদের তাম্বু (তাঁবু) দেয়। সেই তাম্বু খাঁটিয়ে আমরা ওখানে থাকা শুরু করি। আমাদের নিয়ে একটা উইং করা হয়। কিছুদিন পর ওখানে বাংলাদেশ আর্মির কয়েকজন অফিসার আসেন। উনারা আমাদেরকে বলল যে, তোমাদের আবার ট্রেনিং নিতে হবে। তখন আমাদের আবার ছয়-সাত সপ্তাহের ট্রেনিং হয়। সেই ট্রেনিং শেষ হবার কয়েক দিন আগে একদিন মেজর তাহের, ক্যাপ্টেন মান্নান এবং ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব ওখানে আসেন। তো তাদের একজন আমাদের বলল যে, তোমাদের মধ্যে ধানুয়া গ্রামের কতজন এখানে আছ। তো আমরা বললাম যে, ধানুয়ার প্রায় ৪০-৪৫ জন ছেলে আমরা মুক্তিবাহিনীতে আছি। তার ভিতরে আমরা এখানে একত্রে ১১ থেকে ১২ জন আছি। এরপর তারা বলল যে, তোমাদের তুরায় হায়ার ট্রেনিংয়ে যেতে হবে। কিন্তু মেজর তাহের সাহেব বললেন যে, না এদের তুরায় যাওয়া লাগবে না। এখানে অন্যান্য এলাকার যে ছেলেপেলে আছে, তাদের নিয়ে তো কামালপুর ক্যাম্প আক্রমণ করা সম্ভব না। তাদের কামালপুর সম্পর্কে জানাশোনা নাই। তাদের নিয়ে আমরা কীভাবে কামালপুর আক্রমণ করব? এরপর উনি আমাদেরকে ডেকে বলল যে, তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকো। কিছু গাইড পার্টি হিসেবে থাকো। তোমরা যারা গাইড হবা, তারা এখানে যে নিয়মিত বাহিনী আছে, তাদের গাইড করবা। অন্যরা নিয়মিত বাহিনীকে সহযোগিতা করবা বা যুদ্ধে অংশ নিবা। তার পর থেকে ঘেগাপাড়ায় আমরা থাকি। আমাদের রেশনটেশন সবকিছুই ওহানেই আসে। নিয়মিত বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার যেভাবে বলে, সেভাবে আমরা কাজ করি। আমরা নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে এটাচড হবার কয়েক দিন পর একদিন আমাদের সঙ্গে নিয়া তারা কামালপুর আক্রমণ করল। করার পরে দেখা গেল পাঞ্জাবিরা আমাদের ওপর শেলিং করছে। তখন আমরা পিছনে চলে গেলাম। তার পর থেকে আমরা নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অংশ নিছি। যুদ্ধের কথা কয়েক ঘণ্টা বললেও শেষ হবে না। আমি পাঞ্জাবিদের সঙ্গে সামনাসামনিও যুদ্ধ করেছি।

কীভাবে করলেন?

- একদিন আমাদের ৪ নম্বর ডিফেন্সে আমরা অ্যামবুশ করে বইসা আছি। পান্না কোম্পানির পান্না এলএমজি নিয়ে ওখানে পজিশনে ছিল। আমরা তার গাইড পার্টি। হঠাৎ বিকাল তিনটার দিকে আমরা দেখতে পেলাম, পাঞ্জাবিরা বান রোডের দক্ষিণ সাইড দিয়া আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। তখন আমরা করলাম কি, ৪ নম্বর ডিফেন্স থেকে এলএমজি ফায়ার করলাম। কিন্তু কিছুতেই আমরা পাঞ্জাবিদের সাথে কুলাইতে পারলাম না। আমরা বাধ্য হলাম অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে নিজের জান রক্ষার্থে পিছনে চলে যেতে। আমরা চলে গেলাম বান রোডে।

  দুই দিন পরে আমরা আবার অগ্রসর হই ৪ নম্বর ডিফেন্স পর্যন্ত। অগ্রসর হওয়ার পরে আমরা দেখতে পাই, পাঞ্জাবিরা কামালপুরের ক্যাম্প থেকে গোপালপুর দিয়ে রামরামপুর নদীর ঘাট হয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য পজিশন নিচ্ছে। আমাদের একটা ওপি ছিল ৪ নম্বর ডিফেন্সের কাছে। সেখানে একটা বটগাছ ছিল। সেই বটগাছে চড়ে আমাদের একজন চারদিক লক্ষ রাখত। আমাদের কাছে একটা ওয়্যারলেস সেট ছিল। সেই ওয়্যারলেস সেট দিয়া প্রায় সাত কিলোমিটার এরিয়ার খবর আমরা নিতে পারতাম। হেলাল কোম্পানির শাহ জামালের কাছে একটা ওয়্যারলেস সেট ছিল। আর ধানুয়া গ্রুপ গাইড পার্টির দেলোয়ার উকিলের কাছে একটা সেট ছিল। একটা গাইড পার্টি আগেই আমাদেরকে বলেছিল যে, তোমরা সতর্ক হয়ে যাও। পাঞ্জাবিরা কামালপুর ক্যাম্প থেকে পশ্চিম দিক খাসির গ্রাম, গোপালপুর রামরামপুর নদীর ঘাট দিয়ে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তখন আমরা সতর্ক হয়ে যাই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের কাছে আসার পর আমরা গুলি শুরু করি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক এসেছে। মানে সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে বেশি। আমরা তুমুল গোলাগুলি করার পরও তারা এগিয়ে আসতে থাকে। মনে হলো, এদের জানের ভয় নাই। ওদের বেপরোয়া ভাব দেখে আমরা তখন নিজেদের জান রক্ষার্থে গ্রেনেড চার্জ করে পিছনে ব্যাক করি।

ওই যুদ্ধে আপনাদের পক্ষে কেউ আহত বা নিহত হয়েছিল কি?

- হ্যাঁ, আমাদের দুজন মারা গেছে। আমাদের দলে মাদারগঞ্জের দুজন ছেলে ছিল। তারা বান রোডের কাছে পজিশনে ছিল। ভারতের সীমান্ত এলাকায় খাসের গ্রামে ইদ্রিস আমিনের বাড়ির কাছে ডিফেন্স ছিল আমাদের। সেই ডিফেন্সে তারা পজিশনে ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে তারা নিহত হয়। পরে খবর পেয়ে আমরা ওখানে গিয়ে দেখি তারা দুজনই মারা গেছে। তখন আমরা তাদের লাশ নিয়ে

আসলাম। ধানুয়া গ্রামের পশ্চিমে আমরা তাদের কবর দেই। ওখানে একটা শেওড়াগাছ ছিল। সেখানেই তাদেরকে মাটি দেওয়া হয়। এই দুজনের নাম এখন আমার মনে নাই।

এই যুদ্ধের পরই একদিন মেজর তাহের সাহেব আমাদের ডাকলেন। সন্ধ্যার দিকে আমরা তাঁর কাছে গেলাম। উনি বললেন যে, তোমরা এক কাজ করো, গলাকাটি থেকে মৃধাপাড়া পর্যন্ত এলাকায় তোমরা আবার অ্যামবুশ করো। তাঁর নির্দেশে আমরা ভোর চারটা থেকে নসিউল্লাহ সর্দারের বাড়ির সামনে একটা কুসারের (আখ) খেত ছিল, সেখানে আমরা অ্যামবুশ করে বইসা থাকি। সকালে একসময় আমরা দেখতে পাই, বকশীগঞ্জ থেকে কয়েকজন পাঞ্জাবি আর রাজাকার তাদের রেশন এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে ওই দিক দিয়া আসতাছে। আমাদের সঙ্গে ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্ট। তারা বলল যে, তোমরা একটু এগিয়ে দেখো তো, তারা পাঞ্জাবি কি না। আমরা সামনে এগিয়ে দেখলাম যে, কয়েকজন পাঞ্জাবি আর কিছু রাজাকার। আমরা যাইয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সে কথা বললাম এবং আমরা তখনই তাদের গুলি করতে চাইলাম। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওরা আমাদেরকে বলল যে, কিছুক্ষণ সবুর করো। এখন গুলি করলে ওদের ক্ষতি করা যাবে না। ওরা রেঞ্জের ভিতরে আসুক। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে ভালোই সব অস্ত্রপাতি ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং রাজাকাররা রেঞ্জের ভিতরে আসার পরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং আমরা তাদেরকে আক্রমণ করি। সেখানে দীর্ঘক্ষণ লড়াই হয়। তারপর হঠাৎ করে পাঞ্জাবিদের দিক থেকে ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। আমরা পরে জানতে পারলাম যে, ক'টা পাঞ্জাবি আর রাজাকার নাকি মারা গেছে। তখন আমরা ওই দিকে এগিয়ে গেলাম।

তাদের কতজন মারা গিয়েছিল?

- সেদিন ওদের পক্ষে মারা গেছিল সাতজন। খবর পেয়ে আমি, কাশেম, দেলু একসঙ্গে ওদিকে এগিয়ে যাই। ভাটিপাড়ার পিছনে যাওয়ার পরে দেখি যে চারদিকে খালি রক্ত। রাস্তা-খেত রক্তে ভরা। যে পাঞ্জাবি এবং রাজাকারদের লাশ ওখানে পড়ে ছিল, তাদের পায়ে বুট ছিল। হাতে ঘড়ি ছিল। কিন্তু ওখানে তাদের অস্ত্রগুলো ছিল না। মনে হয়, বেঁচে যাওয়া পাঞ্জাবিরা তাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে পালিয়ে গেছে। পাঞ্জাবি এবং রাজাকারদের লাশগুলো আমরা পায়ে ধরে সীমান্তের ওপারে টাইনা নিয়ে আসি। পরে বিএসএফ তাদের লাশ মহেন্দ্রগঞ্জে নিয়া যায়।

এই যুদ্ধে আপনাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল কি?

- মুক্তিবাহিনীর কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার মারা যায়। উনার বাড়ি ছিল কুমিল্লায়। তার নাম আমার এখন খেয়াল নাই।

এরপর কী করলেন?

- এর কয়েক দিন পর একদিন ক্যাপ্টেন মান্নান সাহেব আমাদেরকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, আজকে তোমরা দুই কোম্পানি কামালপুর আক্রমণ করবা। ভোর চারটা থেকে আক্রমণ শুরু হবে। তখন আমরা রাত দু'টার দিকে খাসের গ্রাম, গলাকাটি, নয়াপাড়ায় পজিশন নেই। আমরা কয়েক দলে বিভক্ত ছিলাম। অ্যামবুশ পার্টি, কাট অফ পার্টি, শেলিং পার্টি সমস্ত নিয়ে আমরা প্রস্তুত। কামালপুর বাজারের ভিতরে ছিল বিরাট একটা বটগাছ। সেই বটগাছের ভিতরে একটা ছই দেওয়া ছিল। আমাদের কমান্ডার দুরবিন নিয়ে দেখলেন যে, পাঞ্জাবিরা ওই বটগাছটাতেই ওপি বসাইছে। বটগাছে একজন পাঞ্জাবি ওয়্যারলেস সেট নিয়ে বসে আছে।

আপনাদের কমান্ডার কে ছিলেন?

- আমাদের কমান্ডার ছিলেন দেলোয়ার উকিল।

তারপরে আপনারা কী করলেন?

- আমরা পরে কামালপুর আক্রমণ করি। শেলিং পার্টি ওই বটগাছ লক্ষ্য করে শেলিং করে। আমরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়ে দেখতে পাই যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কামালপুর ক্যাম্প এরিয়াটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রেখেছে। শুধু কাঁটাতারই না, বাঁশের আগা সরু করে কেটে সেগুলো তারা কাঁটাতারের বেড়ার পাশে মাটিতে পুঁতে রেখেছে। সেগুলো খুব ঘন করে পোঁতা। কাঁটাতারের সঙ্গে মাইন সেট করা। কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আমাদের যাওয়ার উপায় নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী চারদিক সুরক্ষিত করে তাদের বাংকারে বইসা আছে। সেদিন ওখানে তিন ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করার পর দেখা গেল যে, আমাদের তিনজন মারা গেছে।

যাহোক, সেদিন তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করে আমরা ওখান থেকে চলে আসি। কয়েক দিন পর ক্যাপ্টেন মান্নান সাহেব আমাদের ক্লোজ করে কাজল কোম্পানিতে যোগ দিতে বললেন। ওই কোম্পানিতে যেদিন আমরা যোগ দিলাম, সেদিনই মেজর তাহের [সম্ভবত মেজর তাহেরের পরিবর্তে মেজর মঈনুল হবে—সম্পাদক] সাহেব আমাদের বলল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামালপুর ক্যাম্প কী অবস্থায় আছে, তোমরা জানো নাকি? আমরা বললাম যে, হ্যাঁ, স্যার, আমরা জানি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংকার কাঁটাতার দিয়ে পুরাপুরি ঘেরাও করা আছে। মাঝখানে পাক্কি (পাকা) ইট দিয়া তাদের বাংকার করা আছে। তখন উনি ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনকে কল করলেন। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন তাঁর কাছে আসলে উনি তাঁকে বলল যে, আমি পুরো বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে কামালপুর ক্যাম্প আক্রমণ করব। যেভাবেই হোক, কামালপুর ক্যাম্প আমাদের দখল করতেই হবে। তুমি দ্রুত প্রস্তুতি নেও।

তারপর আবার বড় আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু হলো। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে হেভি অস্ত্রশস্ত্র ছিল। মেশিনগান, এলএমজি, টু ইঞ্চ মর্টার। একদিন ভোর চারটার

দিকে ওখানে আক্রমণ করা হয়। আক্রমণ করার পরে ভোর চারটা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত গুলি চলল। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সেদিন যুদ্ধের ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন। আমরা পরে শুনেছিলাম, যুদ্ধ চলা অবস্থায় উনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামালপুর ক্যাম্পের বাংকারে ঢোকার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ওই সময় অনর্গল শেলিং হচ্ছিল কামালপুর ক্যাম্পের ওপরে। শেলিং এক সেকেন্ডের জন্যও বন্ধ নাই। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন কামালপুরের পিছন দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংকারে ঢোকার জন্য চেষ্টা করলেন। তখন পাঞ্জাবিরা তাঁকে হঠাৎ গুলি করে। তো উনি ওখানেই মারা যান। কামালপুরের উত্তর সাইডে সেদিন আমরা কিছু মুক্তিফৌজ ছিলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে। আমরা ছিলাম সাপোর্টি পার্টি হিসেবে। আমি ছিলাম ওই দলে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে, আমাদের দলের মুক্তিবাহিনী এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রায় ৬৫ জন মারা গেছে। এই ৬৫ জনের কিছু আবার আমাদেরই শেলিংয়ে মানে ভারত থেকে আসা শেলিংয়ে মারা পড়েছে। সেদিন আমাদের দলে অনেক হতাহত হওয়ায় সব হতাশ হয়ে পড়ে। তারপর ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব মারা যাওয়ার খবর পেয়ে অনেকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় আমরা বিলের মধ্য দিয়া ব্যাক করে বিলডোবা ক্যাম্পে চলে যাই।

সেদিনের যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে কতজন নিহত হয়?

- এটা আমার সঠিক জানা নাই। আমার জানামতে, তিনজন নিশ্চিতভাবে নিহত হয়েছিল। এ তিনজনের মধ্যে সেন্ট্রি ছিল দুইজন। যাহোক, সালাহউদ্দীন সাহেব মারা যাওয়ার পর আমরা পিছাই। তখন পিছানো ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। বলা যায়, আমরা নিরাশ হয়েই ফিরে যাই। ফিরে গিয়ে আমরা ক্যাম্পে বিশ্রাম নিতে থাকি। রাত তিনটার দিক দিয়ে মেজর তাহের সাহেব, ক্যাপ্টেন মাহফুজ সাহেব আমাদেরকে কল করল। করে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করল। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের লাশ আমরা কেন নিতে পারিনি, সেটাও জানতে চাইল। যারা অ্যাডভান্স পার্টি ছিল, তারা কেন তার লাশ নিতে পারেনি সেটা বলল। তারা মেজর তাহের সাহেবকে বলল যে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীনের লাশ নেওয়ার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু উদ্ধার করতে পারি নাই। কারণ, তাঁর লাশ পাঞ্জাবিদের বাংকারের কাছেই পড়ে ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আমাদের দুদিনের ছুটি দেওয়া হয়। দুদিন পর মেজর তাহের সাহেব আমাদেরকে বলল যে, তোমরা আবার তোমাদের ডিফেন্সে যাও। আর বকশীগঞ্জ থেকে কামালপুরে যাতে কোনো অবস্থাতেই পাকিস্তানি ফোর্স না আসতে পারে, তার জন্য সতর্ক হয়ে যাও।

তখন আমরা উঠানিপাড়া মাদ্রাসাতে ডিফেন্স নিয়া বসে থাকি। ডিফেন্স নিয়া থাকা অবস্থায় রাত ১২-১টার দিকে ওখানে একটা লোক আসলো। তাকে আমরা ধইরা ফেললাম। আমরা জানতে পারলাম, সে নাকি আলবদর বাহিনীর। তার নাম

লাখপতি। আমরা তার চোখ বান্ধি। বাইন্ধা তাকে আমাদের ডিফেন্সে নিয়া যাই। ডিফেন্সে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় কোরআন শরিফ দিয়ে বলা হলো যে, তুমি বদর বাহিনীতে ছিলা, তোমাকে আমরা ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু তুমি এখন মুক্তিফৌজ হইয়া যাও। উনি শপথ নিয়া মুক্তিফৌজ হলো। এরপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাকে বলা হলো, বকশীগঞ্জ থেকে কামালপুরে যদি পাঞ্জাবি আসে, তাহলে আমাদের খবর দিবা। কিন্তু সে আমাদের কোনো খবর দিল না।

এদিকে সেদিন রাত সাড়ে তিনটার দিকে পাঞ্জাবিরা বকশীগঞ্জ থেকে সার্চলাইট মারতে মারতে আমাদের ডিফেন্সের দিকে চলে আসে। দেখা গেল, বান রোড দিয়ে তারা আসতাছে। পাঞ্জাবিরা আমাদের ডিফেন্সের ৩০-৪০ হাতের মধ্যে আসামাত্র আমরা ফায়ার শুরু করি। ফায়ার দেওয়ার পরে পাঞ্জাবিরা খালি ইয়া আলী বলে চেঁচায় আর ফায়ার করে। পাঞ্জাবিরাও করে, আমরাও করি। আমরা যেখান থেকেই ফায়ার করি, সেখানেই তাদের সার্চলাইটের আলো পড়ে। আমাদের যে ডিফেন্স থেকে ফায়ার হয়, সেই ডিফেন্সেই তারা আক্রমণ করে। সার্চলাইটের কারণে আমরা ঠিকভাবে গোলাগুলি করতে পারছিলাম না। সার্চলাইটের কারণে আমরা বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। তখন আমাদের পিছনে ব্যাক করা ছাড়া উপায় থাকল না। কিন্তু পালানোও সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় ওখানে এক সাইডে একটা পাগাড় ছিল। সেই পাগাড়ের ভিতরে নেমে আত্মগোপন করে থাকলাম। তারপর আস্তে আস্তে ওখান থেকে উঠে আমরা ক্যাম্পে গেলাম। মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে আসার পরে দেখলাম যে, আমাদের কয়েকজন ছেলে নাই। পরে জানা গেল আমাদের একজন মারা গেছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি সেদিন হয়েছিল কি?

- হ্যাঁ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের কয়েকজন হতাহত হয়েছিল। কিন্তু সংখ্যাটা বলতে পারব না। যাহোক, ক্যাম্পে যাওয়ার পরে মেজর তাহের সাহেব সবকিছু জানতে চাইল। তখন তাকে আমরা সব জানালাম।

এরপর আপনারা কী করলেন?

- কামালপুরে তো প্রায় প্রতিদিনই যুদ্ধ হয়েছে। আমরা একেক দল একেক দিন কামালপুরের চারদিকেই ডিফেন্স নিয়া থাকতাম। সাত দিন পর পাঞ্জাবিরা উঠানিপাড়া গ্রামে আক্রমণ করে। সেদিন পাঞ্জাবিরা ওখানে কয়েকজনকে হত্যা করে। প্রতিদিন গোলাগুলি চলতে থাকে। নভেম্বর মাসের দিকে ক্যাপ্টেন মাহফুজ আমাদের একদিন বললেন যে, তোমরা পুরা কোম্পানি সহকারে নসিউল্লাহ সর্দারের বাড়ি থেকে উঠানিপাড়া পর্যন্ত ব্লক করে দাও। কামালপুর ক্যাম্প তোমরা সম্পূর্ণ ঘেরাও কইরা রাখো, যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোনো খাদ্যদ্রব্য বাইরে থেকে না আনতে পারে।

দিনরাত ২৪ ঘণ্টা মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে শেলিং চলতে থাকে। তাতেও কামালপুরের পাকিস্তানি আর্মিদের টলানো যায় না। এভাবে কয়েক দিন গেল। যেদিন ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল, সেদিন খুব সকালে আমাদের কাছে খবর আসলো যে, আজ দুপুর ১২টার সময়ে ভারতের প্লেন আসবে। প্লেন থেকে কামালপুরের ওপর বোম্বিং হবে। তখন আমরা আমাদের ডিফেন্স থেকে ২৫০-৩০০ গজ পিছনে সরে গেলাম। ওখানে আমরা ডিফেন্স নিয়া ছিলাম। একসময় প্লেন আসলো। প্লেন কামালপুর ক্যাম্পের ওপর দুইডা চক্কর দিল। তখন পাঞ্জাবিরা প্লেন লক্ষ্য করে মেশিনগানের ফায়ার দেয়। প্লেন বোম মেরে ওপরে উঠে যায়। সেই রাতেই শত শত ভারতীয় সৈন্য ট্রাকবোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে কামালপুরের বান রোডের কাছে চলে আসে। আসার পরেই তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামালপুর ক্যাম্পে লোক পাঠায় তাদের সারেন্ডার করার জন্য। প্রথমে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সারেন্ডার করতে চায়নি। পরে যখন দেখল অবস্থা বেগতিক, তখন পাঞ্জাবিরা সারেন্ডার করল। কামালপুর মুক্ত হওয়ার পর আমরা ইন্ডিয়ান চার্লি কোম্পানির সঙ্গে বকশীগঞ্জ যাই। বকশীগঞ্জের সূর্যনগর থেকে ফায়ার দেওয়া হয়। দেখা গেল যে, বকশীগঞ্জ থেকে কোনো ফায়ার নাই। তখন আমরা বকশীগঞ্জ বাজারে যাই। দেখতে পাই, পাঞ্জাবিরা কেউ নাই। শুনলাম, পাঞ্জাবিরা ঝগড়ার চর চলে গেছে। এরপর আমরা ঝগড়ার চর গেলাম। কিন্তু সেখানেও পাঞ্জাবিরা ছিল না। জানা গেল, পাঞ্জাবিরা ঝগড়ার চরের পিছনে ফুলমারা নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে অবস্থান নিয়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে তাদের আক্রমণ করি। সেখানে দুই-তিন দিন যুদ্ধ হয়। কিন্তু তারা পিছে হটছিল না। এরপর প্লেন এসে তাদের ওপর বোম্বিং করে। তখন পাঞ্জাবিরা শেরপুর চলে যায়। ওখান থেকে তারা আবার জামালপুর চলে যায়।

তারপর কী করলেন?

● আমরা জামালপুরে ক্লোজ হলাম। তারপর জামালপুরে ক্যাম্প করে কিছুদিন আমরা সেখানে থাকি। কয়েক দিন পর আমাদের বলল যে, তোমরা যার যার বাড়িতে চলে যাও। আমরা বাড়িতে চলে আসলাম। পরে বাড়ি থেকে আবার ক্যাম্পে গেলাম। তখন আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিল।

ফিরে এসে এলাকার কী অবস্থা দেখলেন?

● আইসা দেখি যে, বাড়ির ভিতরে জঙ্গল। বাড়িতে ঢোকা যায় না। আমার ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার। কোনো কিছুই নাই, খাওয়ার বাসন পর্যন্ত ছিল না।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মো. সিরাজুল হক

পিতা : আসমুদ্দীন। গ্রাম ও ইউনিয়ন : কামালপুর, ডাক : ধানুয়া-কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর। ১৯৭১ সালে বয়স : ২২। ১৯৭১ সালে পেশা : কৃষিজীবী। বর্তমান পেশা : কৃষিজীবী।

১৯৭১ সালের কথা আপনার মনে পড়ে কি? ২৫-২৬ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিন্তু বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করেছিল?

● মনে আছে। তহন পাঞ্জাবিরা প্রথম ঢাকায় হামলা করে। ওই সময় একদিন আমরা শুনলাম, ঢাকায় খুব গন্ডগোল হইতাছে। তার কিছুদিন পরই পাঞ্জাবিরা এই দিকে আগাইয়া আসতে লাগল। প্রথমেই তারা বকশীগঞ্জ আসে নাইকা। জামালপুরের ওই লাইনে থাকল। পরে আমাদের এই দিকে তারা আইলো। তারপর আমি ভারতে গিয়া মুক্তিবাহিনীতে লিখাইলাম নাম।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন?

● আমি আমার দেশ রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছি। তার জন্য ওরা (পাকিস্তান সেনাবাহিনী) আমার বাড়িঘরে ক্ষতি কইরা দিছে। তহন আমি ছিলাম ঘাসিরপাড়ায়। এটা বগার চর ইউনিয়নে। আমার ওহানেই বাড়ি ছিল। এহন আমি কামালপুর থাকি। যাহোক, পাঞ্জাবিরা জানতে পারল, এই বাড়ির একটা ছেলে মুক্তিযোদ্ধা হইছে, তহন আমার বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিছে। তহন আমার বাপ নাই, মা ছিল, বোন ছিল, ভাই ছিল। তহন আমার ভাইবোনরা নানার বাড়ি চলে যায়। আমি পাতজোরায় গিয়া মুক্তিবাহিনীতে নাম দিছি। তারপর আমাদের ট্রেডিং (ট্রেনিং) হইছে। হওয়ার পরে আমাদের মহেন্দ্রগঞ্জ নিয়া আসলো। নিয়া আসার পরে এইহানে আমাদের কিছুদিন ট্রেডিং (ট্রেনিং) হইল, পরে ট্রেডিং

(ট্রেনিং) হইল তুরায়। তুরায় হইল সাত দিন। সাত দিন হওয়ার পরে তহনকা ক্যাপ্টেন মান্নান কইল যে, তোমাদের তুরার ট্রেডিং আর মহেন্দ্রগঞ্জের ট্রেডিং একই ট্রেডিং। এহন তোমরা মহেন্দ্রগঞ্জে চলে যাও। তহন আমরা মহেন্দ্রগঞ্জে চইলে আসলাম। আইসে আমাগোরে তহনকা নামাইয়া দিল প্যাট্রোলে।

খাসের গ্রামে মুক্তিবাহিনীর ৫ নম্বর ডিফেন্স আছিল। আমরা শুনলাম, ওহানে কেউ টিকবার পারে না। যাদেরই দেয়, তারা দৌড় মারে। পরে আমরা ওহানে আইলাম। মাহফুজ কোম্পানির সাথে আমরা আসলাম। ক্যাপ্টেন আজিজ আছিল, ওনার ওপরে দায়িত্ব তহন। তার নান্দিনা বাড়ি। সেই ক্যাপ্টেন আজিজ বলছে যে, তোমরা মাহফুজ কোম্পানির যেগুলো ছেলে আছ, তাদের আমি ঢালুতে নিয়া যাব। তহনকা আমরা ওহানে গেলাম। আমাদের সঙ্গে বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরেকজন ছিল। তার নাম পান্না ভূঁইয়া। আমরা তহন থাকে ওই খাসের গ্রামে থাকিয়া যুদ্ধ করতে লাগলাম।

একদিন পাঞ্জাবিরা আমাগোরক (আমাদের) প্রায় ঘেরাও কইরে ফালাই ছিল। সেদিন আমরা খুব বিপদেই পড়ছিলাম। তহন লেফটেন্যান্ট মিজান, তার বাড়ি আছিল শেরপুর, সে আমাগোরক উদ্ধার কইরা নিয়া আসলো ধানুয়ার গণি বাড়ির পাছ থেকে। উদ্ধার হওয়ার পরে আমরা গেলাম ভারতে। ওইহানে আমগোর হিসাব হইল। দেখা গেল, আমাদের সব ছেলে ঠিকই আছে। সকালে খবর পাইলাম যে, ওহানে আমাদের গুলিতে বেশ কটা পাঞ্জাবির মৃত্যু হয়া গেছে। ভারতে যাওয়ার পরই ক্যাপ্টেন আজিজ আবার বলল যে, আজকেই রাইত একটার সময়ে তোমাদেরকে যাইতে হবে কামালপুর। তহন আমরা রাইতের একটার সময়ে রওনা করলাম কামালপুর। ওই সময় আমাদের সাথে ক্যাপ্টেন আজিজ ছিল, ক্যাপ্টেন মান্নানও ছিল। দুইজনই ছিল। আমরা রওনা করলাম ধানুয়া দিয়া। খাসের গ্রাম হইয়া আমরা কামালপুর আইসা পড়লাম। ওহানে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন মান্নানে বলল যে, আজকা খেলা হবে কামালপুরে। আমরাও বললাম, ঠিক আছে, স্যার, খেলা হইলে আমরাও খেলমু তো! মানে পাঞ্জাবিগোর সাথে আমাদের একটা বড় যুদ্ধ হবে।

আপনারা সেদিন কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

● আমরা ছিলাম ৮০-৯০ জন, মুক্তিযোদ্ধা আর বেঙ্গল রেজিমেন্ট কয়টাসহ। আর ইন্ডিয়ান ফোর্স ছিল আমাদের এই গণিবাড়ির পিছনে। ওরা থাকল পিছনে, আমরা থাকলাম আগে। আমরা অ্যাডভান্স কইরা আগাইয়া গেলাম। কামালপুর যাওয়ার পরে ক্যাপ্টেন মান্নান ওয়্যারলেস করল বিএসএফ ক্যাম্পে। করে বলল, তোমরা শেল ছাড়ো পাঞ্জাবিগো কামালপুর ক্যাম্পের পশ্চিম সাইডে। কিন্তু শেল তাদের আইসা পড়তে লাগল আমাগোর ওপর। তহনকা আমরা না কুলাইবার পাইরা পাছাইয়া গেলাম। আমরা তহন পশ্চিম সাইডে পাছাবার লাগছি। পাছাইয়া নদী পার হইয়া গেলাম গা। ওহানে পীরের চর বলে একটা গ্রাম আছে, সেহানে গেলাম। সকালবেলা দেহি, আমাদের সব ছত্রভঙ্গ, কে কোন দিক গেছে, কারও কোনো খোঁজ নাই।

পরে আমরা আবার একখানে হওয়া শুরু করলাম। সেটা কামালপুরের পোয়া মাইল পিছনে। ওহানে আমরা আবার মরিচা করলাম। মরিচা কইরা পজিশন নেওয়ার পর আবার একটা শেল ছাড়ছিল ভারত থেইকা। সেই শেলটা আমাগোর ওপর দিয়া যাইয়া ধানুয়া পইড়া গেল গা। তহন আমরা মনে করলাম যে, এই শেলটা কেন আমগোর ওপর দিয়া গেল। আমাগো মনে হইল আরও শেল আসবে। ওগুলা হয়তো আমাগোর ওপরেই পড়ব। তহন আমরা আবার পাছাইয়া গেলাম গা। পাছাইয়া খাসের গ্রাম গেলাম। কিন্তু সেখানেও অনবরত শেল পড়া শুরু হইল। তহন আমরা ওহান থেকা বাধ্য হইয়া চইলাই গেলাম।

এর পর থাইকে আমরা ভারতের মধ্যে থাকতি লাগলাম। কয়দিন পরে আমগোরক বদলি করল। বদলি কইরা পাঠাইল যদুর চর আর কামারপাড়া। ওহানে কয়েক দিন আমরা যুদ্ধ করি। একদিন ক্যাপ্টেন আজিজ বলল যে, তোমগোরক আবার অ্যাডভান্স করতে হবে পুরাখাসিয়া। তহন আমরা পুরাখাসিয়া চইলা গেলাম। ওহানে যাওয়ার পর আমাগোরক কয়েকটা ভাগে ভাগ করল। একটা ফায়ারিং পার্টি, একটা কাট অফ পার্টি আর একটা সাপোর্টিং পার্টি। আমি পড়লাম কাট অফ পার্টিতে। তহনকা আমরা অ্যাডভান্স কইরা চললাম বকশীগঞ্জ। বকশীগঞ্জের কাছে যহন গেছি, তহনকা জামালপুর-কামালপুরে বিমান আক্রমণ শুরু হইল।

এটা কোন সময়?

● এটা যুদ্ধের শেষের দিকের ঘটনা। তহন বিমান আক্রমণ শুরু হইল। বকশীগঞ্জ যাওয়ার পর শুনলাম, কামালপুর মুক্ত হয়া গেছে। তহনকা আমরা ছিলাম প্রায় ৫০০ জন। ইন্ডিয়ান ফোর্সও ছিল মেলা।

তহন আপনাদের নেতৃত্বে কে ছিলেন?

● ক্যাপ্টেন আজিজ। শ্রীবর্দী যায়ে আমরা শুনলাম যে, কিছু পাঞ্জাবি কুরুয়া গেছে। তহন আমরা ওই দিকে রওনা হইলাম। আমরা পাঞ্জাবিগোর রেঞ্জের মধ্যে যাওয়া মাত্র ওরা ব্রাশ করছে। তহনকা আমরা রোডের নিচে নাইমা পড়ছি। পাঞ্জাবিরা করছে কী! তহনকা মর্টার ছাড়া শুরু করছে আমগোর ওপরে। আমাগোর আশেপাশে মর্টার ছাড়তাছে। ওই সময় আমরা তো বিপদেই পইড়া গেলাম গা। ইন্ডিয়ান ফোর্স তিনডা আহত হইয়া গেল গুলি খাইয়ে। ওই সময় আমরা সরিষাবাড়ী দিয়া ক্রলিং করে যাওয়া শুরু করলাম। যেহানে মর্টার

পড়তাছে, সেই সাইডটা ছাইড়া দিয়া আমরা অন্য সাইডে যাওয়া শুরু করছি। পরে আমরা স্কুলের ওহানে পজিশন নিছি। ওহানে আমাগো কয়েকটা গাড়ি আইল। ওই গাড়ি আসার পর আমাগো শেল ছাড়া শুরু করল। তহনকা পাঞ্জাবিরাই বিপদে পড়ল।

পরে শোনা গেল, তারা সারেন্ডার করবে। রাতের বেলা ওই পাঞ্জাবিরা ইন্ডিয়ান ফোর্সের কাছে সারেন্ডার করল। করার পরে আমরা আলাম শেরপুর। শেরপুর এক রাইত থাকলাম। পরদিন চললাম নান্দিনা। নান্দিনা গিয়া দেহি, নান্দিনা বাজার চুপচাপ। কোনো সাড়াশব্দ নাই। তহন নান্দিনা বাজার ছাইড়া আমরা গেলাম কালীবাজার। ওহানে এক পানের বরজ আছিল। কুইশার (আখ) আছিল রেললাইনের কাছে। ওহানে আমরা পজিশন নিলাম, যাতে জামালপুর থাইকা পাঞ্জাবি আসতে না পারে। ওহানে আমরা সারা রাত থাকলাম। তারপর আমরা আবার জামালপুর রওনা হইয়া গেলাম গা। জামালপুরে যাইয়া চতুর্দিকে ঘির দেওয়া হইল। দিনের একটার সময় জামালপুরের পাঞ্জাবিরা সারেন্ডার করল।

যুদ্ধ শেষে এলাকায় ফিরে ঘরবাড়ির অবস্থা কী দেখলেন?

- দেহি, আমার ঘরবাড়ি নাই, সব পুড়াইয়া দিছে।

আশেপাশের ঘরবাড়ি?

- আশেপাশের ঘরবাড়ি পোড়ায় নাই। শুধু আমারডাই পুড়ছে।

যুদ্ধ শেষে আপনার অস্ত্র কী করলেন?

- জমা দিছি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মো. লাল মিয়া

পিতা : হুরমুজ আলী। গ্রাম : ধানুয়া, ইউনিয়ন : ধানুয়া-কামালপুর, ডাক : কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী। ১৯৭১ সালে বয়স : ২২। ১৯৭১ সালে পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসা। বর্তমান পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসা।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ ঢাকায় আক্রমণ করেছিল। সে খবর আপনি শুনেছিলেন কি?

- জি, আমি এ খবর শুনছি ইপিআরদের মুখে। তহন আমার এক ভগ্নিপতি ইপিআর ছিল। উনি ল্যান্স নায়েক ছিলেন। থাকতেন ঢাকার পিলখানায়। আমার বোনও ঢাকায় থাকত। তহন কামালপুরেও ইপিআর ছিল। আমার ভগ্নিপতির মাধ্যমে এখানকার ইপিআরদের সাথে আমার চেনাজানা হইছিল। তহন এখানে শামসু নামে এক ইপিআর ছিল। উনি আমার সঙ্গে ধর্ম ভাইয়ের সম্পর্ক করছিলেন আর কি। তো তাদের মুখে শুনলাম যে, এই ব্যাপার! ঢাকায় খুব গোলমাল অইছে। পাঞ্জাবিরা পিলখানায় চারদিকে মেশিনগান, এলএমজি ফিট কইরে গুলি কইরে অনেক ইপিআর মারছে। শুধু ইপিআরদেরই না, তারা ঢাকায় অনেক বাঙালি লোক মারছে। ঢাকার মানুষ অনেকেই গ্রামে বা আশেপাশে চলে গেছে। তহন আমার একটা চিন্তা হয়ে গেল গা যে, আমার ভগ্নিপতি ছিল পিলখানায়। আমার বোনও ছিল ঢাকায়। তারা বেঁচে আছে, না মইরে গেছে, জানি না। তারপর কিছুদিন ওহানে-এহানে ঘুইরা-ফিইরা বেড়ালাম। পরে খোঁজ পাইলাম যে, আমার ভগ্নিপতি বাঁইচা আছে। কীভাবে যেন উনি বাঁইচা গেছে। যাহোক, তারপর একদিন শামসু ইপিআর আমারে ৫০০ টাকা দিয়া কলো, এই টাকাটা আপনার কাছে রাখেন। যদি বাঁইচা থাকি,

তবে আমারে দিবেন। পরের দিন সকালবেলায় দেহি শামসুর আর খোঁজ নাই। তাদের কারোরই আর পালাম না। দেহি কামালপুর ইপিআর ক্যাম্পে কেউ নাই। সব উধাও। শুধু বাবুর্চি আছে। উনার কাছে ইপিআরদের কথা জিজ্ঞাস করলাম। সে কয় যে, ভাই, ইনারা টাঙ্গাইল চইলে গেছে। উনাদের কাউকে এহন পাবেন না। তহন আমার মনে হলো যে, আমরার অবস্থাও হয়তো এই ধরনের হবে। আমরাও বেঁচে থাকব না।

এই এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী কখন আক্রমণ করল?

- পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল মনে হয় বৈশাখ মাসের শেষে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে। ফাস্টে উনারা আসে বকশীগঞ্জ। বকশীগঞ্জ থাইকে কামালপুর ঘোরাফেরা করে। দিনে তারা জিপ নিয়া আইসে ঘোরাফেরা কইরে চইলে যায়। পরে বাড়িঘর পোড়ানো আরম্ভ করল। তহন আমরা চলে গেলাম গা ইন্ডিয়া। আমার বাবা তহন একটা মসজিদে ইমামতি করত। বাবা সেহানেই থাকত। মা আর আমার ছোট তিনটা বইনসহ উনি ওইহানে থাকত। আর আমি ছিলাম ধানুয়ায়। ধানুয়াতেই আমি আমার স্ত্রীকে নিয়া থাকতাম। পরে ধানুয়াতে আমার থাকা সম্ভব হলো না। স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রাইখে দিয়ে বাবা-মাকে খোঁজ করা আরম্ভ করলাম। ওই সময় তো রোডে যাতে পারি না। পাঞ্জাবিরা যহন-তহন আইয়া পড়ে। তহন তো আমার বয়স কম আছিল। ছাত্রর মতো দেখা গেছে। পাঞ্জাবিরা ছাত্র দেখলেই ধইরা নিয়া গেছে। নিয়া তাদের মারপিট করছে। মাইরেও ফেলছে। কাউরে কাউরে এই রহম করছে। এই ভয়ে আমি পরে ইন্ডিয়া চইলে গেলাম। মা-বোনদেরও খুঁজে পাইছিলাম। তখন শরণার্থী শিবিরে মা-বোনদের রাইখে দিলাম। রাইখা আবার গেলাম আমার শ্বশুরবাড়ি। সেহানে যাইয়া দেখলাম, আমার ওয়াইফ নাই। তারা তাদের এক আত্মীয় বাড়িতে চইলা গেছে। সেটা চর এলাকা। ওহানে যাইয়া তাদের খোঁজ পাইলাম। ওহানে আমি তিন দিন থাকলাম। ওহানে থাকার সময় আমার ওই ভগ্নিপতিরও খোঁজ হইয়া গেল। শুনলাম আমার ভগ্নিপতি বাঁইচে আছে। উনি সূর্যনগর গ্রামের এক নাপিতবাড়িত আছে। তহন আমি আরও দুইজন লোক সঙ্গে কইরে নিয়া তাদের খোঁজ করার জন্য ওই দিক গেলাম। আল্লার কী কাম! নাপিতের বাড়িতে যাইয়া আমি আমার ভগ্নিপতি আর বোনরে পাইলাম। তারপর তাদের সঙ্গে কইরা নিয়া আমার শ্বশুররা যেহানে ছিল, সেহানে গেলাম। ওহানে যাইয়া আমার ভগ্নিপতিসহ আমি রাইতের বেলায় ইন্ডিয়া চইলা গেলাম।

ভারতে গিয়ে কী করলেন?

- আমার ভগ্নিপতি আগে মুক্তিযোদ্ধার ভিতরে চইলা গেল। আমি যাতে পারলাম না। আমি নাম দিলাম। কিন্তু আমার ডাকটা পড়ল না। বেশ কয়দিন গেল। আমার নাম ডাকে না। তহন একদিন শুনলাম যে, ইয়াজুল নামে একজন আমার নাম কাটে দিছে। পরবর্তীতে ইয়াজুলের সঙ্গে আমি দেহা করি। দেহা করার পরে সে কইল যে, আপনি এক বাপের এক ছেলে। আপনি মুক্তিবাহিনীতে যায়েন না। এহন বহুত লোকই মুক্তিবাহিনীতে যাচ্ছে। যদি যাতেই চান, তবে কিছুদিন পরে যান। এই বইলা উনি আমারে বিদায় দিল। পরে আমি কালাইপাড়া যাইয়া নাসির কোম্পানিতে ভর্তি হই। ওই কোম্পানিতে আমাদের এলাকার আরও ছেলে আছিল। ওদের ধইরা আমি ওহানে ভর্তি হইলাম।

আপনি কত দিন ট্রেনিং করেছেন?

- আমি মহেন্দ্রগঞ্জে মাত্র সাত দিন ট্রেনিং করছি।

সাত দিনের ট্রেনিং নিয়ে আপনি কী করলেন?

- সাত দিনের ট্রেনিং নিয়া নাসির কোম্পানির কয়েকটা ছেলের সঙ্গে কামালপুরে অপারেশনে আসছি দুই-এক দিন। তারপর আমাগোক বদলি করে দিল। পুরা কোম্পানি ওহানথে চইলা গেল।

কোথায়?

- এইডা দেওয়ানগঞ্জ থানায়। ওহানে আনন্দবাড়িতে একটা হাইস্কুল আছে। সেই হাইস্কুলে যাইয়া আমরা ক্যাম্প করলাম।

তারপর কি আপনি আর কামালপুরে আসেননি?

- না, আমি আর কামালপুরে আসি নাই। আমরা গেছি ফুলছড়িঘাট, বাহাদুরাবাদঘাট। ইসলামপুরের ওই সাইডে গেছি।

বাড়ি ফিরে এলাকার কী অবস্থা দেখলেন?

- দেহি গ্রাম নাই, একদম শেষ। চারদিকে জঙ্গলটঙ্গল, ঘাসটাস হয়ে গেছে। স্কুলটা একদম ভাঙাচোরা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনার অস্ত্র কী করলেন?

- আমি অস্ত্র জামালপুরে জমা দিছি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

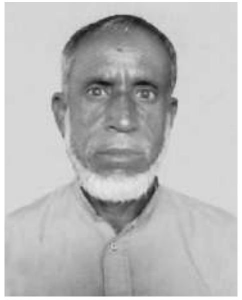

আবুল কাশেম

পিতা : কুটু শেখ। গ্রাম : কনেকান্দা, ইউনিয়ন : কামালপুর, ডাক : লাউচাপড়া, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। ১৯৭১ সালে বয়স : ২০-২১। ১৯৭১ সালে পেশা : কৃষিজীবী। বর্তমান পেশা : কৃষিজীবী।

১৯৭১ সালের কথা কি আপনার মনে আছে—ওই বছর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫-২৬ মার্চ ঢাকায় আক্রমণ করেছিল?

- মনে আছে। ওই সময় আমি ঢাকাতেই ছিলাম। ১৯৭০ সালের ভোটের পর আমি ঢাকায় গেছলাম। সেখানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে এক জায়গায় আছিলাম। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমার এক বোনাই আছিল। তার কাছেই আমি গেছিলাম। তখন তো শেখ সাব ঢাকায় ভাষণ দিলেন। ওই ভাষণটাও আমি শুনছি। সেই ভাষণে উনি বললেন যে, আপনাদের যার হাতে যা আছে, তাই নিয়া শত্রুর মোকাবিলা করেন।

  ২৫ মার্চ রাতে পাঞ্জাবিরা গোলাগুলি শুরু করলে আইতের (রাতের) তিনডার সম (সময়) আমরা কাঁটাতারের বেড়া পার হয়া আমাগো জীবন বাঁচাই। তারপর ওহান থে কামরাঙ্গীরচর চইলা যাই। পরে নদী পার অইয়া এক গ্রামে যাই। ওহানে দুই-তিন দিন থাহার পরে হাঁইটা বাড়িত রওনা দেই। গ্রামে চইলে আসার পর দেহি এহানেও অনেক ঘটনা ঘটছে।

আপনার এলাকায় তখন কী ঘটনা ঘটেছিল?

- কর্ণজোড়া, কামালপুর, নশকি (নকশী) তার পাছে এই দিহি (দিকে) লালমাটির চরে ইপিআর ক্যাম্প আছিল। কর্ণজোড়া ক্যাম্পের একজন পাঞ্জাবি ইপিআররে বাঙালি ইপিআররা মাইরে ফেলছিল। আমি বাড়ি আসার কয়দিন পর পাঞ্জাবিরা একদিন তিনডা ট্রাকে কইরে আসে। আইসা তারা এই পাহাড় দিয়া ফায়ার আরম্ভ করে। আমাদের গ্রামটা অইল নামা জায়গায়। ফায়ার আরম্ভ অইলে আমরা বিলের দিহে যাই। বিকালে পাঞ্জাবিরা যহন টেংরামারীর থাকে ফিরে গেল, তহন আমরা বাড়িতে আইলাম। আসার পর চিন্তাভাবনা করলাম যে আমি তো আগে ইপিআরে আছিলাম কিছুদিন, কামালপুর ক্যাম্পেও আছিলাম, আমাকে তো অনেকেই চিনে। তাই আমি একটু ভয়টয় পাইলাম। আবার কেউ কেউ আমারে কলো যে, তোকে পুলিশে যাবার কইছে। ভাবলাম, পুলিশরা আমাক (আমাকে) ধরায়ে দিতে পারে। তাই একদিন করলাম কি, একটা জামা গায়ে দিয়া ভারতমুখে যাওয়া শুরু করলাম।

  ভারতে যাইয়ে দেহি যে, ওহানে একটা ক্যাম্পে হামদী মেম্বার, মজিল রহমান, আতর আলী, তার পাছে আরও অনেক লোক। তারা আমারে কয়, তুমি আইছ? আমি বলি হ, আইছি। তারা বলে, তাহলে তুমি দাঁড়াই যাও। মুক্তিবাহিনীতে লোক নেওয়া হচ্ছে। তহন আমি দাঁড়াই গেলাম। দাঁড়ানির পর আমগো নাম লিস্ট করল। নাম লিস্ট কইরে নেওয়ার পর আমাগোরক মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে রাখল। তিন দিন রাখার পর আমাগোরক কালাইপাড়া ক্যাম্পে পাঠাইল। কালাইপাড়া ক্যাম্পে যাইয়ে আমরা কমের পক্ষে দুই মাস থাহি। দুই মাস আমরা ওহানে ট্রেনিং করি। ট্রেনিং শেষ করার পর একদিন একজন আইসে আমাদের বলে যে, তোমাদের আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ নিমু। উনি আমাগো মহেন্দ্রগঞ্জ নিয়া আবার সাত দিন আমাদের ট্রেনিং করায়। করানির পর একদিন আমাগোরক অপারেশনে পাঠায়।

কোথায়?

- কামালপুর। বিকাল পাঁচটার সম (সময়) আমাদের খানা খিলাইল। সাত-আটটার সোম আমগোরক রওনা কইরে দিল। আমরা আইলাম এই ধানুয়ার চেয়ারম্যানের বাড়িত। আমাগো কমান্ডার আছিল লেপটেন (লেফটেন্যান্ট) মিজান সাব। আমি, আতর আলী, ধুন্দা, আরেকজন আছিল দেওয়ানগঞ্জের—এই চারজন আমরা রওনা হইলাম মিজান সাবের সঙ্গে। আমরা মোট পাঁচজন। রওনা হইয়া যহনকা ধানুয়ায় বাংকারের ওহানো আইছি, দেহি, পাঞ্জাবিরা পজিশন নিয়া আছে। তহন অনেক রাত। পাঞ্জাবিরা একটা সার্চলাইট মারছিল। সার্চলাইটের আলোতে চারদিক একদম পরিষ্কার দেহা যায়। সার্চলাইটের আলোতে আমরা পাঞ্জাবিগো পরিষ্কার দেখলাম। ওরাও আমাগোরে দেখছে। তহনকা আমরা কোথায় যাই? তহন ধান বোনা আছিল জমিতে। ধানগাছ বেশ বড়ও হইছে। আরেক ধারে রোড আছিল। ওই

রোডের ধারে আমরা পজিশন নিলাম। নেওয়ার পর পাঞ্জাবিরা গুলি শুরু করল। পরাই (প্রায়) মনে করেন আধা ঘণ্টা পরিমাণ গুলি অইল। আমরাও গুলি করলাম। গুলি করার পর লেপটেন (লেফটেন্যান্ট) মিজান সাব কলো, তোমরা আর গুলি কইরো না।

তখন লেফটেন্যান্ট মিজান এবং অন্য তিনজন হঠাৎ কোথায় জানি চইলা গেল। ওই চারজনের তো তহন খোঁজ নাই। তহন কেবল জ্যোৎস্না উঠতেছে। তার আগ পর্যন্ত অন্ধকার আছিল। একটা মাঠেই তহন বইয়া রইলাম। ভাবলাম, জ্যোৎস্নাটা আরেকটু গজাক। গজাইলে পরে আমি চইলা যামু। একটু আলো হওয়ার পরে আমি ওহান থাকে চইলা গেলাম। কিছু দূর যাওয়ার পরে কয়জন আমারে হলড (হল্ট) করায়। আমি তহন তাদের কাছে সারেন্ডার করি। করার পর দেখলাম যে, তারা আমাগো সাপোর্ট পার্টি। আমি আমার পরিচয় দিলাম। কিন্তু ওই পার্টির যে কমান্ডার সাব আছিল, সে আমাক ছাড়ল না। তারা আমারে আটকায়ে রাখল। খানিক পরে ওই পার্টির লোকের কাছে সংবাদ পাইলাম যে, লেফটেন মিজান সাব মারা গেছে।

লেফটেন্যান্ট মিজান কি ওই দিন নিহত হয়েছিলেন?

● না, না, লেপটেন মিজান সাব মারা যান নাই। আমাগো ওই সাপোর্ট পার্টি ভুল সংবাদ পাইছিল। পরে ওই সাপোর্ট পার্টি উইড্রো (উইথড্রো) হয়া ভারতে যায়। সব পার্টি মিলা মুক্তিফৌজ ওই দিন অনেক ছিল। আমরা পাঁচজন ছিলাম অ্যাডভাস (অ্যাডভান্স) পার্টি। উইড্রো হওয়ার পর আমাগো কুমারপাড়ায় ফল ইন করল। তারপর গুনতি কইরা বলতাছে যে, লেপটেন মিজান সাবের সাথে আপনারা যে যে আছিলেন, তারা আগায়ে আসেন। তহন আমি আগায়ে গেলাম। ওই ধন্দা, আতর আলী, তার পাছে দেওয়ানগঞ্জের ওই লোকও আগায়ে আসছে। কুমারপাড়ায় ওগো লগে আমার দেখা অইছে।

যাহোক, আমাগো চারজনরে বলল যে, যেহানে গোলাগুলি অইছে, সেহানে তোমাগো যাওয়া লাগব লেপটেন মিজান সাবের লাশ খুঁজতে। উনি হয়তো ওহানে মারা গেছে। তোমাগোর যাইতে হবে। আমরা বললাম যে, না, আমরা চারজন কীভাবে ওহানে যাব? আমাদের সাথে আরও কিছু লোক দেন। লোক দিলে আমরা যাব। তহন আমাদের সাথে আরও কিছু লোক দিল। আমরা যাইয়ে ওই জাগায় চেক করলাম। কিন্তু লেপটেন মিজান বা তার লাশ ওহানে নাই। তারপর আমরা ঘুইরা যাইয়ে বললাম যে, লেপটেন মিজান তো নাই। তহনকা বড় কমান্ডার সাব বলল যে, লেপটেন মিজানকে তোমরা মারছ? না হলে সে কোথায় গেল। আমি বললাম যে, স্যার, আমরা তো লেপটেন মিজানকে মারি নাই। গুলি হওয়ার পর উনি যে কোথায় গেল! এই তিনজনও তহন ওহানে ছিল না। আমি দেহি তারা নাই। পরে আমি একা একা কোনোরহম জীবন বাঁচাইছি। তহন আমাগো কোয়ার্টার গার্ড করাইছে। পরে লেপটেন মিজান সাব খবর দিল যে, আমি বাঁইচা আছি। তহন আমাগো কোয়ার্টার গার্ড থাকে মুক্তি দিল। পরে শোনা গেল, লেপটেন মিজান সাব লালমাটির চর গেছল। এরপর ওখানে আমরা তিন দিন থাহি। আমরা রেস্ট করি তিন দিন।

তিন দিন পর মেজর তাহের সাব বলল যে, তোমাগোরক অপারেশনে যাওয়া লাগব। ওই দিনও বিকাল পাঁচটার সম (সময়) আমরা খানা খাইলাম। খাইয়ে ছয়টার পরে চইলে আইলাম কামালপুর। সারা রাত ইন্ডিয়ান বর্ডার দিয়া আমরা বইসা রইলাম। সকালবেলায় আমরা অ্যাটাক করার পর মেজর তাহের সাব যহনকা কামালপুর তিন সড়কের মাথায় উঠছে, তহন তার কাছে একটা শেল পড়ছে। তহন আমরা অ্যাডভান্স করতেছি। মনে করেন কামালপুর ক্যাম্প বেশি দূর না, খুব কাছাকাছি আর কি। তহনকা আমাগো অনেক আঘাতপ্রাপ্ত অইল। মেজর তাহের সাবরে তো আগেই নিয়া গেছে। আমগোর যেগুলা আঘাতপ্রাপ্ত অইল, সেগুলারে আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ নিয়া গেলাম। মহেন্দ্রগঞ্জ যাওয়ার পর আমরা আবার তিন দিন রেস্ট করি। তিন দিন রেস্ট করার পর আমাগোরে বলল যে, তোমাগো যাওয়া লাগব টেংরামারী। তহন আমরা টেংরামারী যাইয়া দুই দিন থাহি। দুই দিন থাহার পর সকালবেলা কোথা থাকে যেন ওহানে শেল পড়া শুরু করল। শেলের একটা টুকরা আইসে আমগো একজন মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের বুকে লাগল। তহন আমরা নাশতা খাইতেছিলাম। এমন সম তার বুকের ভিতরে শেলের একটা টুকরা লাগল। আমাগো ওই মুক্তিযোদ্ধা ভাই মারা গেল। আমরা আমাগো নাশতা ফেলাই দিয়া যার যার মরিচায় পজিশনে চইলে গেলাম।

যে মুক্তিযোদ্ধা নিহত হলো তার নাম কী?

● উনি হইল সাদুর পাড়ার তসলিম।

তারপরে কী করলেন?

● তারপরে টেংরামারী থাকে আমগোরে পাঠায় দিল দত্তের চর। ওহানে থাহার সময় একদিন পাঞ্জাবিরা বকশীগঞ্জ থাকে আসে আমাগো ঘেরাও করে। তহন আমরা আছিলাম পরাই (প্রায়) ৩০০ জন। ইন্ডিয়ার সৈন্যও আছিল পরাই (প্রায়) ২০০ জন। তহনকা আমরা ফায়ার আরম্ভ করি। ফায়ার করলে পরে দেহি যে, আমরা কোনোভাবেই পাঞ্জাবিগো লগে কুলাইতে পারছি না। তহনকা আমগোর এহান থাকে মহেন্দ্রগঞ্জে বলল যে, আপনারা শেল মারেন। কিছুক্ষণ পর মহেন্দ্রগঞ্জ থনে শেল মারা শুরু করল। এই শেলে পাঞ্জাবি ১২-১৩ জন মারা গেল। ওই পাঞ্জাবিরা একটা বাঁশের ঝাড়ের তলে আছিল।

শেলডা ওখানে যাইয়া পড়ছিল। পড়ার পরে তো ওহানে যে ১২-১৩ জন আছিল সব শেষ। তহন আমরা আগাইলাম। ওই সময় পাঞ্জাবিরা পিছাইয়া গেল। তারপর আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ চইলা গেলাম। ওহানে আবার দুই-তিন দিন রেস্ট করার পর আমগোরে ফল ইন কইরে বলল যে, তোমাগোরক কামালপুর যাইতে হইবে।

তারপর?

- আমরা খানা খাইয়া রাতের বেলা কামালপুর ঘেরাও কইরে রাখলাম। পরদিন সহাল (সকাল) ১০টার সম (সময়) বিমান আসলো। বিমান কামালপুরের ওপর দুই তিন পাক দিয়া বোম ফালাইল। তহনকা ওই পাঞ্জাবিরা ছিটালবিটাল হইয়া দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করল। পরে পাঞ্জাবিরা সব সারেন্ডার করল। তহন লেপটেন মিজান সাব বলল, চলো, আমরা দহিন (দক্ষিণ) মুহে (মুখে) রওনা করি। তহনকা আমরা বকশীগঞ্জ বামে ফালাইয়া ডান দিয়া বাহাদুরাবাদ ঘাট চইলা গেলাম।

ফিরে এসে আপনার এলাকার কী অবস্থা দেখলেন?

- আমাদের গ্রামডা ছোট্ট। গ্রামের মানুষ দুই-একজন হয়তো এহানে আছিল। আরগুলা সবাই শরণার্থী অইছে। দেহি, বাড়িঘর সব ভাঙাচোরা। বাড়িঘর অবশ্য আগুনে পোড়া না। ঠিকই আছে। কিন্তু ঘরের চালটাল নাই, বেড়া ভাঙে গেছে। চারদিকে জঙ্গল হয়া গেছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
০৮ অক্টোবর ১৯৯৬

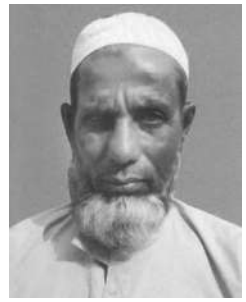

মো. আবদুল মান্নান

পিতা : হাজি মধু মণ্ডল। গ্রাম : বগুলাকান্দি, ইউনিয়ন : ধানুয়া, ডাক : লাউচাপড়া, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর (১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি। ১৯৭১ সালে বয়স : ২৩-২৪। ১৯৭১ সালে পেশা : বেকার। বর্তমান পেশা : রাজনীতি (ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য)।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আপনাদের এলাকায় কখন আক্রমণ করল?

- সঠিক তারিখ আমার মনে নাই। তারা শ্রীবর্দীতে প্রথম ক্যাম্প করে। তারপর আমাদের এলাকায় তারা দুই দিন আসে। আরেক দিন একদল পাকিস্তানি সেনা আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে আসে। আসার পরে তারা একজন নারীকে হরণ করে। আমি এই খবর পরদিন সকাল ১০ ঘটিকার সময় পাইলাম। পাওয়ার পরে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, আমি এখন কী করতে পারি? মনে-প্রাণে ভাবলাম, আমি আর পাকিস্তানে থাকব না, ভারতে চলে যাব। আমার ভারত যাওয়ার কথা শুনে কয়েকজন আমাকে বললেন, মান্নান, তোমার সাথে আমরাও যাব। দেখতে দেখতে সে সংখ্যা প্রায় ৬২ জন হয়ে যায়। তারা সবাই আমার সঙ্গে ভারতে রওনা হয়। ভারতে আমাদের এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা মনু মিয়া অবস্থান করছিলেন। আমরা প্রথম তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁর কাছে যাইয়া বললাম, মনু ভাই, আমরা চলে এসেছি। তখন মনু মিয়া বললেন, তোমরা কি ফ্রিডম ফাইটার হবে। আমরা বললাম, হব। তখন উনি একটা কাগজে লিখে আমাদেরকে চেঙ্গাপাড়া ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিলেন।

  আমি ৬২ জনকে সঙ্গে নিয়ে চেঙ্গাপাড়া ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। পথিমধ্যে খালি পাহাড় আর পাহাড়। চেঙ্গাপাড়া ক্যাম্পটা পাহাড়ের ভিতরে ছিল। আমরা

রাতের বেলা ভুল করে সেই ক্যাম্প অতিক্রম করে অন্যত্র চলে যাই। তখন অনুমান রাত ১২টার মতো বাজে। ওই সময় সেই জাগায় গেলাম। যাওয়ার পরে দেখি, একটা গির্জায় কিছু উপজাতি। তাদের আমরা বললাম, ভাই, এখানে চেঙ্গাপাড়া ক্যাম্প কোথায়? তারা কিছু বলতে পারল না। তখন আমরা আবার বিপরীত দিকে রওনা হইলাম। পরদিন পাহাড়ের ভিতরে সেই চেঙ্গাপাড়া ক্যাম্প আমরা পাইলাম। চেঙ্গাপাড়া যাওয়ার পরদিন থেকে আমাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। ওখানে একটা ঝরনা ছিল। সেই ঝরনাতে আমরা গোসল করতাম এবং সেখানকার পানি আমরা খেতাম।

ওখানকার ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর আমাদের তুরাতে হায়ার ট্রেনিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন আমাদের যেতে দেরি হচ্ছিল। পরে প্রশিক্ষক হাবিলদার আবদুল হালিম আমাদেরকে ঢালুতে পাঠাই দিলেন। ২০-২৫ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আমরা সেখানে গেলাম। পথিমধ্যে চেকপোস্টে আমাদেরকে সার্চ করে। তারপরে নিয়া গেল ক্যাম্পে।

সেখানে প্রায় ১২ থেকে ১৩ দিন আমরা থাকলাম। থাকার পরে মেডিকেল হয়। সেই মেডিকেলে আমি আনফিট হইয়া গেলাম। মেডিকেলে টিকলাম না। তখন আমি কী করি, ওখানেই থাকলাম। আমার সাথি কতগুলা ছেলে তুরাতে চলে গেল। অন্য থানার কতগুলা ছেলে, শ্রীবর্দী থানার কতগুলা ছেলে এবং ধানুয়া-কামালপুরের কতগুলা ছেলে আমরা আনফিট হয়ে ওখানে থাকলাম। ছয়-সাত দিন পরে আবার আমাদের মেডিকেল হলো। এবার আমি টিকলাম। কিন্তু আমাদের এবার তুরাতে না পাঠিয়ে ভুটান সীমান্তের কাছে সম্ভবত দারাঙ্গাতে পাঠাইয়া দিল। গাড়িতে করে আমরা সেখানে গেলাম। দারাঙ্গা একটা পর্বতময় জায়গা। সেই জাগাতে জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নাই। দারাঙ্গাতে প্রশিক্ষণের পর আমাদের তুরাতে পাঠাল। তুরাতে আসার পরে ওখানে আবার সাত দিন প্রশিক্ষণ নিলাম। তারপর আমাদের হাতিয়ার দিল। এই হাতিয়ারসহ আমাদের পাঠাইয়া দিল মহেন্দ্রগঞ্জে। আমরা মহেন্দ্রগঞ্জে এসে তিন-চার দিন রেস্ট নিলাম। নেওয়ার পরে ধানুয়া-কামালপুর যুদ্ধ ফিল্ডে আমাদেরকে পাঠাই দেওয়া হইল।

আপনারা কতজন ছিলেন?

- আমরা ছিলাম ১৬২ জনের একটা কোম্পানি। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন আশরাফ আলী। আমি প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম। এখানকার অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন মান্নান। ১ নম্বর বাংকার থেকে ৭ নম্বর বাংকার পর্যন্ত আমাদের ডিফেন্স ছিল। আমরা ওই সব ডিফেন্সে অবস্থান করে কয়দিন থাকি। তারপর আমরা আরেকটা অপারেশনে যাই। সেদিন ভারতের বিএসএফের ব্রাভো কোম্পানিকে আমরা গাইড হিসাবে নিয়া গেছিলাম। পাকিস্তানি সেনারা গুলি আরম্ভ করল। আমরাও ফায়ার দিলাম। তারপর লাগাতার ফায়ার শুরু হলো। সেদিন বিএসএফের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তারা বেশ কিছু মারা গেছিল। আর বাকি বিএসএফ এবং আমরা কোনোরকমে জান বাঁচাইয়া ভারতে চলে গেলাম।

এই অপারেশনটা কোথায় হয়েছিল?

- গলাকাঠিতে। আরেক দিন আমরা আরেকটা অপারেশনে গেছিলাম। সেদিন আমাদের খুব বিপদ হইছিল। আমাকে ইন্ডিয়ার আলফা কোম্পানির সঙ্গে কামালপুর আসতে হলো। আসার পর দেখি, ওখানে ইন্ডিয়ার ব্রাভো কোম্পানির সোলজাররা আগে থেকেই আছে। আলফা কোম্পানি আসার পর ব্রাভো কোম্পানির লোক মার্চ করবে। আর ওখানে আলফা কোম্পানির লোক পজিশন নেবে। তখন একজন করে উঠে, আরেকজন করে মরিচায় বসে। এইভাবে আমরা আগায় গেলাম। সামনে একটা ব্রিজ ছিল। সেই ব্রিজের কাছে যখন গেলাম, তখন ব্রাভো কোম্পানির লোক শেষ হয়ে গেল। আলফা কোম্পানির লোকও শেষ হয়ে গেল। শেষে তিনজন ছিল। সেই তিনজন একেবারে পানির কাছে মরিচা করলেন বেলচা দিয়ে। তারপর ওখানে পজিশন নিলেন। পজিশন নেওয়া শেষ হলে ইন্ডিয়ান কমান্ডার ওয়্যারলেসে শেলিংয়ের নির্দেশ দেয়। তখন শেলিং শুরু হয় ভারত থেকে। যখন ভারত থেকে শেল আসা শুরু হলো, তখন কামালপুর থেকে পাকিস্তানি সেনাদেরও শেল আসা শুরু হলো। দুই পক্ষের শেল এসে সেখানে পড়ছে আর তার মাঝামাঝিতেই ইন্ডিয়ার ব্রাভো কোম্পানি। সেদিন ওই শেলিংয়ে অনেক ইন্ডিয়ান সোলজার হতাহত হলো। এই দিনটা খুবই ভয়াবহ ছিল। কিন্তু আল্লা আমাকে মারেননি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারে কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই।

যুদ্ধ শেষে ফিরে আপনার বাড়িঘরের অবস্থা কেমন দেখলেন?

- আমার বাড়িঘরের অবস্থা অতীব খারাপ হয়ে গেছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মো. হাছানুর রহমান***
১০ অক্টোবর ১৯৯৬

বশির আহমেদ, বীর প্রতীক

পিতার নাম : লাল মাহমুদ। মাতার নাম : মোসাম্মৎ কেষোরী বেওয়া। গ্রাম : বৈষ্টমপাড়া, ডাকঘর : লাউচাপড়া, ইউনিয়ন : ধানুয়া-কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি পাস। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৫ বছর। ১৯৭১ সালে পেশা : ছাত্র। বর্তমান পেশা : অবসরপ্রাপ্ত (বিডিআর সদস্য)।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের হামলা সম্পর্কে কী জানেন?

- ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ আক্রমণের পরে তখন স্কুল বন্ধ ছিল, আমি বাড়িতেই অবস্থান করতেছিলাম। এরপর ২৫ মার্চের চার-পাঁচ দিন পরে আমার বাড়ির নিকট দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফায়ার করতে করতে যাইতেছিল। এর পাঁচ-ছয় দিন পরে আবার আসলো। আইসা ফায়ার করতেছিল। আমার আম্মা, বড় ভাই, পিতা ছিল না, মারা গেছে ’৬৭ সালে, আম্মা বলল যে তুমি আর দেশে থাকিয়ো না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীদের ছাত্রদের ওপর বেশি আক্রোশ, তাদেরকে ধরতেছে, মারতেছে। তুমি ভারতে চলে যাও। এরপরে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমি ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ চলে যাই।

যুদ্ধের জন্য কি আপনাদের প্রস্তুতি ছিল?

- যুদ্ধের তেমন একটা প্রস্তুতি ছিল না। তবে দেশের স্বাধীনতার জন্য যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তবে মোটামুটি প্রস্তুত ছিলাম যে, যুদ্ধ হলে আমরা তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করব।

বাঙালি ইপিআররা যখন বিদ্রোহ করে, তখন নেতৃত্ব কাদের হাতে ছিল?

- আমার বাড়ি কর্ণজোড়া ক্যাম্প এলাকায়। সেখানে বাঙালি ছিল অধিকাংশ, দুইজন ছিল পাকিস্তানি সেনা, একজন হাবিলদার—বিওপি কমান্ডার ছিলেন উনি, আর একজন সিপাহি। তখন, সময় এবং তারিখটা আমার সঠিক মনে নাই, দেখা গেল যে বাঙালি যাঁরা ছিলেন, ওখানে একজন নায়েক সুবেদার ছিলেন মোহাম্মদ আলী নামে—চট্টগ্রাম বাড়ি, তারা, বাঙালি সৈনিকেরা ইপিআরের লোকজন একদিন তাদেরকে আক্রমণ করল ক্যাম্পেই, আক্রমণ কইরা হাবিলদার এবং সিপাহি তাদের দুইজনকে মেরে ফেলল, কর্ণজোড়া ক্যাম্পে। এর পরে তো সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইপিআরের লোকজনও সব ভারতে চলে গেল। আমরাও ভারতে তখন চলে গেলাম।

১৩ এপ্রিলের আগে বিএসএফ কোনো গোলাবারুদ, আর্মস, অ্যামুনিশন আপনাদের দিয়েছিল কি?

- না।

১৩ এপ্রিলের আগ পর্যন্ত জামালপুর, কামালপুর বা আশপাশের এলাকায় পাকিস্তানিদের সাথে আপনার কোনো যুদ্ধ হয়েছিল কি?

- হয় নাই, স্যার।

যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যেসব অপারেশন চালিয়েছেন, তার কোনোটিতে কি আপনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন?

- ছিলাম। যেমন, ফাইডাঙ্গা যুদ্ধে আমি একবার অংশগ্রহণ করলাম, কর্ণজোড়াতে যখন ছিলাম। কর্ণজোড়াতে আমি দেড় মাস থাকলাম। ওই সময় আমাকে ডিটেল করা হলো হাতিবরে থাকার জন্য। আমরা ১৫ জন ফ্রিডম ফাইটার ছিলাম। সেখান থেকে ফাইডাঙ্গায় একদিন আলম কোম্পানি আক্রমণ করল, আমি ছিলাম পশ্চিম পার্শ্বে। সেখানে থেকে আমি ফাইডাঙ্গা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলাম। তারপরে আরেকদিন কর্ণজোড়া বাজার পাকিস্তান সেনাবাহিনীরা আক্রমণ করেছিল, সেখানেও আমি ছিলাম কর্ণজোড়া বাজার আক্রমণে। তারপরে ওইখান থেকে হাটটা ভেঙ্গে লাউচপড়াতে করা হলো পরবর্তীতে। এরপর দেওয়ানগঞ্জে একদিন অপারেশনে গেছিলাম, ঠিক ওই যে আবদুল আলীর সাথে গেলাম, কিন্তু সেখানে যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু অপারেশনে গেছিলাম আবদুল আলীর নেতৃত্বে। পুলিশ আবদুল আলী। তারপর স্যার, অধিকাংশ সময়ে কামালপুর যুদ্ধে আমার সক্রিয় ভূমিকা আছিল।

যুদ্ধের তারিখগুলো কি আপনার মনে আছে?

- তারিখ আমার সঠিক মনে নেই।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন কীভাবে?

- আমি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে যখন মহেন্দ্রগঞ্জ গেলাম, বাড়ি থেকে আমার মা, ভাই পয়সা, চাউলটাউল দিয়ে আসত। সেখানে প্রায় ১৫ দিন থাকলাম—এপ্রিলের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। থাকার পরে দেখলাম, মুক্তিযোদ্ধা লোক নিতেছে, আমিও গেলাম, তখন আমারই শিক্ষক ছিলেন সোলায়মান

হক এবং আবদুর রশিদ। তাদেরকে গিয়ে বললাম যে, স্যার, আমিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। তখন তারা বললেন, তুমি ছোট মানুষ, রাইফেল নিয়ে তুমি চলাফেরা করতে পারবে না। আর এত কষ্টও সহ্য করতে পারবে না। বিধায় তুমি মুক্তিযুদ্ধে যাইও না, তুমি ফিরে যাইয়ো এখনকার মতো। ওই সময় তো আমাকে নিল না। পরবর্তীতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার নিতেছে মুক্তিযুদ্ধে লোকজন, আবার আসলাম। তখন মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকা থেকে শরণার্থীদেরকে ভিতরে আমপাতি এবং কালাইপাড়া সেদিকে নিতেছে। আমার সাথে আমার মা বা অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশ থেকে যায় নাই। তখন আমি গিয়ে আবার বললাম, স্যার, এখন তো সবারই আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভিতরে যাইতেছে, আমার তো কেউ নাই। আমি কোথায় গিয়ে থাকব, স্যার, কোথায় খাব? স্যার, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করে দেওয়া হোক। তখন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে এনলিস্টেট করে দিল। এবং ওই দিনই আমি বিছানাপত্র নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ ফ্রিডম ফাইটার ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত হই। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। এর পরে কিছুদিন আমাকে ওখানে মহেন্দ্রগঞ্জে ভারতের বিএসএফের একজন হাবিলদার ছিলেন ধন বাহাদুর, উনি বাঁশের লাঠি দিয়ে ট্রেনিং করালেন। করানোর পরে আমি প্রথম অংশগ্রহণ করি মৃধাপাড়া মোড়ে একটা বাস আসছিল দিনের বেলা, বেলা একটার দিকে হবে, তখন আমাদেরকে প্রায় ২০ জনের মতো লোক বাসটাকে ধ্বংস করার জন্য পাঠাল। আমরা নয়াপাড়া দিয়ে ঢুকে এসে হয়তো বাসের ওপরে কিছু গুলিটুলি লাগছে, বাসের ক্ষতি হলো না। আমরাও মেশিনগানের প্রচণ্ড আক্রমণে পিছনের দিকে হটিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

জামালপুর বা কামালপুর এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আপনার স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা দিন?

- ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর সকাল অনুমানিক সাড়ে সাতটা হবে, ভারতীয় এখানকার যে অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার হারদেব সিং, উনি প্রস্তাব রাখলেন যে মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে একজনকে কামালপুর পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তাব বা স্যারেন্ডারপত্র নিয়ে যেতে হবে। তখন কোনো মুক্তিযোদ্ধাই রাজি হইতেছিলেন না। ওই সময় উনি বেশ একটু রেগে গেলেন। 'আমরা তোমাদের দেশের জন্য জীবন দিতেছি, আর তোমরা একজন মুক্তিযোদ্ধা মরতে পারো না।' আমি রাজি হলাম যে ঠিক আছে আমি যাব এবং আমার অবস্থানের কিনারেই ছিল ব্রাহ্মণপাড়া। আমার

অবস্থান ছিল ভারতীয় বান রোডের নিকটেই ব্রাহ্মণপাড়ায়। যৌথ কমান্ডের অধিনায়কও ছিলেন আমার অবস্থানের নিকটেই। রাজি হলাম, উনি আমার হাতে একখান পত্র দিলেন প্লাস একখান সাদা পতাকা দিলেন এবং আমার কোম্পানি কমান্ডার মি. সদরুজ্জামান হেলাল উনার গায়ে থেকে, সম্ভবত, আমার মনে হইতেছে, একটা গ্রিন রঙের জ্যাকেট খুলে আমার গায়ে দিয়ে দিলেন। আমি সেখান থেকে রওনা দিলাম, আমাকে বলা হলো, কামালপুর ক্যাম্পের সামনে যে বান রোড আছে, সেখানে কিছু অংশ উঠায়ে তাদেরকে সাদা পতাকাটা দেখাবা এবং চিঠি দেখাবা। যদি তারা তোমার চিঠিটা নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকে তবে যাবা। যদি তোমার ওপরে গুলি করে, তুমি নিচে পজিশনে যাবা। আমরা ওপর থেকে কভারিং ফায়ার দিব, তুমি ব্যাক করে চলে আসবা। কিন্তু আমি যখন এখানে আসলাম, তখন সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গা, দূর থেকে আমাকে দেখে ফেলছে তারা, আমি দেখতেছি, তারা পুরা স্টেন্ড টু পজিশনে চলে যাইতেছে, আমি রাস্তার সরাসরি ওপরে উঠে গেলাম। উঠে গিয়ে তাদেরকে সাদা পতাকা দেখালাম প্লাস চিঠিটাও দেখলাম। তাদেরকে ডাকতেছি, তারা কোনো লোক আমার নিকটে যাইতেছে না। এ রকম আনুমানিক ১৫-২০ মিনিট পর আমাকেই ভিতরে আসার জন্য তারা ডাকতেছে। তখন আমি চিন্তা করলাম মনে মনে, যদিও এখন পিছিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নাই, যদি বেশিক্ষণ থাকি, তখন হয়তো আমাকে গুলিও করতে পারে। তখন আমি আস্তে আস্তে এই যে রাস্তাটা আছে, এখন পাকা রোডটা, ক্যাম্পের দিকে আসছে, এখানে অবশ্য পাঞ্জি গাড়া ছিল আর গ্রেনেড আর মাইনটাইন অবশ্য লে আউট করা ছিল, এর ভিতর দিয়ে আমি আল্লাহর মেহেরবানিতে চলে আসলাম। এই যে সামনে শহীদ মিনারটা, এর পাছে দিয়ে তাদের চার পার্শ্বে বাউন্ডারি দিয়ে বাঁধ ছিল। গেটে আসলাম। আসার পরে একজন অফিসার আমার কাছে গেলেন, যাওয়ার পরে আমার হাত থেকে চিঠিটা নিলেন প্লাস সাদা পতাকাটাও নিলেন। নিয়ে আমার পিঠে আস্তে আস্তে দুই-তিনটা থাপ্পর দিয়ে বলতেছে, আমি তো তখন ছোট মানুষ, আমাকে বলতেছে, 'বাচ্চু, তোম মাত ঘাবরাও।' সেখান থেকে সরাসরি বর্তমানে যে বিডিআর ক্যাম্প আছে, আমাকে এখানে নিয়ে আসলো। নিয়ে আসার পরে উত্তর-পূর্ব বাংকারের সামনে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল, সেই বেঞ্চে আমাকে বসতে দিল। অফিসার চলে গেলেন, পাকিস্তানি সেনাদের সম্ভবত হাবিলদার র‍্যাংকের, উনাকে আমার জন্য নিযুক্ত করে দিয়ে গেলেন। র‍্যাংকটা আমার মনে নেই। বলি গেলেন যে ইনার কাছে কোনো লোক আসবে না। আমাকে বসতে দিল, কিছুক্ষণ পরে দেখি দুইটা চাপাতি রুটি,

কিছু মুগের ডাইল, আর এক মগ পানি আমার কাছে নিয়ে এসে বলতেছে যে 'বাচ্চু, তুমি খাওলো'। আমার তো এমনিই ভীত অবস্থা, আমাকে ভিতরেই আসতে হলো। এখন একটা কথাই আমার স্মরণে আসতেছে যে আমাদের সাথের একজন মুক্তিযোদ্ধা, আহাদুজ্জামান, উনাকে এই ক্যাম্পে উল্টা দিকে লটকাইয়ে ব্লেড দিয়ে চিরি লবণ দিয়ে তাকে মারছে। আমার খালি একটা কথাই মনে হইতেছিল যে আমাকে গুলি করে মারলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। একবারেই আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব। কিন্তু যদি সেই অবস্থা করে আমাকে মরতে হয়, তাহলে আমার অনেক কষ্ট হবে। যা-ই হউক, অনেক পীড়াপীড়ি করে একটা রুটি খাইলাম, একটু পানিও খাইলাম। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সাড়ে নয়টার দিক, আনুমানিক হবে, দেখা গেল যে উত্তর দিক থেকে ভারতীয় যুদ্ধবিমান আসছে। আইসা কামালপুর পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পের চতুর্পার্শ্বে চক্কর লাগাইতে ছিল। আমি গাছের নিচেই বসে ছিলাম। ওই যে সৈনিকটা আমার জন্য ডিটেইল করছিল, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উনি আমাকে হাত ধরে টাইনে এক হেঁচকায় একদম আমাকে বাংকারের ভিতরে নিয়ে গেল। দেখা গেল যে পরবর্তীতে ওই গাছের ওপরে একটা, সম্ভবত রকেট লঞ্চারটঞ্চার ছুড়ছিল। গাছটা ফাড়ি গেছিল, এখন নাই, ওখানে একটা কাঁঠালগাছ আছে বর্তমানে। কিছুক্ষণ পর যুদ্ধবিমান চলে গেল। আমি বাংকারের ভিতরেই থাকলাম। আমার শরীলে কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ এসে গেল। দেখি, আমার পাশেই এক ঝুড়ি রমনা সিগারেট আর এক বাক্স টাকা। আমি উনাকে বললাম যে আমি সিগারেট খাব। যদিও আমার অভ্যাস নাই। অফিসার বলতেছে, 'ঠিক আছে বাচ্চু খাও, যেত না মর্জি খালো।' এ রকম বলতেছে আমারে। আমি আধা ঘণ্টার ভিতরে পাঁচ-সাত প্যাকেট সিগারেট খেয়ে ফেললাম। রমনা সিগারেট পাঁচ-সাত প্যাকেট খেয়ে ফেলেছি। এরপরে আমার শরীরে যেন একটা টেম্পারাচার আসলো। জ্বর আইসা গেল গা। জ্বর আসায় বললাম যে, 'হামতো বিমার হো-গিয়া।' 'ঠিক হায় তোম সো যাও।' কম্বল মনে হয় চার-পাঁচটা আমার গায়ের ওপরে দিল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, টেম্পারেচার নাই। শরীলটা একদম, মানে জ্বরটা ছাড়ি গেল গা। এরপর দীর্ঘ সোয়া তিন ঘণ্টা আমি বাংকারের মধ্যেই বসে রইছি। সোয়া তিনটার দিকে হবে অনুমানিক, তখন দেখা গেল এই কর্নার থেকে উত্তর-পশ্চিম কর্নার হবে, আমাদের আরেক মুক্তিযোদ্ধা আনিসুল হক, উনি চিঠি ও পতাকা নিয়ে আসতেছে। এই অফিসার আমাকে বলতেছে যে, 'তোমারা দোসরা মুক্তিযোদ্ধা আগেয়া।' এ রকম বলতেছে। তাকেও আমার কাছে নিয়ে আসলো। নিয়ে আসার পর দুইজন একখানে বসলাম। দুইজন

বলাবলি করলাম, আমি তো ভাই মারাই গেছি। সকালে সেই আটটার দিকে আসছি, আর তুমি এখন কেন আসলা। বলল যে আমাকে তো জোর করে পাঠাই দিল। না আসলে তো আমাকেই শেষে শুট করবে। সাড়ে তিনটার দিকে অনুমানিক দ্বিতীয়বার ভারতীয় যুদ্ধবিমান আইসা ক্যাম্পের ওপরে আক্রমণ করল। বেশ কিছু হয়তো রকেট লঞ্চার ফালাইছে। এতে এই ক্যাম্পের পিছনে যে তাদের ট্রেঞ্চগুলো ছিল, ওখানে দুই-তিনজন পাকিস্তানি সেনা আহত হয়ে গেছে। এমন মুহূর্তে একজন অফিসার সাদা পতাকা দুইটা নিয়ে এসে আমাদের দুইজনের হাতে দিয়ে বলতেছে, 'ফিল্ডে যাও, তোমরা সাদা পতাকা দেখাও, আমরা আত্মসমপর্ণ করব।' আমরা দুইজনেই সাদা পতাকা সহকারে বর্তমান ক্যাম্পের সামনে ফাঁকা ফিল্ডে সাদা পতাকা দেখাইতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে যুদ্ধবিমানগুলো চলে গেল। এর কিছুক্ষণ পরে একজন অফিসার আইসা আমার কাছে একটা চিঠি দিল এবং সাদা পতাকাটা দিয়ে দিল, বলল যে, 'এটা তুমি ওখানে নিয়ে যাও। ওখানকার তোমার যে অধিনায়ক আছে, তার কাছে পৌঁছাও এবং দ্বিতীয়বার চিঠি নিয়ে আসো আমার কাছে। আমি এখান দিয়া সরাসরি মাঠের মধ্যে আসছি, সেখানদি পুনরায় ভারতের ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে রওনা দিলাম আর সঞ্জুকে (আনিসুল হক) রাইখে দিল। আমি সরাসরি ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে চলে গেলাম। যাওয়ার পরে চিঠি দিলাম। উনি তো বেশ আমাকে বাহবা দিলেন, দেওয়ার পরে আমাকে খানা খাওয়ানোর জন্য বলল যে, 'তুমি খানা খেয়ে আসো।' আমি খানা খেয়ে আসলাম। আসলে পরে আমাকে চিঠিটা দিল, বলল যে তুমি এটা ওখানে যে ক্যাম্প ইনচার্জ আছে, তার কাছে পৌঁছাও। সম্ভবত এর ভিতরে উভয় দেশের ওয়্যারলেস ফ্রিকুয়েন্সি বিনিময় হয়ে গেছে পাকিস্তানিদের এবং ভারতীয়দের। পুনরায় চিঠি নিয়ে আসলাম। তখন তো আমার বেশ সাহসী মনোভাব, আমাকে তো আর মারবে না, যেহেতু স্যারেন্ডারে তারা রাজি হয়ে গেছে। আসলাম, আসার পরে ক্যাম্পের মাঝখানে যখন ফিল্ডে আসছি, আমার কাছ থেকে পুনরায় চিঠি এবং সাদা পতাকাটা নিল, নেওয়ার পরে উনি পড়ল, পড়ার পরে উনি আমাকে বলল যে, ঠিক আছে, তুমি আমাকে নিয়ে চলো ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সাথে সরাসরি কথা বলব। আমি এই বান রোডে উঠলাম বর্তমান পাকা রাস্তায়। ওঠার পরে এখান দিয়ে এই যে উত্তর-পশ্চিম কর্নারে একটা বড় মসজিদ আছে, কামালপুরের উত্তর পাশে, ওইখানে নিয়ে গেলাম, দেখি উনি ব্রিগেডিয়ার সাবসহ এখানে আসছেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক তাদের ভিতরে কথোপকথন হলো বিকাল পাঁচটার দিকে হবে।

এক ঘণ্টা তাদের আলাপচারিতার পরে আমাকে আবার ব্রিগেডিয়ার সাব বলল, ঠিক আছে, তুমি একে পৌঁছে দিয়ে আসো ক্যাম্পে। সরাসরি এখানে দিয়ে ক্যাম্পে আসলাম। আমার এখান দিয়ে কয়েকটা বাংকারে সাথে করে নিয়ে ঘুরল। সবাইকে বলে দিতেছে যে আমরা আত্মসমর্পণ করতেছি। তখন সবাই যেমন বলতেছে যে, যদি আত্মসমর্পণ না করি তাহলে আমাদের মৃত্যু। সবাই রাজি হয়ে যাইতেছে। 'ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে স্যার' এ রকম বলতেছি। সন্ধ্যার সময়, ছয়টার পরপর, সাড়ে ছয়টার সময় হবে আনুমানিক, আমাকে বলল যে, 'ঠিক আছে, তুমি চলে যাও। আমি এখান দিয়ে সামনে যে বান রোড আছে, বান রোডের ওই পাশে যাওয়ার পরে দেখি যে সমস্ত ট্রুপস চলে আসছে ব্রিগেডিয়ার সাবসহ আমাদের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সহকারে। অনুমানিক সন্ধ্যা সাতটার দিকে হবে। তখন দেখি ৬০-৬২ জনের মতো হবে পাকিস্তানি সেনা, তারা অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে সিঙ্গেল লাইনে বান রোডের ওই পাশে ফাঁকা জায়গায় চলে আসলো। তাদেরকে সিঙ্গেল লাইনে ফল ইন করাই দিলেন। দেওয়ার পরে অস্ত্র এবং গুলি গ্রাউন্ড আর্মস করাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে, ভারত থেকে বেশ কতকগুলি ট্রাক আসলো। আসার পরে প্রথমেই লোকজনগুলো (পাকিস্তানি সেনাদল) ট্রাকে করে ভারতের দিকে নিয়ে চলে গেল গা। পরবর্তীতে অন্য ট্রাকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদগুলা নিয়ে গেল।

রাতারাতি?

- ওই তখন তখনই, উইথ শর্ট টাইম। ওই দিন সম্ভবত সবকিছু রেডিই ছিল। দেন অ্যান্ড দেয়ার। ওই যে বর্তমানে যে চেকপোস্টের রাস্তাডা আছে, তখন তো নিচু ছিল, কাঁচা রাস্তা, যদিও শুকনা দিন হয়ে গেছে গা। ওখান দি আইসা ওই খানদি আরেকটা নিচু রাস্তা আছে, এই বান রোডের সামনে দিয়ে আরও এক পা রাস্তা আছে, ওইখান দিয়ে সরাসরি আইসা আগে লোকজনকে নিয়া গেল গা। আর পরবর্তীতে অন্য ট্রাকে করে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে গেছে। তখন তো কামালপুর ওই দিনই স্বাধীন হয়ে গেল গা। এরপর একটা ঘটনা হইল যে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সাথে অপারেটর ছিলেন, উনাকে বলছে আমাকে সার্বক্ষণিক কাছে রাখার জন্য। এখন বিভিন্ন অফিসার কর্নেল-টর্নেল হাবিজাবি, লে. কর্নেল আসতেছে। আমাকে ডাইকা নিয়া যায়; বলে, 'অ্যাই বন্ধু, ক্যায়সা ক্যায়সা বাত হুয়া, কী কথা হইছে' এগুলো জানতে চায়। আমাকে একটু ফাঁকে নিয়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ার আইসা জিজ্ঞাস করছে, 'মুক্তিফৌজ কাঁহা হ্যায়।' বলতে পারিনি, ওই ওখানে নিয়ে গেছে। হেরে মারছে এক থাপ্পর। হে তো দৌড়ে গিয়ে আমারে নিয়ে আসছে। ব্রিগেডিয়ার সাব বলল যে, তুমি কোথাও যাবা না, এর সঙ্গে সব সময় থাকবা। এর পরে স্যার, যখন এইগুলো কার্যক্রম সমাপ্ত হয়ে গেল, তখন আমাদের ক্যাপ্টেন মান্নান ছিলেন, উনি আমাদেরকে নিয়ে ফটোসাংবাদিক হারুন হাবীবের কাছে মহেন্দ্রগঞ্জে যাইতে বলল। আমাদেরকে নিয়ে গেল। পরদিন সকালবেলা আমাদের দুইজনের হাতে এক শত এক শত টাকা দিল। দিয়ে দুইজনের ফটো নিয়ে নিল। বলল যে তোমরা চার-পাঁচ দিন করে বাড়িতে থেকে পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করো। এইভাবে কামালপুর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

কামালপুর-জামালপুর এলাকার মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোথায় বেশি হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল?

- বেশি অত্যাচার হইছে ধানুয়া এলাকায়।

যুদ্ধ চলাকালে আপনার পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- হয়নি।

দেশ স্বাধীনের পর দেশের অবস্থা কেমন দেখলেন?

- মোটামুটি শান্তই ছিল।

ধ্বংসযজ্ঞ কেমন দেখলেন?

- কামালপুরে অনেক ধ্বংসযজ্ঞই আছে। এখানে যে বাড়িঘর ছিল বাজারের আশপাশ দিয়ে, এখানে কোনো বাড়ি ছিল না, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এমনকি গাছপালা পর্যন্ত তারা কাইটে সাফ করে ফালাইছে।

এই এলাকায় কী পরিমাণ মানুষ মারা গেছিল?

- আনুমানিক ৮-১০ জন তো হবেই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মুহাম্মদ লুৎফুল হক***
১৩ জুন ২০১২

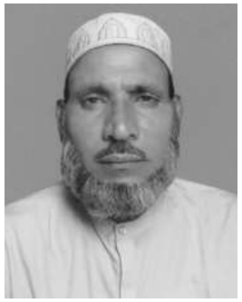

আলহাজ মো. নুরুল ইসলাম

বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক

পিতার নাম : রইস উদ্দীন। মাতার নাম : নবীরন নেছা। গ্রাম/মহল্লা : পূর্বে ধানুয়া, বর্তমান-সূর্যনগর পূর্বপাড়া, ডাকঘর : পূর্বে ধানুয়া-কামালপুর, বর্তমান-সূর্যনগর, ইউনিয়ন : পূর্বে ধানুয়া-কামালপুর, বর্তমান-বকশীগঞ্জ, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৬ বছর। ১৯৭১ সালে পেশা : ছাত্র। বর্তমান পেশা : কৃষিকাজ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে কী জানেন?

- ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে এটুকুই জানি যে রাজারবাগ তারা আক্রমণ করছে এবং হাজার হাজার পুলিশকে তারা মেরে ফেলছে। এটুকু জানছি রেডিও বা অন্য মিডিয়ার মাধ্যমে।

যুদ্ধের জন্য কি আপনাদের প্রস্তুতি ছিল?

- যুদ্ধের জন্য আমার প্রস্তুতি ছিল না, এলাকারও না।

মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে যোগদান করলেন?

- আমার বাবা-মা যখন চলে গেল ঘেগাপাড়া (ভারতে), তখন একদিন আমার বাবাকে এবং মাকে বললাম, আমি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাব। তবে আমার বাবা প্রথমে একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করছে, কিন্তু মা খুব উৎসাহিত ছিল যে বাংলাদেশে এত কিছু হইতাছে, আমার এক ছেলে না হয় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ করে দিলাম। তখন আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। আমাকে রিক্রুট করল রিয়াজুল ভাই, সোলায়মান স্যার, আরও কে কে জানি ছিল। তারা রিক্রুট করে সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রগঞ্জ ইউথ ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিল যে তুমি ইউথ ক্যাম্পে চলে যাও।

মুক্তিযুদ্ধে কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

- ট্রেনিংয়ের আগে আমি ধানুয়া, ঘাসিরপাড়া, খাসের গ্রামে যুদ্ধ করি। সাধারণত আমরা রাত্রির দিকে চলে আসতাম। এপ্রিল, মে অথবা জুন মাসের দিকে হবে। মাঝে মাঝে আমরা কামালপুর ক্যাম্পে অ্যাটাক করতাম উভয় সাইড থেকে। তিন-চারটা গ্রুপ হয়ে যেতাম। তোমরা এই সাইড দিয়ে অ্যাটাক করো, তোমরা এই সাইড দিয়ে অ্যাটাক করো। গ্রুপ হয়ে আমরা অ্যাটাক করতাম কামালপুর ক্যাম্পে।

  একদিন মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে আমাকে ডাকল। আমাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য নিবে। আমরা প্রায় ১৯০ জন ছিলাম। আমরা রিক্রুট হয়ে গেলাম, আমাদের মেডিকেল রিপোর্ট-টিপোর্ট সব হয়ে গেল; চেকআপ থেকে শুরু করে যা কিছু প্রয়োজন, আর্মিতে যেসব নিয়মনীতি আছে। ১৯০ জন ছেলেকে ট্রাকে করে নিয়ে গেল তেলঢালা। তেলঢালা নেওয়ার পরে ওখানে ফার্স্ট বেঙ্গল, থার্ড বেঙ্গল, এইট বেঙ্গল ছিল। আমাদেরকে তিনটা ব্যাটালিয়নে ভাগ করে দিল। আমি পড়ে গেলাম ৮ বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানিতে। এক দিন কি দুই দিন থাকার পরে আমাদেরকে আর সেখানে রাখল না। এই ১৯০ জনকে আবার একত্র করে ফার্স্ট বেঙ্গল যেখানে ছিল, ঠিক তার নিচে আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া আরম্ভ করল। আমাদেরকে ওখানে আর্মিদের সাথে মার্চ করাবে না। গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে আমাদেরকে ভিতরে ছাড়ি দিবে। এক মাস, ২৮ কিংবা ২৯ দিন আমাদেরকে ট্রেনিং দিল। ট্রেনিং হওয়ার পরে যেদিন আমাদের নাইট পেরেড হয়, আমার এই দৃশ্যটা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। প্রায় ১৮ কিলোমিটার অথবা ১৮ মাইল এই হবে। পুরো আর্মস, অ্যামুনিশন, বর্দি নিয়ে নাইট পেরেড। ১৮ কিলো গেছি, আবার ১৮ কিলো আসছি। আমরা যখন ক্যাম্পে এক বা দেড় কিলোমিটার দূরে আছি, সেই মুহূর্তে কর্নেল [ওই সময়ে মেজর—সম্পাদক] তাহের সাহেব এবং মেজর জিয়াউর রহমান, একই জিপে তারা আইছে। আসার পরে আমাদের ইন্সট্রাক্টর ছিল সুবেদার সিদ্দিক সাহেব, নোয়াখালী বাড়ি। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে, 'এরা কারা? এদেরকে এত রাত্রে কোথায় নিয়েছিলেন?' 'স্যার, আমরা নাইট পেরেডে নিয়া গেছি।' 'কত মাইল নিয়ে গেছেন?' '১৮ কিলো নিয়ে গেছি-আসছি।' জিয়াউর রহমান সাহেব জিপ থেকে নেমে ইন্সট্রাক্টরকে একটা লাথি মারছে, 'এরা কচি বাচ্চা, ১৮ কিলো গেছে আবার ১৮ কিলো আসা, এটা কি বাড়ির কাছের কথা।' ৩৬ কিলো। তখন তাহের সাহেব নেমে বলল, 'এদেরকে তো আমরা আর্মিতে নিয়েছি, কিন্তু আর্মিতে রাখিনি, আমরা এফএফ হিসেবে এখানে এদেরকে ট্রেনিং দেওয়ালাম।' তারপর ট্রেনিং দেওয়ার পরে আমাদেরকে ২৯ দিনের

মাথায় আমাদেরকে মহেন্দ্রগঞ্জ পাঠাই দিল, ১৯০ জনকে। তখন আমার কোম্পানি ছিল বদি কোম্পানি। আর প্রাথমিক কোম্পানি ছিল এই হেলালুজ জামান হেলাল। যখন আমি রিক্রুট হয়ে যার আন্ডারে যাই এবং ট্রেনিং হয়ে যখন আসি, ওখানে আসি বদি কোম্পানির সাথে। এখানে আসার পরে আবার আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ হয়ে যাই। যারা তুরায় ট্রেনিং করেছে, তারা হলো এফএফ। আর তেলঢালায় যারা ট্রেনিং করেছে, তারা হলো এমএফ। এমএফঅলারা ভাতা পাইত ৭৫ টাকা, আর এফএফঅলারা ভাতা পাইত ৫০ টাকা। এখানে আসার পরে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে। ভাগ করার পরে আর ওই ভারত থেকে যে সমস্ত আর্মি আসুক, মুক্তিযোদ্ধা আসুক, ভারতীয় আর্মি আসুক, আমরা চারটা ছেলে সব সময় একত্র থাকতাম। একটা হলো নৌবাহিনীতে চাকরি করত রফিকুল, আমিনুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, আর একটা ছেলে কে জানি ছিল। চারটা সব সময় একত্র থাকতাম। যে সমস্ত সৈন্য ভারত থেকে আসত, তাদের গাইড হিসেবে সব সময় আমাদেরকে অগ্রভাগে থাকতে হতো। তাহের সাহেবের কথা ছিল, তোরা যদি মরছ, এলাকার লোকই মারা যা। অন্য যারা আছে, তারা তো রাস্তাঘাট-পথ কিচ্ছু চিনে না।

জামালপুর এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- মার্চ মাসে তো তৎপরতা শুরু হয়নি। এপ্রিল থেকে সবার মনে একটু গুনগুন এই যে কামালপুরে হয়তো আর্মি আসবে। এপ্রিলের শেষের দিক থেকে তৎপরতা বেশি হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোথায় বেশি হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে?

- পাকিস্তান সেনাবাহিনী পুরা কামালপুর এলাকায়ই হত্যাযজ্ঞ চালাইছে। সবচেয়ে বেশি হয়েছে ধানুয়ায়। ধানুয়া গ্রামটা একবারে মিছমার করে দিয়েছিল। খড়ি পুড়লে যেমন কয়লা হয়, বাড়িঘরের অবস্থা একই অবস্থা ছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন কোনো স্মরণীয় ঘটনার কথা কি মনে পড়ে?

- মহেন্দ্রগঞ্জ থাকা অবস্থায় আমাদের এলাকায় ধানুয়া থেকে ১ নম্বর থেকে ৬ নম্বর পর্যন্ত ছয়টা বাংকার ছিল। প্রতি বাংকারে মুক্তিযোদ্ধা আছে।

১ থেকে ৬ নম্বর পর্যন্ত কিসের বাংকার?

- এটা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকার। ধানুয়াতে ছিল চারটা, খাসের গ্রামে ছিল একটা, কান্দাপাড়ে হলো আরেকটা। আপনি ধানুয়া যখন যাবেন, তখন বাংকারগুলো দেখায়ে দিব। এখন তো বাংকার নাই, তবে কোথায় কোথায় বাংকারগুলো ছিল, দেখায় দিব। ৬ নম্বর বাংকারে তখন আমরা ডিউটিরত, ভোর, তখন তো পানি, মাঝখানে একটা, এখন সমতল হয়ে গেছে, তখন বিলের মতো ছিল। পশ্চিম পাড়ে হলো আমরা, এ পাড়ে হলো পাকিস্তানি সেনা। আনুমানিক পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা অথবা ছয়টার দিকে, এই দিক পাকিস্তান সেনাবাহিনী চলে গেছে। আমরা আর্মস-অ্যামুনিশন নিয়ে বসে আছি। হঠাৎ এদিক থেকে তিন-চারটা ফায়ার হলো। যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ফায়ার করল, তখন আমরাও ফায়ার ওপেন করলাম। করার পরে দুই দলে ভালো যুদ্ধ হলো। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কোনো ক্ষতি হলো না। তাদের আর্মি একটা হেলমেটের এখান দিয়ে গুলি লাগছিল, ঠিক এই সাইড দিয়ে বাইর হয়ে গেছে। জানি না, রাইফেলের গুলি না চায়নিজ রাইফেলের গুলি। হেলমেট ছিদ্র হয়ে এখান দিয়ে গুলি লাগছে, পিছনে দিয়ে বাহির হয়ে গেছে। তারপরে যুদ্ধ থামল, যখন গা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিছনে হটল। ওই যে যেটা পানিতে পড়েছিল, ওটা আর নিতে পারেনি কো। এই যে মারা গেছে, ওরে আর উঠিয়ে নিতে পারেনি। তখন এই যে গোলাম, হোসেন আর আমি ওরে পানি থেকে উঠায়ে নিয়ে গেলাম, নিয়ে যাইয়া সেই দিন সকালেই, রাতে গোলাগুলি হলো আটটা-নয়টার দিকে, ওরে পানি থেকে উঠায়ে নিয়ে গেলাম। এরে মহেন্দ্রগঞ্জ নিমু কেমনে আমরা? তখন করলাম কি, পায়ের ভিতর দড়ি লাগালাম। গরু দিয়ে, জোয়াল না দিয়ে ছেছড়ে নিয়ে গেছিলাম।

আরেকটা ঘটনা হলো, ১৯৭১ সালে ১৭ অক্টোবর, তখন আমি মহেন্দ্রগঞ্জে। হঠাৎ করে আমার যে প্লাটুন কমান্ডার ছিল সাঈদ ভাই, এর কাছে ছিল একটা ইন্ডিয়ান এলএমজি। দুই সাইডে দুইটা এলএমজি ছিল। আমরা ছিলাম তখন বাংলাদেশের বান রোডে, ৪ নম্বরের এখানে আসছি। এ দিক থেকে আর্মিরা চলে গেছে। এই দিন সবাই উইথড্র করে চলে গেছে। যে দিন রামরামপুর, নন্দীর চর, ঘেগারপাড়া পোড়া দেয় চলে গেছে, তখন উভয় পক্ষের ফাইট হয়। ফাইট হওয়ার পরপর আমরা আর কুলাইতে পারলাম না। আমরা পিছে হটতে হটতে ইন্ডিয়ায় চলে গেলাম। ইন্ডিয়া বান রোডে যখন আশ্রয় নিলাম, তবু কুলাইতে পারলাম না। ভোরের দিকে তারা প্রথম পোড়া দিল নন্দীর চর গ্রামটা। এটা আমার দেখা একদম এবং একটা মহিলা দরজার আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিল, তারাও গুলি লেগে সেদিন মারা যান। আর আমি তখন করলাম কি, বান রোডের পিছে একটা আমগাছের আড়ালে দাঁড়াইলাম। আমার সহকর্মীরা কেউ সামনে, কেউ পিছনে আছে। দাঁড়ানোর পরে সম্মুখ থেকে আমারেই এক সহযোদ্ধা ভাই বলতেছে, 'নুরুল ইসলাম, তুমি সামনে থেকে আসো।' আমি কেন বাম সাইড দিয়ে বাহির হব না। বাহির হওয়া আর আমার পেটে এবং হাতে গুলি লাগা। এখান দিয়ে গুলিটা লাগে, ঠিক পিঠ দিয়ে বাহির হয়ে যায়। আর হাতের লাগে এই জায়গায়। তখন আমার সহযোদ্ধারা উঠায় নিল জলচকিতে। আমাদের দেশে চারকোনা

একটা জলচকি আছে। ইন্ডিয়ান বান রোডে উঠতে আবার পানি বাছে। ওই চারজন নিতে আবার পানিতে ফালায়ে দিল। যখন পানিতে ফালাইল, তখন আমার ভুঁড়ি-আতুরি আবার বাহির হয়ে গেল। উনারাই আবার জলচকিতে উঠায়ে মহেন্দ্রগঞ্জে নেয়। ওখানে প্রথম মহেন্দ্রগঞ্জ নেওয়ার পরেই এই যে কামালপুর থেকে শেলিং আরম্ভ হয়ে গেল, ১৭ অক্টোবর আনুমানিক ১০-১১টার দিকে। এখানে কোনো অপারেশন হলো না, শেলিং যখন থামল, তখন আমাকে তুরায় নিল। তুরাতে প্রথম আমার অস্ত্রোপচার হলো। হওয়ার পর সাত দিন তুরায় থাকলাম। এখান থেকে সাত দিন পরে আবার পাঠাই দিল ওয়ার্দ্ধী। ওখানে রইলাম ছয় দিন। ৭+৬, ১৩। ১ নভেম্বর আমাকে পাঠায় দিল উত্তর প্রদেশে লক্ষ্ণৌতে। সেখানে গিয়ে চারবার অস্ত্রোপচার হয়েছে পেটে। সেখান থেকে আমাকে নয় মাস থাকার পর কলকাতায় পাঠাল। তারপর কলকাতা থেকে পাঠাল বাংলাদেশ। এর পর থেকে এই অবস্থায় আছি। কিছুদিন চাকরি করলাম ৩১ বছর, বাংলাদেশ প্রথম মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে।

দেশ স্বাধীনের পর এই এলাকায় কী অবস্থা দেখলেন?

- আমি তো যুদ্ধে আহত হই ১৯৭১ সালের ১৭ অক্টোবর ভোরবেলা। তারপর আমি চলে গেলাম ভারতে, প্রথমে চলে গেলাম তুরায়। সেখান থেকে চলে গেলাম গুয়াহাটি, তারপর লক্ষ্ণৌ। ওইখানে প্রায় নয় মাস মতো ছিলাম। এর মধ্যে তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আসি তো আমার বাড়িই আমি চিনি না। যা রাইখা গেছি, তা নাই। আর কামালপুর তো নাই। অন্য রকম কুঁড়েঘর তুলে সবাই আছে।

যুদ্ধকালে আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছিলেন?

- যুদ্ধের সময় হয়তো আমার নিকটাত্মীয় কেউ গুলি লাগা অবস্থায় মারা যায়নি। এমনি মারা গেছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মুহাম্মদ লুৎফুল হক***
১৩ জুন ২০১২

খন্দকার মো. ইয়াকুব

পিতার নাম : ওমর আলী খন্দকার। মাতার নাম : শামসুন নাহার বেগম। গ্রাম : জদুর চর, ডাকঘর : টেংরামারী, ইউনিয়ন : ধানুয়া কামালপুর, থানা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি পাস। ১৯৭১ সালে বয়স : ১৬। ১৯৭১ সালে পেশা : ছাত্র। বর্তমান পেশা : শিক্ষকতা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে কী জানেন?

- আমাদের যেহেতু এই প্রত্যন্ত বর্ডার এলাকায় বাড়ি, শুনতাম যে ঢাকায় অনেক ছেলেমেয়েরে মারতেছে, তারপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হত্যাযজ্ঞ চালাইতেছে, তারপরে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির হলে গিয়ে ঢুকে ঢুকে মেয়েদেরকে মারতেছে, ছেলেদেরকে মারতেছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকেও যে বাঙালি অফিসারগুলা আছে, বিভিন্নখানে সরে যাইতেছে। এখানে কিন্তু তখন এ ধরনের ঘটনা শুনে তৎকালীন ইপিআর বাহিনীর লোকদের আমরা নিজেরা পিটিয়ে পিটিয়ে মারছি, কয়েকজনকে। আমি নিজেও সক্রিয় ভূমিকা নিছি। এখানে কামালপুরে, কর্ণজোড়ায় এখান থেকে চার-পাঁচজনকে আমরা ধরে ধরে মারছি। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছিল, তার পরও তাদেরকে মারছি। অবাঙালি, পাকিস্তানি ইপিআর। তখন কিন্তু এখানে কোনো মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা ছিল না। এরপরে ছিল মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা।

যুদ্ধের জন্য আপনারা কি কোনো প্রস্তুতি নিয়েছিলেন সে সময়?

- নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকেরা নিত, কিন্তু আমরা যে সাধারণ ছাত্র, আমাদের যে যুদ্ধে যেতে হবে, এই ধরনের মন-মানসিকতা তখন আমাদের ছিল না। যদিও কামালপুর বিওপিতে তখনকার ইপিআর বিওপি দখল হয়, আমার মনে হয় যে, এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি আর্মি মৃধাপাড়া চৌরাস্তার

মোড়, এখান থেকে ট্রাকের ওপরে এলএমজি ফায়ার দিতে দিতে বাড়িঘর পুড়তে পুড়তে আসে। আইসা এখানে যখন দখল করল, দখল করার পর আস্তে আস্তে সমস্ত লোক ভারতে চলে গেল। আমরাও চলে গেলাম। এখানে আশেপাশে কোনো গ্রামের একটা মানুষও ছিল না। সবাই হয়তো বাংলাদেশের ভিতরে, তা না হয় ইন্ডিয়াতে। তো বেশির ভাগ মানুষ ইন্ডিয়াতে চলে যায়। যাওয়ার পরে একজন-দুইজন করে আমাদেরকে রিক্রুট করা আরম্ভ করল, তখন আমরা মুক্তিযুদ্ধে গেলাম।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে যোগ দেন?

- আমরা ছাত্র ছিলাম। অধিকাংশ ছাত্র মুরুব্বিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলায়। মুরুব্বিরা আহ্বান করতেছিল যে আসেন, শেখ মুজিব তখন ২৫ মার্চে যেমন স্বাধীনতার ডাক দিছে। বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পত্রিকা থেকে আহ্বান আসতেছে যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো, এ ধরনের। আমরা তখন অধিকাংশ ছাত্র গেলাম মহেন্দ্রগঞ্জে। যাইয়া দেখি, আল মুজাহিদী নামে একজন, এই যে উনি এখন Š`wbK BGî dvK-এর সাহিত্য সম্পাদক, আমাদের স্থানীয় রিয়াজুল ভাই, তখনকার ঢাকা ইনিভার্সিটির ছাত্র, তারা ওইখানে রিক্রুট করে। আমরা দ্বিতীয় ব্যাচ মনে হয়। আমার সামনে বসা হেলাল ভাই, উনি কোম্পানি কমান্ডার পরে হইছেন, আগে উনি আমাদের প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। আমাদেরকে রিক্রুট করার পরে প্রাথমিক ট্রেনিং দেয়। আমি দেড় মাস থাকার পর উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য তুরাতে চলে যাই। তুরা থেকে তারপর ট্রেনিং করে আইসেপরে আবার তেলঢালাতে প্রথম ইস্ট বেঙ্গলে যোগদান করি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

- অনেকখানেই তো আমরা যুদ্ধ করেছি। যেমন, বেশির ভাগ আমরা কামালপুর আক্রমণেই সক্রিয়ভাবে অংশ নেই। আমরা আমাদের কোম্পানি বাহাদুরাবাদের যে সবুজপুর, এখানে দেড় মাস যাবৎ পুরা কোম্পানি নিয়ে। তারপরে ওখান থেকে আমরা জামালপুর। যেদিন কেপচার হয়, তার দুই দিন আগে আমরা জামালপুর যাই, কংকপুর এবং চন্দ্রাতে আমরা অবস্থান নেই এবং জামালপুরে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ করার পরে জামালপুর কেপচার হইল। এ ছাড়া এদিকে আমি কর্ণজোড়া এলাকায়, ভায়াডাঙ্গা এলাকায় গেছি। ফার্স্ট বেঙ্গলের সাথে আক্রমণ করার জন্য।

পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা চারদিকে কি ৬০০ গজের মতো ছিল?

- বেশি ছিল, আমি তো এরিয়াটাই দেখাতে পারি। এখন যে স্মৃতিসৌধ, মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা পুরাটা। ভিতরে ভিতরে ইটের বাংকার। তার ওপরে বাঁশের পাঞ্জি। বাঁশের পাঞ্জির শেষের দিকে আবার কাঁটাতারের বেড়া। এখানে বুবিট্রেপ দেওয়া, বিভিন্ন মাইন দেওয়া, একটামাত্র রাস্তা।

এখান থেকে কত দূর পর্যন্ত এ রকম প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল?

- কমপক্ষে ২০০ গজ। প্রথমে হলো মাটির বাঁধ, মাটির বাঁধ তো পুরা ক্যাম্প এলাকাই বলা চলে। মাটির বাঁধের পরে এক-দেড় শ এলাকা বাঁশের পাঞ্জি। বাঁশের পাঞ্জি পরে কাঁটাতারের বেড়া, ওর ওপাশে কোনো বাংকার ছিল না। তারপরে বর্তমান বান রোড। তখনো বান রোডই ছিল।

এর পরে আপনাদের বাংকারগুলো কত দূর ছিল?

- ধানুয়ায় হাফ কিলো দূরত্বে আমাদের বাংকারগুলি ছিল।

আপনারা কি মুখোমুখি অবস্থানে ছিলেন?

- অনেকবার মুখোমুখি অবস্থানে ছিলাম। অল থ্রু। এক্কেবারে অনবরত। বিভিন্ন কোম্পানি আসত, আজকে অমুক কোম্পানির ১০০, কাল আরেক কোম্পানি। সব সময় মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্স ছিল এদের ডিফেন্স থেকে আধা কিলোমিটার হবে। এপারে আমরা ছিলাম, ওপারে তারা ছিল। যুদ্ধ অনবরত চলছে। তারপর কামালপুর আক্রমণ তো প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদের প্রতিরক্ষা আগস্টের শেষের দিক থেকে ছিল।

প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের ২৯, ৩০, ৩১ জুলাইয়ে কামালপুর বিওপি আক্রমণের সাথে আপনি কীভাবে জড়িত ছিলেন?

- আমি তখনকা ফার্স্ট বেঙ্গলে যোগদান করি নাই। আমি ছিলাম তখন এফএফ, কিছুদিনের মধ্যে আমি তুরা থেকে ট্রেনিং করে আসার পরে একদিন রাতের বেলা আমাদের মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে ভোর চারটার সময় স্টান্ড টু হয়। স্টান্ড টুর সময় দেখি যে কয়েকজন বাঙালি অফিসার তখনকা উনি যে সালাহউদ্দীন বা উনি যে ক্যাপ্টেন হাফিজ, তখন জানতাম না। উনি আমাদেরকে দেখালেন যে, আমরা গত রাত্রে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে, এই কামালপুর ক্যাম্পে, যাইয়ে এই জি ৩ রাইফেল দুটা নিজেরা নিয়ে আসছি। দুইজন লোক মারিয়া আসছি। তোমরা কে কে আমাদের সাথে যাইবার চাও। আমাদের কোম্পানি থেকে আমি হাত তুললাম, আরও দুই-একজন হাত তুলল। তারপর উনি বলছেন যে, স্থানীয় একেবারে সমস্ত খুঁটিনাটি যারা জানে, রাস্তাঘাট সম্পর্কে যারা জানে, তারা আগে আসো। আমি আগে আসলাম। আমাকেসহ আরও দুইজনকে গাইড হিসাবে নিযুক্ত করা হলো। পরের দিন ৩১ জুলাই সম্ভবত ১১টার দিকে আমাকে রিক্রুট করে নিয়ে তেলঢালা নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক ই করার জন্য। কীভাবে কী করা হবে, কোনখানে হাইড আউট হবে, কোথায় সমাবেশ করা হবে। এগুলা করার পরে আমি ডেল্টা কোম্পানির ভাগে পড়লাম,

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেবের ভাগে পড়লাম। ফজলু ভাই পড়ল সম্ভবত হাফিজ সাহেবের ভাগে। দুইটা কোম্পানি সম্মুখে আক্রমণ করবে। আর ক্যাপ্টেন কাইয়ুম সম্ভবত উনার ভাগে পড়ল উঠানিপাড়ায় কাট অফ পার্টি। তিনটা কোম্পানি, নেতৃত্বে থাকলেন মেজর মঈন। উনি এখানে আসেন নাই, উনি থাকেন মহেন্দ্রগঞ্জে, বর্মণপাড়ায় অবস্থান নিলেন। আমি আসলাম ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেবের সাথে, ডেল্টা কোম্পানির। তাঁকে সরাসরি গাইড করে নিয়ে এসে বর্তমানে যে কামালপুর বাজার দেখেন তার পশ্চিম এলাকায়। পশ্চিম থেকে পুব দিকে আক্রমণ। আমরা যখন কাছাকাছি আসলাম, কামালপুরের কাছাকাছি আসলাম। কোনো ফায়ারটায়ার কিচ্ছু দেই নাই। এরা কিন্তু একবার টের পাইছে, আগের দিন রাত্রে দুইটা পাকিস্তানি আর্মিকে মাইরা দুইটা জি থ্রি রাইফেল নিয়ে গেছে। কাছাকাছি আসার পরে অনেকেই ফায়ার দিতে চায়। কিন্তু আনরেডি অবস্থায় ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী করল কি ৩ ইঞ্চি মর্টার অনবরত আমাদের ওপর ফায়ার দেওয়া আরম্ভ করল। অনেক ছেলেমেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মারা গেল গা। আমরা তো বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিকে দৌড়াদোড়ি করতেছি এবং চিল্লাচিল্লি করতেছি, এমন চিল্লাচিল্লি যে প্রায় হাটের অবস্থায়। কে কোথায় যাবে, কোথায় অবস্থান নিবে, এমন চিল্লাচিল্লি যে যুদ্ধের কোনো অবস্থা নাই। শৃঙ্খলা বলতে নাই, কে কাকে ইয়া করবে, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেবও বিভিন্নখানে ঘাড় ধরে সোজা করে, এই ইয়া গালিগালাজও আরম্ভ করল। বেশির ভাগ লোক মারা গেল গা আক্রমণের আগে। তখন রাত সাড়ে তিনটার দিক দিয়া। পরে শুনছি যে এটা সিগন্যালের অভাব, যোগাযোগের অভাব ছিল। ওই ওয়্যারলেসটা নাকি অকেজো হয়ে গেছলো। সালাহউদ্দীন সাহেব আমাকে বলল যে এই, তুমি কোথায়ও যাবি না। আমি যেখানে, তুই সেখানে। তুই যেহেতু গাইড, গাইড অফিসারের সাথে থাকবে, তুই অন্য কোথাও যাবি না। তার সাথে ক্রলিং করে করে বর্তমানে যে মাদ্রাসা ঘরটা, এর পিছনে খুব একটা বেশি দূরে না, এখানে যখন আসছি, তখন আসার পরে পশ্চিম পার্শ্বে একটা বাংকার ছিল পাকিস্তানি আর্মিদের। এর আগে ফিল্ডের মাঝখান থেকে, নাম জানি না আমি, আলো ফুট করে শব্দ হয়, ওপরে যায়, যাইয়া একবারে দিনের মতো আলোকিত হয়ে যায়। মেগনেট, কিন্তু ওটার আলাদা নাম আছে। এটা অনবরত মারতেছে। অন্ধকার বলতে কিছুই দেখা যায় না, দিনের মতো দেখা যায়। আমরা আর কি সবাই, কেউ পশ্চিম দিকে ফায়ার দিতেছে, কেউ উত্তর দিকে ফায়ার দিতেছে। মানে আসলে শৃঙ্খলা বলতে কিছু নাই। পরে একত্র হয়ে আস্তে আস্তে অগায়ে ফায়ার দিতেছিলাম। আমার কাছে ছিল ফার্স্ট বেঙ্গলের অন্য

অস্ত্র, আমি তো মুক্তিযোদ্ধা, আমার ছিল মাত্র এসএলআর। আমার তো আর ফায়ার দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নাই, তবু কিছু ফায়ার দিছি। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন সাহেব ক্রমে যখন আগাই আসতেছিল, এই পশ্চিম বাংকার থেকে ব্রাশফায়ার দিছে, দেওয়ার পরে উনি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল, ক্রলিং করা অবস্থায় নয়। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যায়। যাওয়ার পর মুহূর্তে শুনলাম ক্যাপ্টেন হাফিজ সাবও নাকি আহত, উত্তর দিকে থেকে দক্ষিণ দিক আক্রমণ করতেছিলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজও যখন আহত হলেন, তখন পুরা কোম্পানি আক্রমণ থেকে, মানে ভোরবেলা, প্রায় বেলা উঠি উঠি অবস্থা, তখন আমরা উইথড্র করি। অনেক লোক আহত। আমি, আহত একজন, তখন আমি তো চিনতাম না, সুবেদার হাই অনেক লম্বা-চওড়া, আমি তাঁকে ঘাড়ে করিয়া বাউন্ডারি পার করে নিয়ে যাই। তারপর উনিও কিছুক্ষণ হাঁটেন, তখন তাঁর পা-টা ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। জঙ্গল, বুট পায়ে ছিল, যদিও পায়ের রগ শুধু ইয়া করা, মর্টারের আঘাতে সম্পূর্ণ পা বিচ্ছিন্ন। তাঁকে ছেছড়াইয়া ছেছড়াইয়া আমি অনেক দূর নিয়ে যাই। উনি এক পায়ের ওপরে হাঁটি হাঁটি যান। এটা আমার ফার্স্ট বেঙ্গলের আক্রমণের একটা স্মৃতি।

দেশে ফিরে এসে কী অবস্থা দেখলেন?

● একেবারে বিধ্বস্ত। গাছ নাই, গাছ পোড়া; বাড়িঘর নাই, পোড়া বাড়িঘর; কতগুলা ভাঙা বাড়িঘর, রাস্তা বলতে নাই, ব্রিজ তো নাই-ই। ব্রিজ আমরা নিজেরাই ভাইঙ্গা ফালাইছি। বাড়িঘর সবগুলা পোড়া, অথবা ভাঙা, এই ধরনের।

আপনার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বা আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ শহীদ হয়েছিলেন কি?

● না স্যার, হয়নি।

আপনার একটা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বলেন?

● এই যে ধানুয়া থেকে পশ্চিম পাশে রামরামপুর, এখানে তিন রাস্তার মোড়। এখানে থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ প্রায় চার কিলো দূরে, কামালপুর প্রায় তিন কিলো দূরে, রাস্তাটার পিছনে নিচ দিয়ে নদী, জিনজিরাব নদী। এই নদী দিয়ে শুনতাম যে পাকিস্তানি কিছু সৈন্য নৌকা দিয়ে চলাচল করত। তখন আমি তুরা থেকে কিছুদিনের মধ্যে আসছি ট্রেনিং করে। আমাকে দেওয়া হলো যে ওই চৌরাস্তাটা পাহারা দেও, একদিন রাত্রে। একটা এলএমজি, আর বাকিগুলা এসএলআর দিয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠায়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক রাস্তার, আমরা কই চাঁদি, ওই রাস্তার মোড়টার ওপরেই একটা বড় বাংকার ছিল। এখানে ছয়জনমাত্র লোক। ছয়জন লোক নিয়ে একটা বেকওয়ার্ড জায়গা। পিছনে শূন্য, ডানেও শূন্য, বামেও শূন্য, সামনে শূন্য, কোনো গ্রাম নেই। চতুরপার্শ্বে শূন্য, ঠিক মাঝখানে আমাদের ছয়জনের

জায়গা দিল। আটটা-সাড়ে আটটার দিকে আমরা পোস্টে পজিশন নিলাম। রাত একটা-দেড়টার দিকে দেখা গেল যে নদী দিয়ে চারটা বড় বড় নৌকা। বড় বড় নৌকা চারটা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিক, ইন্ডিয়ার দিকে যাইতেছে। আমরা মনে করলাম যে হয়তো বা এটা কোনো ব্যবসায়ীর নৌকা হতে পারে, আবার পাকিস্তানি আর্মিও আক্রমণ করবার যাইতে পারে। আমরা পিছনে হটলাম না। আমার সাথের একজন নিচে নামল। নদীর বাঁধ তো, ওপর থেকে নিচে নামি হল্ট যেই কইছে, সবগুলি লোক ঝাঁপাঝাঁপি করে নামা ধরছে পশ্চিম এলাকায়, আমরা তো পুবে। ঝাঁপাঝাঁপি করে নামা যখন ধরছে, তখন মনে করলাম যে এরা যদি সাধারণ পাবলিক হতো, তাহলে তো নামত না। বলত, আমরা ওমুক বা আমরা পাবলিক। সাথে সাথে এলএমজি দিয়ে ফায়ার, আমাদের অনেক লোকই দিল ফায়ার। আমি ফায়ার দেই নাই। মনে করলাম যে সর্বনাশ, যদি আমরা ছয়জন মানুষ এরা যদি পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে আমাদেরকে যদি কাউন্টার অ্যাটাক করে তা হইলে আমরা ছয়জন তো ধরা পড়মু। মারা যাওয়া তো দূরের কথা জীবন্ত ধরব। আমরা আস্তে করে একটু সরে গেলাম। উত্তর দিকে গেলাম, পূর্ব দিকে না যায়ে উত্তর দিকে গেলাম। ভোরবেলায় আসছি। আইসা আহত খুঁজি, নিহত খুঁজি। কোনো কিছুর চিহ্নও নাই, নৌকাও নাই, কোনো মানুষও নাই, কোনো রক্তও নাই। সম্ভবত ফায়ারগুলো গেছে ওপর দিয়ে। অনেক ওপরে থেকে তো ফায়ার, ওপর দিয়ে গেছে। নৌকাগুলো হয় পিছায়ে গেছে, নয় সামনে গেছে। একটা লোকও আহত হয়নি। পরে জানছি যে এগুলা পাবলিক। কিন্তু স্মৃতিটা ভয়ংকর ছিল। যদি পাকিস্তানি আর্মি হইত, আমরা তো একদম অরক্ষিত অবস্থায়। যুদ্ধের স্মৃতি বললাম না, একটা অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ***মুহাম্মদ লুৎফুল হক***
১৩ জুন ২০১২

ভারতীয় জেনারেল ও পাকিস্তানি মেজরের বিবরণ

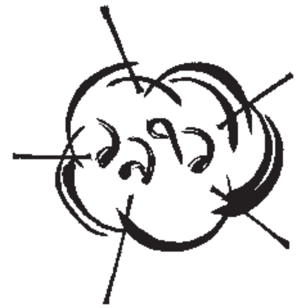

~~সাদা ১৭০~~

মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং
ভারত

মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং স্বাধীনতাযুদ্ধকালে ভারতীয় সেনা সদর দপ্তরের মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটে ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই ডাইরেক্টরেট যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে থাকার কারণে জেনারেল সিং আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের অনেক কিছুই জানতেন, যার কিয়দংশ তিনি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ *Bw´£qvm Iqvi wm´Ö Bw´£GcbGW´Ö@`Å wjevGikb Ae evsjvG`k*, ভলিউম ১-এ উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের কামালপুর অংশের অনুবাদ নিচে সংযুক্ত করা হলো। উল্লেখ্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০১ কমিউনিকেশন জোনের ১৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে কামালপুর দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

দ্য নর্দার্ন সেক্টর

অগ্রসর হওয়ার প্রধান পথে (থ্রাস্ট লাইন) আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা থেকে এক হাজার গজের বেশি দূরে হবে না কামালপুর। এর দিকে এগিয়ে আসার সব পথ নজরে রেখে পাকিস্তানি বাহিনী কংক্রিটের তৈরি ভূগর্ভস্থ মরিচার সাহায্যে এলাকাটিকে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় উন্নীত করে এটিকে দুর্ভেদ্য করে তোলে। জানা যায় যে পুরো অবস্থানটি, যা প্রায় ৬০০ গজ বর্গ ছিল, কিছু আধা সামরিক বাহিনীসহ ৩১ বালুচের এক কোম্পানি সেনার দখলে ছিল।

সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে নিয়মিত বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনী প্রারম্ভিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে কামালপুর দখল করবে। সেইমতো গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণে ঘাঁটিটিকে সিক্ত করে প্রথম আক্রমণ

চালানো হয়। হামলাকারী দল পাকিস্তানি বাংকারের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, কিন্তু যখন সাপোর্টিং ফায়ার তুলে নেওয়া হয়, তখন তারা [মুক্তিবাহিনী] মেশিনগানের গুলিবর্ষণে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। ভারী ক্ষয়ক্ষতির কারণে আক্রমণটি বাতিল করে দিতে হয়।

এরপর দুই ব্যাটালিয়নের সাহায্যে কড়া বেষ্টনীর মাধ্যমে ঘাঁটিটি অবরোধ করে রাখা হয়। দক্ষিণ দিকের পথে রোডব্লকের সাহায্যে সেখানে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ ব্যাহত করা হয়। পরবর্তীকালে, গোলন্দাজদের সরাসরি গোলাবর্ষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাংকারগুলো ব্যস্ত রাখা হয় এবং রাত-দিন থেমে থেমে এলাকাটি গোলন্দাজ ও মর্টারের ভারী গোলাবর্ষণের আওতায় রাখা হয়।

ক্লের [১৫ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লের] শত্রুর রণকৌশলের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন এবং লক্ষ করলেন যে সে তার [পাকিস্তান সেনাবাহিনীর—সম্পাদক] ভারী মর্টারগুলো একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে রেখেছে এবং কোনো এলাকা হুমকির মুখোমুখি হলে তাকে সহায়তার জন্য সেগুলো এগিয়ে নিয়ে আসছে। সুতরাং তিনি মর্টার ব্যাটারি ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেন। কামালপুর আক্রান্ত হলে মর্টারগুলো সম্ভাব্য যে জায়গায় স্থান নিতে পারে, তিনি সেখানে ১ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রিকে অনুপ্রবেশ করান। সেখানে একটি কৃত্রিম আক্রমণ পরিচালনা করা হয়।

যেমন আশা করা হয়েছিল, ভারী ব্যাটারিটি [পাকিস্তান সেনাবাহিনীর] ঘন কুয়াশাপূর্ণ ভোরে বকশীগঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল এবং ফাঁদের মধ্যখানে অবস্থান নিল। যেমাত্র কুয়াশা কেটে গেল, ফাঁদটি সক্রিয় হলো এবং মর্টার ব্যাটরিটি কচুকাটা হয়ে গেল। চারটি মর্টার ধ্বংস করা হয়, তাদের যানগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং ভারী ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিছু শত্রু পার্শ্ববর্তী আখখেত দিয়ে পালিয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানির মেজর ভাটসা তাঁর সঙ্গে থাকা মাইনের সাহায্যে বক্তিগতভাবে এই মর্টারগুলো ধ্বংস করেন। যখন চতুর্থ মর্টারটি উড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, আখখেত থেকে ছোড়া একটি অপ্রত্যাশিত গুলিতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন।

কাজটি সুসম্পন্ন হওয়ার পর শুধু একজন হতাহতের বিনিময়ে ১ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রিকে পেছনে ফিরিয়ে আনা হয়। এর পরই ক্লের কামালপুর ঘাঁটি অবরুদ্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধের মনোবল ভেঙে পড়ে। যখন ধারণা হলো যে অবরুদ্ধ থাকার কারণে শত্রু অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন আবার হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। এটা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে নিঃশব্দ আক্রমণ ছিল এবং আক্রমণকারী সেনারা বাংকারের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেলে কেউ একজন কাশি বা শব্দ করলে শত্রুর মেশিনগানগুলো গর্জে ওঠে ফলে

প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। বোধ হয় যুদ্ধ প্রলম্বিত করলে এবং আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে হয়তো ওই ঘাঁটি দখল করা যেত। কিন্তু মূল অভিযান শুরুর আগেই ক্লের এক-তৃতীয়াংশ সেনাক্ষয় মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এতে তাঁর মূল লক্ষ্যই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেত।

তৃতীয় আক্রমণেরও একই পরিণতি হলো। উপর্যুপরি দুটি আক্রমণের ব্যর্থতা এবং এর ফলে ক্ষয়ক্ষতি আক্রমণকারী সেনাদের মধ্যে একধরনের হতাশার জন্ম দেয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সত্যিকার অভিযান পরিচালনায় ক্লেরের সামর্থ্য ও সক্ষমতা পুনর্বিবেচনা শুরু করেন, বিশেষ করে তিনি যেহেতু সিগন্যাল কোরের সদস্য ছিলেন এবং অন্যান্য আর্মসের সদস্যদের উচ্চতর নেতৃত্বে পদায়নে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট ক্ষোভ বিদ্যমান ছিল।

এর আগে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে একটি ডিভিশনের জেনারেল স্টাফ অফিসার হিসেবে এবং পরবর্তী সময়ে নাগাল্যান্ডে একজন ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে কাউন্টার ইনসারজেন্সি অভিযান পরিচালনায় ক্লের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্ষয়ক্ষতি, উপর্যুপরি ব্যর্থতা এবং আক্রমণকারী সেনাদের হতাশায় চিন্তিত হয়ে তিনি দীর্ঘমেয়াদি অবরোধের মাধ্যমে ঘাঁটিটি বুভুক্ষু রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ৪ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ক্লের অবরোধ জারি রাখেন।

ক্লেরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না রেখে এ কথা বুঝতে হবে যে তাঁর মাউন্টেন ব্রিগেডের হাতে এমন কোনো উপযুক্ত অস্ত্র ছিল না, যা দিয়ে দৃঢ়তর কংক্রিটের ভূগর্ভস্থ মরিচা ধ্বংস করা যায়, যেমনটা কামালপুরে দেখা যায়। আর্টিলারি বলতে তাঁর কাছে ছিল যুগোস্লাভিয়ার তৈরি ৭৬ এমএম গান, যা ছিল খেলনা বন্দুকের মতো এবং এই ধরনের ব্যূহ ভেদ করা এই অস্ত্রের পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না। তাঁর কয়েক জোড়া ১০৬ এমএম রিকোয়েললেস গানের চাহিদা প্রত্যাখ্যান করা হয়, যেমনটি আগে করা হয়েছিল একটি মিডিয়াম গানের চাহিদার ক্ষেত্রে। ঊর্ধ্বতন সদর দপ্তর তাঁকে সব সময় মনে করিয়ে দেয় যে তাঁর সেক্টরটি একটি নিষ্ক্রিয় সেক্টর এবং এ ধরনের মূল্যবান অস্ত্র এখানে অপচয় করা যাবে না। একই বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে তাঁকে বরাদ্দ করা দুটি রিকভারি ভেহিকেল জরুরি বিবেচনায় পরে ৪ কোর এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়।

ক্লেরের প্রতিবন্ধকতা আরও এতটা বেশি ছিল যে তাঁর ব্যাটালিয়নগুলোর মধ্যে একটিকে প্রথমিকভাবে সাপোর্টিং উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করা একটি কাউন্টার ইমারজেন্সি ব্যাটালিয়ন থেকে সংগঠিত করা হয়। দুর্বল একটি প্লাটুনকে মোকাবিলা করতে গিয়ে অপর ব্যাটালিয়নে যুদ্ধাবস্থায় নেতৃত্বের আরও বড় দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ব্যাটালিয়নটি তুলনামূলকভাবে অল্প ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। প্রত্যাশিতভাবেই শত্রু লক্ষ্যস্থানের দিকে গোলন্দাজের গোলা ঘুরিয়ে দেয়।

একটি মর্টার বোমা কমান্ডিং অফিসারের কাছের মরিচাতে থাকা চার সেনার ওপর এসে পড়ে। তিনি দেখলেন যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো উড়ছে এবং তিনি মনোবল হারিয়ে ফেললেন।

তাঁর মর্টার অফিসারও বোধ হয় তাঁর নিজস্ব কোম্পানির সম্প্রতি দখল করা এলাকার ওপর গোলাবর্ষণ করে, ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফর্মিং আপ প্লেসে (এফইউপি) দাঁড়িয়ে থাকা ক্লের মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন যে কমান্ডিং অফিসার ও সুবেদার মেজরের নেতৃত্বে পুরো ব্যাটালিয়ন সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পেছনে ফিরে আসছে। ওই দুজনকে অপসারণ করা হলো এবং ক্লেরের বেশ কিছু সময় লেগে গেল ব্যাটালিয়নটি পুনরায় যুদ্ধের জন্য বিন্যস্ত করতে। ফলে যুদ্ধে ভরসা করার মতো তাঁর কাছে মাত্র একটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন ছিল।

যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কামালপুরকে ঘিরে রেখে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বকশীগঞ্জ আক্রমণ করা হবে। সেইমতো জেনারেলের [১০১ কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডার মেজর জেনারেল জি এস গিল] সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এক ব্যাটালিয়ন দিয়ে কামালপুর অবরোধ অটুট রেখে ক্লের তাঁর ব্রিগেড গ্রুপের বড় অংশকে নিয়ে বকশীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। আক্রমণের মাধ্যমে ঘাঁটিটি দখলের আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪ ডিসেম্বর ভোরে ঘাঁটির কমান্ডার ও তাঁর ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের মধ্যকার বেতারবার্তা বিনিময় অভিগ্রহণ (ইন্টারসেপ্ট) করা হয়। এগুলো মারফত জানা যায় যে ঘাঁটি পশ্চাদপসরণের অনুমতি চেয়েছে, কিন্তু এটা প্রত্যাখ্যান করা হয়। গুরবক্স সিং ঘাঁটির ওপর পর্যায়ক্রমে লাঠি ও মুলা পদ্ধতির সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিক রণকৌশল প্রয়োগ করেন। আনুমানিক ০৯.৩০ ঘটিকায়, নিকটবর্তী অবরোধ থেকে তাঁর সেনাদের সরিয়ে নিয়ে তিনি মিগ-২১ দ্বারা সাতটি সর্টির মাধ্যমে রকেট ও কামান ফায়ার করেন, ওই দিন আরও দুই দফা এটার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

প্রথম হাওয়াই হামলার পর একজন মুক্তিযোদ্ধা বাহকের মাধ্যমে গুরবক্স সিং চৌকি কমান্ডারের কাছে একটা ছোট চিঠি পাঠান এই বলে, 'রসদ ও গোলাবারুদ আনার জন্য গত কিছুদিন আপনি উন্মত্ত প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন এবং আপনি জানেন যে আপনি সফলকাম হতে পারেননি। এই রসদগুলো আমাদের হস্তগত হয়েছে।...আপনার চৌকির দিন শেষ এবং আপনি যে সিদ্ধান্তই নেন না কেন, আমাদের সর্বত উদ্দেশ্য হচ্ছে কামালপুর চৌকি উচ্ছেদ করা। আপনার ও আমাদের হতাহত এড়ানোর জন্য এই বার্তা আপনাকে পাঠানো হলো। গতকাল থেকে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধরত এবং আমাদের বাহিনী এই মুহূর্তে আপনার অনেক মাইল দক্ষিণে তৎপর আছে, যা আমরা ধারণা করি যে আপনি অবগত আছেন।'

নতুন করে মেশিনগানের তীব্র গুলিবর্ষণ ছাড়া চৌকি কমান্ডার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। দিনের মাঝামাঝি জেনারেল দ্বিতীয় দফার হাওয়াই হামলার আদেশ

দিলেন এবং চৌকিতে গোলাবর্ষণ হলো। পরবর্তী সময়ে আরেকটি ছোট চিঠি পাঠানো হলো : 'আপনাকে প্রেরিত প্রথম বার্তা আপনি আমলে নেননি। আপনাকে যৌক্তিকতা উপলব্ধি করানোর জন্য অনুরোধ করার এটাই আমাদের শেষ চেষ্টা। অল্প কিছু আগে প্রয়োগ করা ওষুধের স্বাদ আপনি পাবেন [চৌকিতে হাওয়াই হামলাকে উল্লেখ করা হয়েছে—সম্পাদক]। আর যদি আপনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন; আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আপনাকে সেই সম্মান প্রদান করা হবে, যা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা শত্রুর জন্য প্রযোজ্য...।

চৌকির বাংকার থেকে আরও গুলিবর্ষণের মাধ্যমে অবজ্ঞা দেখানো ছাড়া এই চিঠিরও কোনো উত্তর এল না। চৌকি কমান্ডার ও তাঁর অধিনায়কের মধ্যে আরেক দফা বেতারবার্তা বিনিময় হয়, যিনি চৌকিকে শক্তি বৃদ্ধি আর পাল্টা হাওয়াই হামলার মাধ্যমে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু কিছুই বাস্তবায়িত হলো না। জেনারেল ততক্ষণে অধৈর্য ও আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি বিকেলবেলা চৌকির ওপর আরেক দফা হাওয়াই হামলার হুকুম দিলেন এবং এর পরপরই তাঁর তৃতীয় ও শেষ বার্তা পাঠালেন : 'দয়া করে অবশ্যই ১৬০০ ঘটিকার মধ্যে জানাবেন যে আপনি আত্মসমর্পণ করতে চান কি না। কিছু অনুক্ত কারণে আমি আপনাকে আর কোনো সময় দিতে পারছি না। এটা খুব ভালো হয়, যদি আপনি বার্তাবাহকসহ বেরিয়ে আসেন। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।' শীতল অবজ্ঞার মাধ্যমে নবায়িত তেজের সঙ্গে চৌকি তার সব হাতিয়ার দিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এটা গুরবক্স সিংকে ক্রোধ এবং হতাশার মধ্যে ফেলল।

তিনি যখন রাত্রিকালীন আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন, তখন চৌকি কমান্ডার, ক্যাপ্টেন আহসান মালিক, প্রায় ১৯০০ ঘটিকায় সাদা পতাকা নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং ঘাঁটির বশ্যতা নিবেদন করেন। তিনি বললেন যে তিনি এটা করছেন প্রতিপক্ষ কমান্ডারের চিঠি পাঠানোর কারণে নয়, বরং তাঁর উপরস্থদের নির্দেশে। তিনি সমস্ত অবরোধকালে সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং নিয়মিত, রেঞ্জার্স ও রাজাকারদের সমন্বয়ে ১৪০ জন সেনার এক কোম্পানি শক্তি নিয়ে একটি অবরোধকারী ব্রিগেডকে ২১ দিন ঠেকিয়ে রাখার পর আত্মসমর্পণ করেন। ভারতীয় গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণ আর হাওয়াই হামলায় তাদের নামেমাত্র ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। নির্ভীক বালুচি ক্যাপ্টেনের সাহসী প্রতিরোধের স্বীকৃতি তার প্রতিপক্ষ প্রদান করে। মানেক শ একটি ব্যক্তিগত অভিনন্দন-বার্তা প্রেরণ করে মালেককে তাঁর দুর্দমনীয় প্রতিরোধের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট ফর্মেশন কমান্ডারকে কামালপুরের যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সাহসী সেনাদের জন্য প্রযোজ্য শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসহ আচরণ করার নির্দেশ দেন।

পরের দিন ক্লের বকশীগঞ্জ থেকে ফেরত এলেন তরুণ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যে কিনা তাঁর ব্রিগেডকে প্রায় তিন সপ্তাহ কাছে আসতে দেয়নি; আর চৌকির দুর্ভেদ্যতা স্বচক্ষে দেখার জন্য। হাওয়াই হামলা পর্যন্ত কংক্রিটের ভূগর্ভস্থ মরিচাকে সামান্যতম আঘাত হানতে পারেনি। যাওয়ার পথে তিনি গুরবক্স সিংকে সঙ্গে নেন এবং তাঁকে নিয়ে জিপ চালিয়ে চৌকির কাছাকাছি এলে তাঁরা একটা বিচ্ছিন্ন ট্যাংকবিধ্বংসী মাইনে চাপা দেন। তাঁদের জিপটি উড়ে যায় এবং জেনারেলের একটা পা গুঁড়ো হয়ে যায়, ফলে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম আহত জেনারেল হন। ক্লের হাঁটু ও মেরুদণ্ডে হালকা আঘাতের বিনিময়ে পার পেয়ে যান, তবে মারাত্মকভাবে ঝাঁকি খান। জেনারেলকে সেক্টর থেকে স্থানান্তর করা হয় এবং এটিকে মেজর জেনারেল গান্ধর্ব নাগরাকে ন্যস্ত করা হয় পরের দিন থেকে অভিযান পরিচালনার জন্য।

সুখওয়ান্ত সিং। *Bw´£qvm Iqvi wm´Ö Bw´£GcbGW´Ö@`Å wjevGikb Ae evsjvG`k*, ভলিউম ১। বিকাশ পাবলিশিং হাউস, দিল্লি, ইন্ডিয়া। ১৯৮১। পৃষ্ঠা ১৮৬-১৯১

মেজর সিদ্দিক সালিক
পাকিস্তান

মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার) সিদ্দিক সালিক স্বাধীনতাযুদ্ধকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসকের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সে সময়ে তিনি নিবিড়ভাবে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করেছেন। যুদ্ধশেষে যুদ্ধবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৭৯ সালে যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি *DBUGbm U mvGi´£vi* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে কামালপুরের যুদ্ধ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আছে। নিচে তাঁর গ্রন্থের কামালপুর অংশটির অনুবাদ সংযুক্ত করা হলো।

শেষ পশ্চাদপসরণ
(অস্থায়ী ৩৬ ডিভিশন)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিলিটারি ক্রস অর্জনকারী মেজর জেনারেল জামশেদ চুপচাপ ও ঠান্ডা মেজাজের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেসের (ইপিসিএএফ) মহাপরিচালক। ইপিসিএএফের কর্মচারী, রেঞ্জার, রাজাকার ও পুলিশকে জেনারেল নিয়াজি ও তাঁর নিম্নস্থ অপারেশনাল কমান্ডের অধীনে রাখা হয়েছিল বলে জেনারেল জামশেদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো তেমন কোনো বাহিনী ছিল না। এ জন্য তাঁকে অন্য এক মর্যাদা দেওয়া হয়। তাঁকে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহসহ ঢাকা ও এর উত্তরাঞ্চল তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৩৬ 'অ্যাডহক' ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের দায়িত্বভার দেওয়া হয়।

ডিভিশনের সীমানার বিস্তৃতি ছিল যমুনা (আদি ব্রহ্মপুত্র) নদীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে সিলেট জেলার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত মোট ১৮৫ কিলোমিটার। শত্রুপক্ষ এই

অঞ্চল দিয়ে ঢাকায় পৌঁছানোর জন্য উত্তর থেকে দক্ষিণে মাত্র দুটো পথ কাজে লাগাতে পারত। এগুলো হলো পূর্বে হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ পথ এবং পশ্চিমে কামালপুর-জামালপুর অক্ষ। এই ডিভিশনের মাত্র দুটি নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়ন ছিল—৩৩ পাঞ্জাব ও ৩১ বালুচ—যাদের অবসরের দোরগোড়ায় পৌঁছানো প্রবীণ সেনা ব্রিগেডিয়ার কাদিরের নেতৃত্বাধীন ৯৩ ব্রিগেডে ন্যস্ত করা হয়। ব্রিগেডিয়ার কাদির ৩৩ পাঞ্জাবকে পূর্বের পথে এবং ৩১ বালুচকে পশ্চিমে মোতায়েন করেন। তিনি নিজের কার্যালয় ময়মনসিংহে স্থাপন করেন।

সীমান্ত থেকে প্রতিপক্ষের সেনাদের যত দূর সম্ভব বিলম্বিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ব্যাটালিয়নগুলোকে; অতঃপর 'সময়ের বিনিময়ে জায়গা', তারা ময়মনসিংহ ও জামালপুরের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে ফিরে আসবে। ছোট ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী তীরে অবস্থিত এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাহায্যে 'অভেদ্য রেখা' তৈরি করার কথা ছিল।

যুদ্ধের সময় এই সেক্টরে তিনটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে; কামালপুর সীমান্ত চৌকির শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, ৯৩ ব্রিগেডের আত্মবিধ্বংসী পশ্চাদপসরণ এবং টাঙ্গাইলের কাছে ভারতীয় ছত্রীসেনার অবতরণ। এ প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসছি আমরা।

আমাদের ৯৩ ব্রিগেডের বিপক্ষে প্রতিপক্ষের ১০১ কমিউনিকেশন জোন ছিল, এ নামটি ছিল বিভ্রান্তিকর। এটি রীতিমতো একজন মেজর জেনারেলের অধীন যুদ্ধ ফর্মেশনের মতো ছিল। শত্রুপক্ষ যুদ্ধের আগে ৯৫ ব্রিগেডের মাধ্যমে এটিকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। এর সঙ্গে প্রচলিত সংখ্যক ফিল্ড ও মাঝারি আর্টিলারি ছিল, অথচ দুটো অক্ষকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ছিল স্রেফ ১২০ এমএম মর্টারের একটা ব্যাটারি।

উপরোল্লিখিত দুটো অক্ষের ভেতর কামালপুর-জামালপুর পথে শত্রুর মূল আঘাত আশা করা হচ্ছিল, এতে টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। পূর্বাঞ্চলীয় পথ, হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ, আপেক্ষিকভাবে অনুন্নত থাকায় সেদিক থেকে হামলা আসার সম্ভাবনা কম ছিল। মানচিত্রে একটা বিন্দুর চেয়ে বেশি কিছু মনে না হওয়া কামালপুর ছিল পশ্চিম অক্ষে প্রতিপক্ষের জন্য প্রধান বাধা। এই সীমান্ত চৌকি নিষ্ক্রিয় না করে বকশীগঞ্জ, শেরপুর এবং জামালপুর দিয়ে তার [মুক্তিবাহিনী বা ভারতীয় সেনাবাহিনী] পক্ষে এগিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তাই এটি যতটা মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে, প্রথমে সে তার চেয়ে ঢের বেশি দিয়ে ফেলে।

১২ জুন ১৯৭১ শত্রুপক্ষ প্রথমবারের মতো সীমান্ত এলাকায় বিদ্রোহী তৎপরতায় ইন্ধন জোগানোর উদ্দেশ্যে কিছু শেল নিক্ষেপের মাধ্যমে একে সক্রিয় করে তোলে। ৩১ জুলাই কিছু 'বিদ্রোহী' দিয়ে আক্রমণের মাধ্যমে আবার সে এটিকে খোঁচায়। আক্রমণটি ব্যর্থ হয়, বিদ্রোহী বাহিনী, যার ভেতর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট/ইস্ট

পাকিস্তান রাইফেলসের পলাতক সদস্যরা ছিল, একটি ভারী মেশিনগান, বারোটি লাইট মেশিনগান, চারটি স্টেনগান, ত্রিশটি রাইফেল, একটি রকেট লঞ্চার এবং বেশ কিছু লাশ ফেলে পিছু হটে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের দুই মাসের বেশি সময় নীরব রেখেছিল।

২২ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলে ভারতীয় নিয়মিত বাহিনী এই সীমান্ত চৌকিতে আক্রমণ হানে। তাদের একজন অফিসারসহ নয়জন হতাহত হয়, সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যায় তারা। ১৪ নভেম্বর শক্তি বৃদ্ধি করে আবার তারা ফিরে আসে। এই অভিযানে ১৩ গার্ডস নেতৃত্ব দেয় আর বিদ্রোহীরা তাদের অনুসরণ করে। সীমান্ত চৌকির সামনের দিক থেকে ব্যস্ত রেখে তারা আশপাশ দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বকশীগঞ্জ-কামালপুর সড়কে ব্লকিং পজিশন তৈরি করে। শত্রুপক্ষের আর্টিলারি ১২০০ ঘটিকা থেকে ১৯০০ ঘটিকা পর্যন্ত থেমে থেমে এই এলাকার ওপর শেল নিক্ষেপ করতে থাকে, অন্যদিকে পদাতিক বাহিনী কয়েকটি দুর্বল আক্রমণ চালায়। আক্রমণ চালিয়ে পুরুষোচিতভাবে সীমান্ত চৌকি দখল করা নয়, বরং উদ্যোগটি ছিল মনস্তাত্ত্বিকভাবে সীমান্ত চৌকিটিকে ভীত করে তোলার চাল মাত্র।

কামালপুরে আমাদের নিয়মিত বাহিনীর ৭০ জন সদস্য, এক প্লাটুন রাজাকার এবং রেঞ্জার ছিল। এদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আহসান মালিক নামে এক পাতলা কিন্তু পাকানো শরীরের তরুণ অফিসার। তাঁর কাছে ৮১ এমএম ক্যালিবারের তিনটা মর্টার ছিল। সীমান্ত চৌকি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে পেছনে থাকা ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার একজন অফিসারের নেতৃত্বে সংযোগ বাহিনী প্রেরণ করে। আনুমানিক চার কিলোমিটার দূরবর্তী বকশীগঞ্জ থেকে দুটি ১২০ এমএম মর্টারও কষ্ট করে বয়ে নিয়ে আসা হয়, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে সহায়ক গোলাবর্ষণ চালানো সম্ভব হয়। কিন্তু মর্টারগুলো মোতায়েন করা বা সংযোগ বাহিনী বাহন থেকে নামার আগেই শত্রু সড়কের উভয় পাশ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। দ্রুততার সঙ্গে সেনাদল লাফিয়ে নেমে পাল্টা গুলি করে, কিন্তু শত্রুপক্ষ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। আমাদের ১০ জন নিহত ও একজন অফিসারসহ সাত জন আহত হয়। আমরা চারটে বাহন আর মর্টার জোড়াও খোয়াই। শত্রুপক্ষ আমাদের একটি লাইট মেশিনগান নিয়ে যায়। এ যাত্রায় অপর পক্ষের সৌভাগ্য প্রসন্ন ছিল।

এই ব্যয়বহুল সংযোগ স্থাপন প্রয়াসের পর আমাদের সামনে দুটি বিকল্প ছিল। হয় কামালপুর চৌকিতে অবস্থানরত সেনাদের আমরা বকশীগঞ্জে মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে বলতে পারতাম, নতুবা যেকোনো পরিস্থিতিতে এর রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে পারতাম। 'প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রাসী ভাব' বজায় রাখার নিয়মিত নীতির কারণে প্রথম বিকল্প বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং, দ্বিতীয়টাই বেছে নিতে হয়।

আসলে কামালপুর চৌকি থেকে প্রত্যাহার স্বাভাবিক নিয়মেই সীমান্তের অন্যান্য চৌকি (নকশী ও বরোমারী) থেকেও গুটিয়ে আসা অপরিহার্য করে তুলত। ৩১ বালুচের এই তিন চৌকি ছেড়ে গেলে ৩৩ পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ অরক্ষিত হয়ে পড়ত। অন্য কথায়, কোনো একটি চৌকি পরিত্যাগের অর্থ দাঁড়াত গোটা ব্রিগেডের প্রতিরক্ষা গুটিয়ে ফেলা।

মধ্য নভেম্বরে কামালপুর চৌকি বিচ্ছিন্ন করার পর প্রতিপক্ষ একে নিষ্ক্রিয় করার ঝুঁকি নেয়নি এবং রসদ ও গোলাবারুদ মজুত থাকা পর্যন্ত এটি টিকে থাকে। ২৩ নভেম্বর ক্যাপ্টেন আহসান রাজাকারদের একটা দলকে রেকি করতে পাঠান। দলটি আর চৌকিতে ফিরে আসেনি। এবার নিয়মিত বাহিনীর একটি দলকে ওদের খোঁজে পাঠানো হয়। এ দলটিও ফেরেনি। এটি পরিষ্কার বার্তা বহন করছিল। শত্রুপক্ষ প্রতিরক্ষাব্যূহের বাইরে সবদিকে দলছুট লোকদের গিলে ফেলার জন্য শক্তিশালী ফাঁদ পেতেছে। পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে তৃতীয় আরেকটা দল হারানো হতো পাগলামি। নিখোঁজ প্যাট্রোলের খোঁজে সাহায্য চেয়ে ব্যাটালিয়ন হেডাকোয়ার্টারকে রেডিওর মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়।

ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার সীমান্ত চৌকির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান এবং যদি কোনো হতাহত থাকে তাদের নিয়ে আসতে বাড়তি বাহনসহ এক দল সেনা পাঠায়। পথে এই ছোট সেনাদল ফাঁদের মধ্যে পড়ে। হতাহতদের জন্য নেওয়া বাহন খোয়া যায়, কিন্তু দলের বাকি সদস্যরা কোনোমতে বকশীগঞ্জে ফিরে আসতে পারে। পরবর্তী তিন দিনে একই ধরনের চেষ্টা চালানো হলেও কোনো সাফল্য মেলেনি। শেষে ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান বেষ্টনী ভেঙে সীমান্ত চৌকিকে নতুন জীবন দিতে এক বেপরোয়া উদ্যোগ নেন। তিনি তিনটি কলামকে বকশীগঞ্জ-কামালপুর সড়কের দুই পাশ ধরে অগ্রসর হয়ে সীমান্ত চৌকিতে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার নির্দেশ দেন। যুগপৎভাবে অনুপ্রবেশকারীদের সম্ভাব্য পলায়নের পথ রোধ করতে কামালপুর থেকেও ছোট ছোট দল পাঠানো হয়, যাতে অপারেশনকালে তাদের সবাইকে ধ্বংস করা যায়।

এদিকে শত্রুপক্ষও অবরুদ্ধকারী সেনাদলকে শক্তিশালী করে তোলে এবং ওই অঞ্চলে কিছু বাড়তি আর্টিলারি মোতায়েন করে। সীমান্ত চৌকির গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথগুলোর দিকে নজর রাখার জন্য একজন গোলন্দাজ পর্যবেক্ষক বসানো হয়।

যখন আমাদের ত্রিমুখী অগ্রাভিযানের কিছুটা অগ্রগতি হচ্ছিল, তখনই শত্রু পর্যবেক্ষক সেখানে প্রবল আর্টিলারি গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসরমাণ দল জমিতে অবস্থান নেয় আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গোলাবর্ষণের শিকারে

পরিণত হয়। এরই মধ্যে শত্রুপক্ষের হান্টার [জঙ্গি বিমান—সম্পাদক] সীমান্তের ওপর এমনভাবে উড়ছিল, যেন আভাস দিচ্ছিল যে প্রয়োজন হলে বিমান আক্রমণের সাহায্যে গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি করা হবে। সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

পরের রাতে (২৭/২৮ নভেম্বর), শত্রুপক্ষ বিচ্ছিন্ন সীমান্ত ঘাঁটিটি নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি আক্রমণ পরিচালনা করে। গভীর রাতে চালানো এই হামলার পুরোভাগে ছিল ভারতীয় ১৩ গার্ডসের 'সি' কোম্পানি। কিন্তু, ধন্যবাদ কংক্রিটের বাংকারগুলোকে এবং আরও বেশি ধন্যবাদ সেখানে অবস্থানরত মানুষগুলোর দৃঢ় মনোবলকে, শত্রুকে আমাদের ক্ষুদ্রাস্ত্রের কার্যকারিতার আওতায় আসা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রবল গুলিবর্ষণ সহ্য করতে না পেরে সে পিছু হটে যায়। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন আহসানের সেনাদল রাতের শ্রমের ফসলের হিসাব নেয়। সেখানে একজন গোলন্দাজ পর্যবেক্ষকসহ শত্রুপক্ষের ২০টি লাশ ছিল। একজন সেনা হামাগুড়ি দিয়ে মৃত পর্যবেক্ষকের কাছে গিয়ে তার থেকে গোলা নিক্ষেপের পরিকল্পনা উদ্ধার করে।

দুই সপ্তাহব্যাপী লড়াই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে দেয়। প্রথমত, সীমান্ত চৌকি শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সব প্রয়াস শত্রু ব্যর্থ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা বিচ্ছিন্ন চৌকিটি শত্রুর দ্বারা দখলের উদ্যোগ নস্যাৎ করে দিয়েছি। যদিও সীমান্ত চৌকি কষ্টকর সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, তথাপি সেনাদল খোশ মেজাজে ছিল। মনোবল নয়, বরং রসদের মজুত একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। রসদ ও গোলাবারুদ, যা নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার কথা, দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল। মূল্যবান রসদ মজুত রাখতে আহসান কড়া মিতব্যয়ী পদক্ষেপ আরোপ করে। একটি কম চাপাতি খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল, কিন্তু শত্রুর মুখোমুখি থেকে বুলেট বাঁচানো ছিল কঠিন। সেনাদের কেউ কেউ এতটাই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিল যে রাতের বেলা ঝোপ নড়লে বা ব্যাঙ বা শিয়াল ডাকলেও ট্রিগার চেপে ধরছিল।

চৌকিতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল চিকিৎসাসাহায্য বা পুষ্টিকর খাবার ছাড়া পড়ে থাকা পাঁচজন আহত সেনা। একমাত্র নার্সিং সহকারী স্রেফ ক্ষত স্থানের ব্যান্ডেজ পাল্টে দেওয়া আর মাঝেমধ্যে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিল না। খাবারের বেলাও পরিস্থিতি ছিল একই প্রকার হতাশাব্যঞ্জক। নিয়মিত গোলাগুলির ফলে ঘুঘু আর জংলি কবুতর নিরাপদ জায়গায় পাড়ি জমিয়েছে, যা এর আগে আহত সেনাদের জন্য স্যুপ বানাতে শিকার করা হতো। তবু সীমান্ত চৌকিটি শত্রুর মোকাবিলায় অজেয় প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে টিকে ছিল।

২৯ নভেম্বর সুদক্ষ কোম্পানি কমান্ডার মেজর আইয়ুব রসদ সরবরাহের জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কয়েকজন নিয়মিত বাহিনীর সদস্য এবং রাজাকার নেন, যারা মাথায় গোলাবারুদের ক্রেট ও রেশন বহন করে। তারা সড়ক এড়িয়ে গ্রামের পথ বেছে নেয়। মেজর আইয়ুব সীমান্ত চৌকিতে পৌছান কিন্তু তাঁর অনুসারীরা কামালপুরের অল্প দূরে আক্রমণের মুখে পড়ে। তারা রসদপত্র ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে আবার বকশীগঞ্জে ফিরে যায়। সেনাদলের হাতে মাত্র ২০০ রাউন্ড লাইট মেশিনগানের গুলি, ১২টি থ্রি ইঞ্চ আর ১০টি টু ইঞ্চ মর্টার শেল ও রাইফেলপ্রতি ৭৫টি করে বুলেট থাকলেও আইয়ুবের উপস্থিতি তাদের মনোবল দারুণভাবে চাঙা করে তোলে। পরদিন মেজর আইয়ুব প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন দিতে ব্যাটালিয়নে ফিরে আসেন।

এমনকি আইয়ুবের প্রত্যাবর্তনের পরও চৌকিতে রসদ বা গোলাবারুদ পৌছায়নি, তবু ৩ ডিসেম্বরে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তা নিজেদের শক্তিতে টিকে থাকে। মনে হচ্ছিল, যুদ্ধাবস্থার তীব্রতা শত্রুর ক্রোধ বাড়িয়ে তুলছিল, এই নড়বড়ে বাধা উপড়ে ফেলার তর সইছিল না তাদের। ৪ ডিসেম্বর কামালপুরের আকাশে দুটো অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার আবির্ভূত হয়। শেষ মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে ট্রেঞ্চের পরিশ্রান্ত মুখগুলো ঢাকা থেকে সাহায্যের আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জমিনে, অবরোধ সংকীর্ণ করতে চারপাশ থেকে চেপে আসে শত্রুপক্ষ।

একই দিনে মেজর আইয়ুব সীমান্ত চৌকিতে সরবরাহ পৌঁছাতে একটি বেপরোয়া প্রয়াস নেন। এই বীরোচিত প্রয়াসে, তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন। এটা বিরাট ক্ষতি ছিল এবং এতে সীমান্ত চৌকিতে সরবরাহ পৌঁছানোর সব আশা নিভে যায়। বিকেলে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত এড়াতে সাদা পতাকাবাহী এক বাঙালি ভারতীয় অধিনায়কের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন আহসানকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে একটি বার্তা নিয়ে আসে। বার্তাবাহককে রূঢ় উত্তরসহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নিছক একগুঁয়ে জেদ এই বেপারোয়া জবাব দিতে প্ররোচিত করে; একে টিকিয়ে রাখতে আহসানের হাতে কিছুই ছিল না। পরের রাতে, কামালপুর সীমান্ত চৌকি শত্রুর কাছে পতন হয়।

সিদ্দিক সালেক (লে. কর্নেল)। *DBUGbm U mvGi´£vi*
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ইন্ডিয়া। ১৯৭৯। পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৭

পরিশিষ্ট

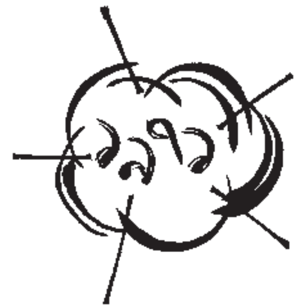

~~সাদা ১৮৪~~

১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কামালপুর আক্রমণ (৩১ জুলাই ১৯৭১) বিষয়ে লে. কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) জিয়াউর রহমানের প্রতিবেদন

SECRET

HQ Arty Bde
No. 103/1/

Aug 71

To: HQ Bangla Desh Forces

Subject: Hy cas - End Jul 71

Your note 00096 of 5 Aug 71 refers.

1. Deep grief of the Government of the Peoples' Republic of Bangla Desh and that of yours has been conveyed to the CO of the Bn, please.

2. For your info, the en cas has been higher. The Indian Army Int reports that 40 en soldiers were killed incl possibly one offr; whereas Mr. Rafiqueuddin Bhuyian our civ affairs adviser claims that his source saw and counted 70 dead bodies of en being loaded in 3 Helicopters. On our part, the cas has been substantially high commensurate with the action. But it has not, as presumed by others, lowered or affected the morale of the tps. In fact it has taken the morale sky-high. This was the first time that Bengali soldiers mounted a proper attack into a, as it turned out to be later, well co-ord and reinforced def posn. The tps charged and entered into en def posn and engaged in hand to hand fight. It has been proved that our tps are capable of undertaking the 'acid test' of an inf bn i.e. 'attack'. This Bde is proud of it. At the same time this op has brought to lime light certain weaknesses of our tps; we are now overcoming the weaknesses, through rigourous trg, both by day and night. We all feel happy that the weaknesses have been pin pointed now and not at the most crucial moment. This Bde, I can assure you will make history at every step.

2. The Detail of Op

a. Obj. Kamalpur school.

b. En str. One Coy. But later it came out to be approx two coys, Sp by sec 120 mm Mors and Sec 81 mm Mors.

c. Str of Own Attacking tps. B and D coy of 1 E Bengal, Sp by pre-H hr arty Sp of 76 mm guns of Sp Forces.

d. Timing. H-hrs was 0330 hours ni 30/31 Jul 71.

e. Brief Conduct of Battle. Pre-H hr arty Sp given as per schedule. Attk mov in time. But when attaking tps reached within 200 yds of the obj, en opened up intense SA fire incl a number of automatics. Two pls, one each from B and D coy entered obj. and engaged in hand to hand fight.

/Late

SECRET

Late Capt. Sallahuddin while urging his tps, to rush on to the obj, received a MG burst on his chest and fell on the ground, within 30 - 40 yds of the obj. Others tried to recover his body and in the process another OR became Saheed. Finally-it was abandoned. The savage battle cont up-to 0630 hrs. 20 mts after the first attk en brought down fire of 120 mm and 81 mm mor fire on our tps. As a result of this our tps, suffered large number of minor splinter cas. Finally the attk had to be called off.

f. Cas.

(1) Own. Attached as Anx 'A'.

(2) En. 40 dead (70 according to Mr. Rafiqueuddin Bhuiyan) and 35 wounded.

3. I was informed by the Home Minister during his visit here and later by the Sp Forces Army Comd that you will visit this place by 6 Aug 71. There are many problems here. I suggest that you should take an immediate trip to my loc.

4. In the end I would once again bring to your kind notice that the action termed as "abortive", is in-fact a historic success. Only time will-prove. Morale of tps, remains as high as ever and is being further built up.

Comd
(ZIAUR RAHMAN)

SECRET

লে. কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) জিয়াউর রহমানের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান সেনাপতি কর্নেল (পরে জেনারেল) এম এ জি ওসমানীর উত্তর

PERSONAL AND SECRET

No. 0002G
HQ Bangladesh Forces
Field
C/O Government of the Peoples' Republic of Bangladesh
Mujibnagar

To: Lieut Colonel ZIAUR RAHMAN, p.s.c., 2 Sep 71
Comd 'Z' Force (11 Sector)
Bangladesh Forces

Subject: Heavy Casualties - End July 71

Reference : Your No. 103/1/G of 12 Aug 71.

1. Whilst noting your assurance of high morale, despite the casualties, and of determination to destroy the enemy, I can NOT help observing that if my advice on the method of inducting into battle bns of your force (in view of a large proportion of trained recruits), the casualties could have been avoided. Pre-planning on thorough recce(maint of contact with enemy through patrols), provision of adequate fire sp and concentration of fire (from all sources) on objectives coupled with surprise and deception must be ensured in your future ops.

2. You will be well advised to make due note and guide your COs, accordingly, because we can ill-afford abortive actions or heavy casualties - must train hard and carefully prepare, and achieve a series of successes essential for morale of own tps and our civ population.

3. Ack.

Commander-in-Chief

PERSONAL AND SECRET

NOT ON ORIGINAL

Copy for Confd Dossier Officer

কামালপুর আক্রমণে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্ব প্রদর্শনকারীদের খেতাব প্রদানের জন্য লে. কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) জিয়াউর রহমানের সুপারিশপত্র

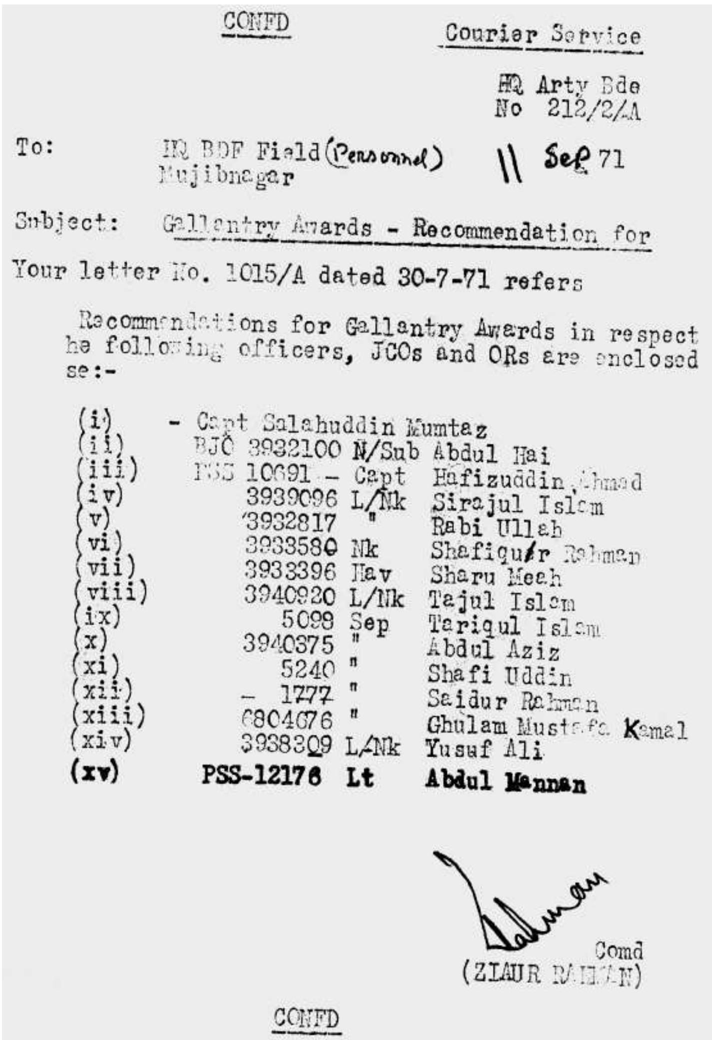

CONFD

Courier Service

HQ Arty Bde
No 212/2/A

To: HQ BDF Field (Personnel)
Mujibnagar

11 Sep 71

Subject: Gallantry Awards - Recommendation for

Your letter No. 1015/A dated 30-7-71 refers

Recommendations for Gallantry Awards in respect he following officers, JCOs and ORs are enclosed se:-

(i)	-	Capt	Salahuddin Mumtaz
(ii)	BJO 3932100	N/Sub	Abdul Hai
(iii)	PSS 10691 -	Capt	Hafizuddin Ahmad
(iv)	3939096	L/Nk	Sirajul Islam
(v)	3932817	"	Rabi Ullah
(vi)	3933580	Nk	Shafiqur Rahman
(vii)	3933396	Hav	Sharu Meah
(viii)	3940920	L/Nk	Tajul Islam
(ix)	5098	Sep	Tariqul Islam
(x)	3940375	"	Abdul Aziz
(xi)	5240	"	Shafi Uddin
(xii)	- 1777	"	Saidur Rahman
(xiii)	6804676	"	Ghulam Mustafa Kamal
(xiv)	3938309	L/Nk	Yusuf Ali
(xv)	**PSS-12176**	**Lt**	**Abdul Mannan**

Rahman
Comd
(ZIAUR RAHMAN)

CONFD

ওয়ার বুলেটিন

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত সংবাদসহ ওয়ার বুলেটিন প্রকাশ করা হতো। বুলেটিনগুলো সংকলিত হতো যুদ্ধের ময়দান থেকে পাঠানো প্রতি ১৫ দিনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। এই বুলেটিনগুলো বাহিনীর পাবলিক রিলেশন অফিসার স্বাক্ষর করে গণমাধ্যমকে দিতেন। ওয়ার বুলেটিনের বেশ কিছু ফাইল *evsjvG`Gki ÔvaxbZvh« `wjjcò*, একাদশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। সেখান থেকে শুধু কামালপুর এলাকার যুদ্ধের সংবাদগুলো নিচে বর্ণিত হলো। এখানে উল্লিখিত যুদ্ধের সবগুলোরই বর্ণনা পাওয়া যায়নি। যেগুলো পাওয়া গেছে তার বর্ণনা আগে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু যুদ্ধের তারিখ ও ফলাফল নিয়ে ভিন্ন মত পাওয়া গেছে। যুদ্ধ বর্ণনা অংশে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্যটি গ্রহণ করা হয়েছে।

BANGLADESH FORCES H. Q.
MUJIBNAGAR

WAR BULLETIN

15 August. 12 August MB engaged Pak position Kamalpur killing One Pak troop and injured two.

15 August. On 12 August MB engaged Pak position Kamalpur Killing one Pak troop and injuring two.

16 August. (14th) At Kamalpur Muktifouj raided enemy position with mortar support. Three enemy soldiers died on the spot. Casualties due to mortar is not yet known.

17 August. On 14 August MB killed 26 Pak soldiers in an encounter in Kamalpur. On 15 August MB raided Pak position Kamalpur killing eight Pak troops. They destroyed bankers and huts. They also damaged a civilian boss.

19 August. On 15 August MB raided Pak position Bakshigang killing five and damaging two vehicles.

25 August. On 23 August MB removed telephone line between Kamalpur Bakshigang.

26 Aug. On 26 August MB raided Chaura Bazar near Bakshigang killing four Badar Bahini members, eight Pak supporters and one Pak police inspector.

30 August. On 17 August MB raided Pak troops in Kamalpur area and inflicted three casualties

10 September. According to the latest reports received here from different sectors freedom fighters raided Pak troops in Kamalpur in Mymensing district on last Wednesday inflicting heavy casualties on the Pak troops.

1 October. On the night of 26th September, Mukti Bahini ambushed Pak troops on Bakshigang-Kamalpur road and killed two enemy soldiers.

7 October. On 3rd October on Pak vehicle was blown up due to explosion of mire laid by Mukti Bahini on Kamalpur-Bakshigang Road of Jamalpur Sub Division in Mymensingh District. They killed seven and wounded six others of its occupants.

12 October. Mukti Bahini demolished a road bridge on Bakshiganj-Kamalpur Road in Mymensingh district.

7 November. On November 3, one Army truck was blown up due to explosion of mine laid by Mukti Bahini on Bakshiganj-Kamalpur road of Mymensingh district killing enemy soldiers.

28 November. Earlier on November 18, 2 Platoons of Mukti Bahini ambushed an enemy column at Mazgedda near Bakshiganj in Mymensingh district killing 17 and injuring 9 enemy soldiers.

1 December. In Mymensingh district, fighting is going on in Kamalpur.

2 December. In Mymensingh, Mukti Bahini has now completely surrounded enemy post at Kamalpur cutting all communication line of enemy. The fall of Kamalpur is imminent.

পরিশিষ্ট-৫

কামালপুর যুদ্ধে শহীদদের তালিকা

জুন মাসের শুরু থেকে ডিসেম্বর মাসের শুরু পর্যন্ত বিভিন্ন আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে কামালপুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং আহত ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ প্রণীত *iGîGfRv ‰Kvîi* গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

০১. ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ
০২. নায়েব সুবেদার আ. হাই
০৩. নায়েক আবদুল মোস্তাক
০৪. নায়েক রবি উল্লাহ
০৫. ল্যান্স নায়েক সিরাজুল ইসলাম
০৬. ল্যান্স নায়েক গোলাম মোস্তাফা
০৭. ল্যান্স নায়েক তাজুল ইসলাম
০৮. সিপাহি মোহাম্মদ আলী
০৯. সিপাহি মো. মতিউর রহমান
১০. সিপাহি রহিত উল্লাহ
১১. সিপাহি মো. আমিনুল ইসলাম
১২. সিপাহি মো. আ. লতিফ
১৩. সিপাহি রবিউল ইসলাম
১৪. সিপাহি রফিকুল ইসলাম
১৫. সিপাহি সাহেব আলী
১৬. সিপাহি মো. সদর উদ্দিন
১৭. সিপাহি মো. ফজলুল হক
১৮. সিপাহি আবদুস সালাম
১৯. সিপাহি সৈয়দ ফুল মিয়া
২০. সিপাহি সাহাবুদ্দিন
২১. সিপাহি হায়াত আলী
২২. সিপাহি আ. কুদ্দুস
২৩. সিপাহি রবিউল আলম
২৪. সিপাহি মনসুর আলী

২৫. সিপাহি আনোয়ার হোসেন
২৬. সিপাহি আবদুস সোবহান
২৭. সিপাহি সিরাজুল ইসলাম
২৮. সিপাহি ইউছুফ
২৯. সিপাহি মোস্তফা

সেক্টর ১১

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লেফটেন্যান্ট (পরে লে. কর্নেল) এম এ মান্নান (বীর বিক্রম) কামালপুর যুদ্ধে ১১ সেক্টরের অধীন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের তালিকাটি প্রস্তুত করেন। তালিকাটি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : দশম খণ্ড'-এ সংকলিত আছে।

০০১. আমান উল্লা কবির, পিতা : আহমদ আলী মাস্টার, গ্রাম : লাউদাতা, পোস্ট : ইসলামপুর, জেলা : ময়মনসিংহ।
০০২. মো. শাহজাহান মিয়া, পিতা : মকবুল হোসেন, গ্রাম : জিনাইল, পোস্ট : বালিজুরা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০০৩. গাজী মো. আহাদুজ্জামান, পিতা : গাজী মো. সামসুল হক, গ্রাম : আলের পাড়া, পোস্ট : আলের পাড়া, জেলা : ময়মনসিংহ।
০০৪. মো. তৈয়বুর রহমান, পিতা : ইসমাইল হোসেন, গ্রাম : মাটিগাটা, পোস্ট : মাটিগাটা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০০৫. মো. আবু তাহের, পিতা : মো. ইমার উদ্দীন বেপারী, গ্রাম : পিরোজপুর, পোস্ট : দুরমুট, জেলা : ময়মনসিংহ।
০০৬. জয়নাল আবেদীন, পিতা : মো. ওসমান আলী, গ্রাম : দক্ষিণ পত্রলিয়া, পোস্ট : সানিল, জেলা : টাঙ্গাইল।
০০৭. আবদুল মজিদ, পিতা : মো. আজগর আলী আকন্দ, গ্রাম : বালার পাড়া, পোস্ট : হেমনগর, জেলা : টাঙ্গাইল।
০০৮. মো. আবদুস সামাদ, পিতা : মৌলভি গুলজার হাসান, গ্রাম : চকবারুল, পোস্ট : বাদিয়াখালী, জেলা : রংপুর।
০০৯. মো. আলতাফ হোসেন, পিতা : মৌলভি গরিবউল্লা মণ্ডল, গ্রাম : রমানাথের ভিটা, পোস্ট : রমানাথের ভিটা, জেলা : রংপুর।
০১০. মো. আবু বাকের, পিতা : মো. ইব্রাহীম, গ্রাম : সাংকাদা, পোস্ট : মেনারপুর, জেলা : রংপুর।
০১১. মুদালী তালুকদার, পিতা : মফিজুল হাসান টি কে, গ্রাম : মনোহরপুর, পোস্ট : জাহাঙ্গীরপুর, জেলা : ময়মনসিংহ।
০১২. মো. জামসের আলী, পিতা : মো. নাছির উদ্দীন, গ্রাম : চর জামিরা, পোস্ট : পাতাদা, জেলা : ময়মনসিংহ।

০১৩. আবদুল হাই সরদার, পিতা : মো. আবদুল বাকি সরদার, গ্রাম : শামপুর, পোস্ট : বারিটখালী, জেলা : রংপুর।
০১৪. মো. হাবিবুর রহমান, পিতা : আজিজুর রহমান, গ্রাম : বারেলা, পোস্ট : বাওদাপাড়া, জেলা : পাবনা।
০১৫. মো. আনসার আলী, পিতা : আজিম উদ্দীন, গ্রাম : কিসমত নিহালি, পোস্ট : বাথমারী, জেলা : রংপুর।
০১৬. মো. সহিদউল্লাহ, পিতা : সাহেব আলী, গ্রাম : গায়রিয়া, পোস্ট : ফুলছড়ি, জেলা : রংপুর।
০১৭. প্রভাতচন্দ্র রায়, পিতা : সুরেন্দ্র রায়, গ্রাম : নওদাবাজ, পোস্ট : নওদাবাজ, জেলা : রংপুর।
০১৮. ধনঞ্জয় সিংহ, পিতা : বসন্তকুমার সিং, গ্রাম : হিমনদাবাস, পোস্ট : হিমনদাবাস, জেলা : রংপুর।
০১৯. ভরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ, পিতা : শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ, গ্রাম : কান্তপাইয়াবরি, পোস্ট : তোস বন্দর, জেলা : রংপুর।
০২০. বাচারাম দাস, পিতা : ভরৎচন্দ্র দাস, গ্রাম : চুলক, পোস্ট : দাইকোহা, জেলা : রংপুর।
০২১. আহমেদ আলী, পিতা : সাবুল্লাহ মুন্সী, গ্রাম : লাবাড়ী, পোস্ট : বেলাবাড়ী, জেলা : রংপুর।
০২২. আবদুল হাই, পিতা : শমসের আলী, গ্রাম : মালগারা, পোস্ট : বেলাবাড়ী, জেলা : রংপুর।
০২৩. হামিদুর রহমান, পিতা : মাজহার উদ্দীন, গ্রাম : ফালিয়া, পোস্ট : গাইবান্ধা, জেলা : রংপুর।
০২৪. হাবিবুর রহমান, পিতা : জৈয়ন উদ্দীন বেপারী, গ্রাম : গজারিয়া, পোস্ট : ফুলছড়ি, জেলা : রংপুর।
০২৫. মো. শাহজাহান আলী, পিতা : জাবেদ আলী, গ্রাম : চর গোবিন্দ, পোস্ট : চর গোবিন্দ, জেলা : রংপুর।
০২৬. মাহফুজুর রহমান, পিতা : মো. তাসাদ্দেকু হোসেন খান, গ্রাম : জাগুলী, পোস্ট : রামেস্বরপুর, জেলা : বগুড়া।
০২৭. আবদুল মজিদ, পিতা : আবদুস সোবহান, গ্রাম : জোরবাড়ী, পোস্ট : পোকাল দীঘি, জেলা : পাবনা।
০২৮. মো. বেলাল হোসেন, পিতা : কোরবান আলী, গ্রাম : গোবিন্দপাথাল, পোস্ট : পোকালদীঘি, জেলা : পাবনা।
০২৯. আসফাকুল মতিন, পিতা : আলহাজ মাহমুদুল আমিন, গ্রাম : শাহবাজপুর, পোস্ট : সরাইল, জেলা : কুমিল্লা।
০৩০. এ কে এম নাজমুল হোসেন, পিতা : সেকান্দার আলী মাস্টার, গ্রাম : নালিতাবাড়ী, পোস্ট : নালিতাবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।

০৩১. মফাজ্জল হোসেন, পিতা : আনসার আলী, গ্রাম : নালিতাবাড়ী, পোস্ট, নালিতাবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৩২. আলী হোসেন, পিতা : মোতালেব আলী, গ্রাম : নালিতাবাড়ী, পোস্ট : নালিতাবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৩৩. আনোয়ার আলী, পিতা : হায়দার আলী, গ্রাম : নালিতাবাড়ী, পোস্ট : নালিতাবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৩৪. আবদুল লতিফ, পিতা : গুল মোহাম্মদ, গ্রাম : নালিতাবাড়ী, পোস্ট : নালিতাবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৩৫. লাল মিয়া, গ্রাম : তানতার, পোস্ট : নোয়াবিল, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৩৬. আবদুল আজিজ, পিতা : আবদুর রশিদ ভূঁইয়া, গ্রাম : মালং, পোস্ট : রিফুজি ক্যাম্প, জেলা : তুরা।
০৩৭. রিয়াজ উদ্দীন, পিতা : নওসের আলী, গ্রাম : বাহির সিমুল, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৩৮. আবুল হোসেন, পিতা : জনাব আলী, গ্রাম : মহেশলতি, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৩৯. পরিমল চন্দ্র দে, পিতা : বিন্দুকুমার দে, গ্রাম : নাসিমুলারি, পোস্ট : নালিতাবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৪০. আবদুল হাকিম মোল্লা, পিতা : আবদুল হাবিল মোল্লা, পোস্ট : শাহজাহানপুর, জেলা : ঢাকা।
০৪১. হাতেম আলী, পিতা : আফারাজি, গ্রাম : মাইসতারা, পোস্ট : মুক্তাগাছা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৪২. মজিবুর রহমান, পিতা : মিসের আলী, গ্রাম : বাইতকামারী, পোস্ট : জগন্নাথগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৪৩. নম্বর ১৫৩৯১ সিপাই হযরত আলী, পিতা : মোহাম্মদ আলী, গ্রাম : সানিচাপাড়া, পোস্ট : জানকা বাজার, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৪৪. হযরত আলী, পিতা : মজিদ আলী সরকার, গ্রাম : কুরশা বাজার, পোস্ট : নকলা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৪৫. দুলাল মিয়া, পিতা : হাবিবুর রহমান, গ্রাম : দাকুরিয়া, পোস্ট : নকলা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৪৬. নম্বর ১৫৪১২ নায়েক ওয়াজি উল্লাহ, পিতা : আবদুস সালাম, গ্রাম : পাঠগঞ্জপুর, পোস্ট : কবিরহাট, জেলা : নোয়াখালী
০৪৭. ইদ্রিস আলী, গ্রাম : কালাকুমা, পোস্ট : নয়াবিল, জেলা : নোয়াখালী
০৪৮. হযরত আলী, পিতা : বসিরউদ্দীন, গ্রাম : হুসেনপুর, পোস্ট : বিতকান্দী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৪৯. রঞ্জিতকুমার গুপ্ত, পিতা : নরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, গ্রাম : রুপখালী, পোস্ট : বেগুনবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৫০. শাজাহান আলী, পিতা : পাহার আলী, গ্রাম : কেস্টপুর, পোস্ট : ময়মনসিংহ, জেলা : ময়মনসিংহ।

০৫১. শেখ শাখাওয়াত আলী, পিতা : হাতেম আলী, গ্রাম : কুরালিয়া পাথাল, পোস্ট : ইসপিঞ্জারপুর, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৫২. তসলিম উদ্দীন, পিতা : আবুল গফুর, গ্রাম : সূর্যনগর, পোস্ট : সূর্যনগর, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৫৩. মুকসুদ আলী, পিতা : নাজিম উদ্দীন, গ্রাম : নন্দিরসারা, পোস্ট : ফকিরহাট, জেলা : রংপুর।
০৫৪. মো. আকবর হোসেন, পিতা : মো. মফিজউদ্দীন, গ্রাম : পতির রাম পথের পাড়া, পোস্ট : নাজিমখান, জেলা : রংপুর।
০৫৫. মো. কাসু মোহাম্মদ, পিতা : মোবারক হোসেন, গ্রাম : দর্নিবাড়ী, পোস্ট : দর্নিবাড়ী, জেলা : রংপুর।
০৫৬. মো. গুলজার হাসান, পিতা : কেরু মাহমুদ, গ্রাম : পতির রাম পথের পাড়া, পোস্ট : নাজিমখান, জেলা : রংপুর।
০৫৭. নম্বর ১৫৪৯১ সিপাই মো. আবদুল জলিল, পিতা : আবদুল জব্বার খান, গ্রাম : পশ্চিমপাড়া, পোস্ট : পারুরা, জেলা : রংপুর।
০৫৮. মো. আহমেদ আলী, পিতা : মো. শামসুউদ্দীন, গ্রাম : কুপতালা, পোস্ট : কুপতালা, জেলা : রংপুর।
০৫৯. আবদুল মজিদ, পিতা : মো. জিনাত উল্লা, গ্রাম : বাঁচের, পোস্ট : টাপুর চর, জেলা : রংপুর।
০৬০. মো. আবুল বারি, পিতা : মো. আনসার আলী, গ্রাম : টাপুর চর, পোস্ট : ঐ, জেলা : রংপুর।
০৬১. মো. জাবেদ আলী, পিতা : জামসের আলী, গ্রাম : গোবিন্দপুর, পোস্ট : লক্ষ্মীপুর, জেলা : রংপুর।
০৬২. নাজিম উদ্দীন, পিতা : মো. ইয়াকুব আলী, গ্রাম : হাসাতকাদু, পোস্ট : সাগাটা, জেলা : রংপুর।
০৬৩. মো. আবদুস সাত্তার, পিতা : ফাইম উদ্দীন, গ্রাম : সাগাটা, পোস্ট : সাগাটা, জেলা : রংপুর।
০৬৪. মো. আবদুল গণি, পিতা : মীর বাকস সরকার, গ্রাম : নামাজখালী, ডাক : হরিখালী, জেলা : বগুড়া।
০৬৫. মো. আবদুল লতিফ, পিতা : মো. আবিদ আলী, গ্রাম : টাপুর চর, পোস্ট : টাপুর চর, জেলা : রংপুর।
০৬৬. মো. আবদুল হামিদ, পিতা : মফিজ উদ্দীন, গ্রাম : টাপুর চর, পোস্ট : টাপুর চর, জেলা : রংপুর।
০৬৭. মো. আবু আহসাদ, পিতা : মো. আবদুর রসিদ, গ্রাম : বাটকামারী, পোস্ট : টাপুর চর, জেলা : রংপুর।
০৬৮. মো. আবুল হাসান, পিতা : মো. আনসার আলী, গ্রাম : পাখিউরা, পোস্ট : টাপুর চর, জেলা : রংপুর।

০৬৯. মো. হায়দার আলী, পিতা : মো. বসিরউদ্দীন, গ্রাম : দেখিয়ারাম, পোস্ট : চান্দজান, জেলা : রংপুর।
০৭০. মো. শাহাদৎ আলী, পিতা : মো. সালেক আহমেদ, গ্রাম : সন্তোসগ্রাম, পোস্ট : জুমাহাট, জেলা : রংপুর।
০৭১. হাবিবুর রহমান, পিতা : মুজিবুর রহমান, গ্রাম : বাসমন্দি, পোস্ট : খিলা, জেলা : রংপুর।
০৭২. নম্বর ১২৯৪৮ সিপাই আবুল হাফিজ, পিতা : আবদুল আলী, গ্রাম : মিজকাপন, পোস্ট : নীলগঞ্জ, জেলা : রংপুর।
০৭৩. আবদুস সালাম, পিতা : আবদুর রাজ্জাক, গ্রাম : বাল্লারপুর, পোস্ট : কালসিন্দুর, জেলা : রংপুর।
০৭৪. জামাল উদ্দীন, পিতা : মো. নাসির উদ্দীন, গ্রাম : আরালিয়া, পোস্ট : নরুনদি, জেলা : রংপুর।
০৭৫. নুরুজ্জামান, পিতা : আফসার উদ্দীন, গ্রাম : বারারা, পোস্ট : বারারা, জেলা : রংপুর।
০৭৬. মো. আজিজুল হক, পিতা : আবদুর রসিদ ভূঁইয়া, গ্রাম : হালুয়াঘাট বাজার, পোস্ট : হালুয়াঘাট, জেলা : রংপুর।
০৭৭. মফিজুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ আলী, গ্রাম : সাদুয়া, পোস্ট : বাজরাহাট, জেলা : রংপুর।
০৭৮. আবদুর রহমান, পিতা : বসির উদ্দীন, গ্রাম : রবিরভিটা, পোস্ট : পাটওয়ারী, জেলা : রংপুর।
০৭৯. আবদুল জব্বার, পিতা : ফসি উল্লা, গ্রাম : রতিরাম, পোস্ট : উলিপুর, জেলা : রংপুর।
০৮০. মি. হায়দার আলী, পিতা : গোলাম হোসেন, গ্রাম : হাসেরভিটা, পোস্ট : রমনা, জেলা : রংপুর।
০৮১. মো. আনোয়ার হোসেন, পিতা : আবদুল মজিদ, গ্রাম : প্রেমের চর, পোস্ট : মাশনা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৮২. মো. তাজুল ইসলাম, পিতা : আবদুল আজিজ, গ্রাম : মাশনা, পোস্ট : মাশনা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৮৩. মো. আজিজুল হক, পিতা : মীর আবদুল মান্নান, গ্রাম : কান্দিরপাড়ি, পোস্ট : হুসেনদি, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৮৪. মো. মঞ্জিল মিয়া, গ্রাম : নয়াপাড়া, পোস্ট : মাইজহাটি, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৮৫. মো. আবদুল মতিন, পিতা : সহিদ বেপারী, গ্রাম : সাসারাম, পোস্ট : গাওহাটা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৮৬. মো. মঞ্জুরুল হক, পিতা : হাফিজ সাজুদ্দীন, গ্রাম : কুমারপুর, পোস্ট : হুসায়নদ্দীন, জেলা : ময়মনসিংহ।

০৮৭. মো. রুস্তম আলী, পিতা : সিফাত আলী, গ্রাম : নয়াপাড়া, পোস্ট : মাইজহাটি, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৮৮. মাসুম আলী মণ্ডল, পিতা : নাজির উদ্দীন মণ্ডল, গ্রাম : নন্দিশহর, পোস্ট : ফকিরহাট, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৮৯. জাহিদুর রহমান, পিতা : মোস্তাফিজুর রহমান, গ্রাম : আনচুরকি, পোস্ট : গোপতলী, জেলা : বগুড়া।
০৯০. ফজলুল করিম, পিতা : দেলোয়ার হোসেন, গ্রাম : পেনকার, পোস্ট : মহিমাগঞ্জ, জেলা : রংপুর।
০৯১. মোস্তাফুর বিল্লা, পিতা : মোশাররফ হোসেন, গ্রাম : কাকিলাকারা, পোস্ট : শ্রীবর্দী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৯২. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পিতা : গমির উদ্দিন শেখ, গ্রাম : পাকালীয়া, পোস্ট : জামলান, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৯৩. মো. শাহজাহান, পিতা : জসিমউদ্দীন সরকার, গ্রাম : চর ভাটিয়া, পোস্ট : গুনেরবাড়ী, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৯৪. আবুল কালাম আজাদ, পিতা : কাসিম উদ্দীন সরকার, গ্রাম : দৌলতী, পোস্ট : চাপরারখানা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৯৫. মো. রমিজ উদ্দীন, পিতা : মো. আসিম উদ্দীন, গ্রাম : কাইলাকান্দি, পোস্ট : তেস্তারিয়া, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৯৬. সাহাব উদ্দীন, পিতা : নিয়ামত সরকার, গ্রাম : চোরগোলাবাড়ী, পোস্ট : পাতিদা, জেলা : ময়মনসিংহ।
০৯৭. নম্বর ৫৫৩ নায়েব সুবেদার আবদুস সাত্তার
০৯৮. এমএফ নম্বর ৫৩৯৩ হাবিলদার আবদুল হামিদ
০৯৯. এমএফ নম্বর ২৯৫৪ হাবিলদার মোহাম্মদ মমতাজ করিম
১০০. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পিতা : মোহাম্মদ মেহার উদ্দীন, গ্রাম : বাহাইতলা, পোস্ট : বাহাইতলা, জেলা : ময়মনসিংহ।
১০১. আফিজ উদ্দীন, পিতা : মোহাম্মদ নবী হোসেন, গ্রাম : বাজারি, পোস্ট : সারিসতলা, জেলা : ময়মনসিংহ।
১০২. নোয়াব আলী বক্সী, পিতা : শামসুদ্দীন বক্সী, গ্রাম : যমুনা, পোস্ট : চান্দিয়ান, জেলা : ময়মনসিংহ।
১০৩. আবদুল হাকিম, পিতা : মহির উদ্দীন, গ্রাম : চর ফুলকান্দি, পোস্ট : ফুলকান্দি, জেলা : ময়মনসিংহ।
১০৪. এম আবু হাসেম, পিতা : মো. লাল মাহমুদ, গ্রাম : ফুল্লা কান্দি, জেলা : ময়মনসিংহ।
১০৫. মো. আবদুস সামাদ, পিতা : মো. হাতেম দেওয়ান, গ্রাম : মনজাতা, পোস্ট : মোলামগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ।

১০৬. মো. আবদুস সামাদ, পিতা : মো. হাতেম দেওয়ান, গ্রাম : মনজিতা, পোস্ট : মলমগঞ্জ, জেলা : ময়মনসিংহ।

১০৭. গোলাম রাব্বানি, পিতা : ফরহাদ আলী সরকার, গ্রাম : সাতারপাড়া, পোস্ট : তুলসীঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ।

১০৮. আবদুল লতিফ, পিতা : জালাল উদ্দীন সরকার, গ্রাম : সাতারপাড়া, পোস্ট : তুলসীঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ।

১০৯. ওমর ফারুক, পিতা : আবদুল ওদুদ, গ্রাম : চর ভেদুরিয়া, পোস্ট : ভোলা, জেলা : বরিশাল।

১১০. মো. মোজাম্মেল হক, পিতা : মো. মোকেসদ আলী, গ্রাম : চেচিয়াবান্ধা, পোস্ট : তারাকান্দি, জেলা : ময়মনসিংহ।

১১১. মো. রফিকুজ্জামান, পিতা : মো. আবদুল জব্বার, গ্রাম : দৌলতপুর, পোস্ট : তারাকান্দি, জেলা : ময়মনসিংহ।

১১২. আবদুল হাকিম, পিতা : মো. জসিম উদ্দীন, গ্রাম : মালিপাড়া, পোস্ট : পাগোলদীঘি, জেলা : ময়মনসিংহ।

১১৩. জিতেন্দ্রনাথ বার্মা, পিতা : নগেন্দ্রনাথ রায় সরকার, গ্রাম : আশারু, পোস্ট : রাজারহাট, জেলা : রংপুর।

কামালপুর যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা

স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বসূচক খেতাব দেওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট যুদ্ধ বা সাহসিকতাপূর্ণ কর্মের চেয়ে যুদ্ধকালে সার্বিক কর্মকাণ্ডকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তথাপি শুধু কামালপুর যুদ্ধের কারণেই অনেকে বীরত্বসূচক খেতাব পেয়েছেন বলে কামালপুরে নির্মিত স্মৃতিসৌধে উল্লেখ আছে, অন্যান্য দলিলেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নিচে কামালপুর যুদ্ধে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যাঁরা খেতাব পেয়েছেন, তাঁদের তালিকা দেওয়া হলো। তালিকাটি কামালপুর স্মৃতিসৌধ থেকে গৃহীত। বিভিন্ন সূত্র থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয়, এর বাইরে আরও কিছু খেতাবধারী রয়েছেন, যাঁরা কামালপুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

০১. মেজর আবু তাহের, বীর উত্তম
০২. মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম
০৩. ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ, বীর উত্তম
০৪. ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম
০৫. লেফটেন্যান্ট আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম
০৬. সুবেদার ফয়েজ আহমেদ, বীর উত্তম
০৭. সুবেদার খায়রুল বাসার, বীর প্রতীক
০৮. নায়েক সুবেদার আবদুল হাই, বীর প্রতীক
০৯ হাবিলদার রুহুল আমীন, বীর প্রতীক
১০. নায়েক নূরুল হক, বীর বিক্রম
১১. নায়েক সফিকুর রহমান, বীর প্রতীক
১২. নায়েক আবুল বাসার, বীর প্রতীক
১৩. ল্যান্স নায়েক আবদুল হাই, বীর প্রতীক
১৪. ল্যান্স নায়েক সিরাজুল ইসলাম, বীর প্রতীক
১৫. ল্যান্স নায়েক রবি উল্লাহ, বীর প্রতীক
১৬. ল্যান্স নায়েক তাজুল ইসলাম, বীর প্রতীক
১৭. ল্যান্স নায়েক ইউসুফ আলী, বীর প্রতীক
১৮. সিপাহি আবদুল আজিজ, বীর বিক্রম
১৯. সিপাহি গোলাম মোস্তফা কামাল, বীর বিক্রম
২০. সিপাহি তারিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

২১. সিপাহি শফি উদ্দিন, বীর প্রতীক
২২. সিপাহি সাইদুর রহমান, বীর প্রতীক
২৩. মো. নুরুল ইসলাম, বীর প্রতীক
২৪. মো. মতিউর রহমান, বীর প্রতীক
২৫. মো. বশির আহম্মেদ, বীর প্রতীক
২৬. আমানুল্লাহ কবির, বীর বিক্রম
২৭. আবু ইউসুফ খান, বীর বিক্রম
২৮. সাখাওয়াত হোসেন বাহার, বীর প্রতীক
২৯. ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, বীর প্রতীক